রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ

জনসংখ্যা শিক্ষা

শিক্ষক প্রশিক্ষণ পুস্তক

জীবনের সার্ব্বিক বিকাশের শিক্ষা

সম্পাদনা
ধীরাজ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ

মানব-সম্পদ বিকাশের জন্য শিক্ষামূলক প্রকল্প

বি. এড ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য



সম্পাদনা

ধীরাজ কুমার বন্দোপাধ্যায়

শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য

রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ ☐ পশ্চিমবঙ্গ

২৫/৩ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড ☐ কলিকাতা-১৯

প্রথম প্রকাশ

২২শে মে □ ১৯৯৩

প্রকাশক

অধিকর্তা

রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ

প্রচ্ছদ

জয়ন্ত চৌধুরী ● আকাশ ভট্টাচার্য

মুদ্রণ নির্দেশনা

সঞ্জয় কর

মুদ্রণ

ক্ল্যাসিক প্রেস □ কলিকাতা

PREFACE

Almost all of the Third World countries including India are burdened with large and rapidly growing population. People of these countries have been an extremely low stardards of income and live in abysmal poverty. The economies of these countries are characterised by mass illiteracy, mass unemployment, under-utilisation and non-utilisation of natural resources and backward technology.

There have been many advocates of the thesis that abysmal poverty of the Third World countries is the result of over population and only through control on population growth erradication of poverty is possible. The proponents of this thesis have formulated their views basing on the Malthusian theory of population which drew heavily on the Law of Diminishing Returns. They disregard the fact that the Law of Diminishing Returns, though holding good for a perpetually backward and stagnant economy which takes full advantage of the technological and scientific advances of the late twentieth century.

Modern understanding of the problem of population has demolished the myth of the Malthusian theory of population. It has led to the realisation that it is not the size of the population as such but under-development of the resources as well as the system of faulty distribution of the wealth produced and the faulty socio-economic structure that are more responsible for the abysmal poverty and extremely low levels of living of the majority of the population in the Third World countries, Further, over-population itself is a relative term. What is over population in a backward country may not be considered over population in an advanced country. Modern understanding of the population problem does not consider the rate of growth of population as an independent variable. Rather it is a dependent variable related to the level of growth and development of the economy and the rate of population growth declines gradually with the rise in the levels of standard of living of the masses and spread of literacy and education among them. This understanding is based on three postulates : First, the population growth is the natural consequence of improvement in the human conditions. Second an expanding market, an expanding labour force and other related consequences of population growth spur economic growth. Third economic progress itself will lead to population stabilisation through changes in desired family size.

The implementation of this educational innovation was started in our country in 1980 when the Government of India launched a National Population Education Project. In West Bengal Population Education Project is being implemented from 1984 as an Educational Project for Human Resource Development. The basic understanding embedded in the project as implemented in west Bengal is that every progressive society must give utmost importance to the development of human resources which alone can guarantee scientific use on management of natural resources. Man is the most cherished of all resources that a society may possess. Such a resource should not be misused, wasted or

frittered away. Here population growth should not be considered as an independent variable rather dependent variable related to development of economy and Quality of life of the people. The population education programme, therefore has to be implemented with aim of moulding the minds of the young generation, the future citizens through our schools, on the basis of a value system which does not deny that a mismanaged populaltion may cause serious problems to development, but is firmly oriented to looking at man as the most precious resource which has to be scientifically managed in the interest of a nation's development.

Since the acceptance of the population Education Project as an Educational Project for Human Resource Development, we have given orientation in population education concept to a very large number of teachers of different levels of schools and also of teacher- training institutions, prepared syllabus, guide books, self-learning materials for different stages of school education and also for non-formal education.

The present volume is the outcome of our endeavour to present the population education concept to the trainees of the Teacher Training Institution, so that they can convey the same to their students.

This volume consists of seven chapters in Bengali Language each chapters consists a brief form of English version. The contributors have given their best efforts to bring out this concept of Education for Human Resource Development. We wish to place on record our deep appreciation of the organised work they have done. Our colleagues of the population education cell of the SCERT have extended their full cooperation in different ways for bringing out this volume. We must thank them also.

(S. Chattppadhyay)
Director, SCERT
& PEP
Govt. of West Bengal

22nd May, 1993
SCERT
Calcutta.

সম্পাদকীয়

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ জনসংখ্যাশিক্ষাকে জনসমাজ উন্নয়ণের শিক্ষা হিসাবে গ্রহণ করেছে। আমরা মানুষকে সম্পদ বলে মনে করি এবং বর্ধিত জনসংখ্যাকে আপদ হিসাবে না ভেবে সমাজে পরিণত করতে চাই। আমরা জানি অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ যদি কোন দেশের সত্যিই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় তা হলে সমস্যা সমাধানের দুইটি পদ্ধতি আছে। একটি হোলো পরিমাণগত পদ্ধতি ও অপরটি গুণগত পদ্ধতি। উন্নত ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে যে গুণগত পদ্ধতি দ্বারা জনসংখ্যা কাম্য আয়তনের মধ্যে আনা সম্ভব হয়েছে এবং জনসংখ্যার মানোন্নয়নও সম্ভব হয়েছে। অথচ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে পরিমাণগত পদ্ধতি (যে কোন ভাবেই স্বাস্থ্য দপ্তর বা প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে) দ্বারা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রনের চেষ্টা চলছে এবং বর্ধিত জনসংখ্যাকে আপদ হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস সৃষ্টি হয়েছে। গুণগত পদ্ধতির প্রক্রিয়াগুলি হলো-গরীব মানুষের কর্মসংস্থান ও আর্থিক আয় বৃদ্ধি করে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য ও বাসস্থান সম্পর্কে নিরাপত্তা প্রদান করা। এইগুলি করতে পারলে গরীব ও নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটবে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপও কমবে। এককথায় মানুষ সম্পদে রূপান্তরিত হবে এবং মোট জনসংখ্যা কাম্য আয়তনে স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়বে।

এই শিক্ষক প্রশিক্ষণ পুস্তকটির মাধ্যমে মানুষকে সম্পদ হিসাবে গ্রহণ করে জনসংখ্যা শিক্ষার তথা মানব সম্পদ বিকাশের শিক্ষাচেতনা বিদ্যালয়গুলিতে পৌছে দেবার প্রয়াস শুরু হয়েছে। এই জনশিক্ষামূলক প্রকল্পটি প্রথাগত ও প্রথাবর্হিভূত এই দুইটি ক্ষেত্রে ১৯৮৪ সাল থেকে রূপায়নের কাজ করে চলেছে। প্রথাগত শিক্ষা ক্ষেত্রে উপরোক্ত ধারণাটি 'শিক্ষণ সহায়িকা' পুস্তক তৈরী করে সারা পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৬০ হাজার প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা, বিষয় শিক্ষক/ শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ কাজ করে চলেছে। প্রথা বর্হিভূত শিক্ষার ক্ষেত্রেও 'পড়ুয়ার' ও 'প্রশিক্ষকদের' জন্যে পুস্তক তৈরী করে প্রশিক্ষণের কাজ পুরোদমে চলছে। উদ্দেশ্য একটাই—সেটা হোলো ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট ও সাধারণ মানুষের নিকট জনসংখ্যা সম্পর্কে ধারণাগুলি অবহিত করে মানুষকে সম্পদ চিহ্নিত করে, পরিবেশ সর্ম্পকে, অপচয় রোধ সম্পর্কে, মানুষ ও প্রাকৃতিক উপকরণের গুণগত মান উন্নয়নের সম্পর্কে, সুস্বাস্থ্য ও সুশিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে মূল্যবোধ সৃষ্টি করা। এই শিক্ষক প্রশিক্ষণ পুস্তকটির প্রথম অধ্যায়টি থেকে সপ্তম অধ্যায় পর্যন্ত মানব সম্পদের ধারণাটি কি প্রকার এবং ধারণাটি কিভাবে মাধ্যমিক স্তরের প্রশিক্ষণরত শিক্ষক/শিক্ষিকা অর্থাৎ বি. এড ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে দেওয়া যেতে পারে এবং পরিশেষে বি. এড. ছাত্র-ছাত্রীগণ কিভাবে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন তাহার বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এই পুস্তকটি তৈরীর ব্যাপারে যে সকল শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও গবেষক-গবেষিকা গণ লেখা দিয়ে সাহায্য করেছেন তাদের জানাই অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ। শ্রী সঞ্জয় কর মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা না জানালে অবশ্যই অন্যায় হবে। শ্রী সঞ্জয় কর অন্যান্য বইগুলির মুদ্রনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সাহায্য আমাদের করেছেন। এই পুস্তকটির তৈরী করার সর্বক্ষেত্রে যিনি অনুপ্রেরণা ও মানসিক সাহায্য দিয়েছেন তিনি হলেন শ্রীমতি বাণী ভৌমিক, প্রজেকট্ কো-অর্ডিনেটার। প্রত্যেকটি কর্মশালায় উনি থেকেছেন এবং মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন।

অবশেষে শ্রদ্ধার সহিত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের অধিকর্তার কাছে যাঁর অভিজ্ঞতা ও উপদেশ আমাদের কর্মশালার প্রাণসঞ্চার করেছে এবং এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের পথনির্দ্দেশ দিয়েছেন।

সময়ের অপ্রতুলতার জন্য সম্পাদনার কাজে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে গেল; পরবর্তী সংস্করণে তা শোধরাতে সচেষ্ট হব।

এই পুস্তকের উন্নতকরণের সকল পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

—ধীরাজ কুমার বন্দোপাধ্যায়
—শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

লেখক পরিচিতি ঃ

১। শ্রী সুনীল মুন্সী ঃ প্রাক্তন অধ্যাপক, বিদ্যাসাগর কলেজ, কলিকাতা ; প্রাক্তন অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ ; প্রাক্তন অধ্যাপক, সেন্টার ফর স্টাডিজ এণ্ড সোসাল সায়েন্স, কলিকাতা ; বর্তমানে অতিথি অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

২। শ্রী কমল কুমার চ্যাটার্জ্জী ঃ প্রাক্তন অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ হুগলী বি. এড কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ও রাজ্য-শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ।

৩। শ্রী ধীরাজ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ এম. এ (অর্থবিদ্যা) ; এম, ফিল (অর্থবিদ্যা) ; পি. এইচ্. ডি (অর্থবিদ্যা, সাবমিটেড) ; প্রকল্প আধিকারিক, পি. ই. পি, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ, অধ্যাপক এস. জে. জয়পুরিয়া কলেজ, (কলিকাতা) প্রাক্তন অধ্যাপক, চন্দননগর সরকারী কলেজ।

৪। শ্রী জোতি প্রকাশ ঘোষ ঃ প্রাক্তন অধ্যাপক রাজ্য-শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ পশ্চিমবঙ্গ, ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কলেজ, বর্তমানে অধ্যক্ষ-এস. জে. জয়-পুরিয়া কলেজ, কলিকাতা।

৫। শিব প্রসাদ ভট্টাচার্য ঃ এম. এস. সি (এডুকেশন, স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত) ; পি.এইচ. ডি (সেন্টার অফ এডভান্স স্টাডি ইন এডুকেশন, বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়) ইউনেসকো গবেষক (জর্জটাউন ইউনিভার্সিটি, ওয়াশিংটন ডি. সি.) প্রাক্তন ডেপুটি ডিরেক্টর, ন্যাশানাল স্টাফ কলেজ অফ এডুকেশানাল প্ল্যানার্স এণ্ড এডমিনিস্টেটরস, নিউ দিল্লী ; প্রাক্তন রিডার, নর্থ ইস্টান হিল ইউনিভার্সিটি, শিলং। অধুনা রীডার শিক্ষা ও শিক্ষণ বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

৬। বর্ণালী দাশ ঃ এম. এ (এডুকেশন, কলি. বি.) জনসংখ্যা শিক্ষার গবেষিকা।

৭। উমা দাস ঃ এম. এ (এডুকেশন, এম. ফিল. (শিক্ষা, ক. বি.) জনসংখ্যা শিক্ষার গবেষিকা।

সূচীপত্র

CHAPTER–1

Population Education — the New Concept
Education for Human Resources Development

✍ Prof. Sunil Kr Munshi

SUMMARY

There is no doubt that in the present state of affairs, our country is seriously overpopulated. But how can we define the problem of population in our country ? Is it just a problem of over-population or surplus population which has to be drastically reduced or is it basically a problem of scientific management of our human resource? These are the two alternative ways of looking at the problem.

Negative approach :

There have been many advocates of the thesis that the problem is mainly one of over-population in the Third World countries including India. From Thomas Malthus, the English economist (1766-1834) who had generally formulated in the late eighteenth and early ninteenth centuries, the theory of preventive and positive checks of population growth to the CLUB OF ROME (an international group of economists, managers and environmental scientists who founded the group in 1968 and later formulated their views in the book called LIMITS OF GROWTH) over-population was at the root of all problems of development in the THIRD WORLD. Further, the CLUB OF ROME shifted the responsibility of world environment pollution on the countries of the Third World because of 'over use' and 'misuse' of resources. They did not of course, mention that the multinationals of the developed countries were mainly responsible for the misuse of Third World resources.

Positive approach :

The other approach basically views population as a resources which has to be nourished, preserved and scientifically managed so that their full potential can be profitably used in the development of the country.

Negative Vs. Positive approach - 1 :

The negative apprcach of the CLUB OF ROME identifies poverty as the result of over-population. The alternative positive approach views poverty, illiteracy, infant mortality and problems of health, lack of shelter and jobs

as the end products of social mismanagement and distorted man-management.

Negative Vs. Positive aproach - II :

It is an universally accepted fact that a scientific management through removal of these problems is positively co-related with decrease in the rate of growth of population. That is what has happened all-over the developed world. Even in our country,Kerala is an example of what happens if only literacy becomes high particularly among women.

Relative nature of the problems :

There is another aspect of the question. Over population itself is a relative term. What is over population in a backward country may not be considered over population in an a dvanced economy. The carrying capacity of land is not a fixed entity. As quality and productivity of land improve, its carrying capacity also goes up. We have the examples of non-irrigated mono-culture and poverty-stricken backward areas side by side with irrigated, multiple-cropping and with flourishing economy.

Resource Management — The Key questions :

Thus, just like human resources, all other resources may be misused or scientifically used. The development of human resources, therefore, is intimately linked with the scientific management of all other resources that nature provides us, like waters, air, land, biotic resources, and so on.

Management of human resources :

Every progressive society must give utmost importance to the development of human resources which alone is capable of scientific use and management of natural resources. It has, therefore, to be understood that man is the most cherished of all resources that a society may possess. Such a resource should not be misused, wasted or frittered away.

The population education programme is an initiative to mould the minds of the young generation, the future citizens, through our teachers in schools, on the basis of a value system which does not deny that a mismanaged population may cause serious problems to development, but is firmly oriented to looking at man as the most precious resource ,which has tc be scientifically managed in the interest of a nation's development.

In fine, population education is education for human resource development.

জনসংখ্যা শিক্ষাভাবনা-নতুন মানবসম্পদ বিকাশের শিক্ষা

অধ্যাপক সুনীল কুমার মুন্সী

১) সমস্যা ঃ

বর্তমান পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও উন্নত জীবনমানের জন্য সর্বজনীন ব্যবস্থাপনার মধ্যে ক্রমবর্ধমান ফারাক গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। কারণ এই ব্যবধান তৃতীয় দুনিয়ার জনসংখ্যার এক বিপুলাংশকে দারিদ্র্য ও তীব্র অভাব-অনটনের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে, মানুষের মতো বেঁচে থাকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে।

উদ্বেগের অন্যতম কারণ হ'ল, এই বিপুল জনসংখ্যার নিত্যপ্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ অপব্যবহারের ফলে পরিবেশ দূষণের ব্যাপ্তি। একথা এখন সর্বজন স্বীকৃত যে মানুষ ও তার পরিবেশের মধ্যে কাংখিত ভারসাম্য গুরুতররূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে চলেছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানো, সকলের জন্য উন্নত জীবনমান প্রবর্তন এবং পরিবেশকে দূষণ মুক্ত করার প্রশ্নে সহমতে পৌছাবার উদ্দেশ্যে গত কয়েক দশকে বিশ্বে একাধিক আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহুত হয়েছে, তাতে দীর্ঘ বিতর্ক ও আলোচনা হয়েছে। এমন তিনটি উল্লেখযোগ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল—সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে ১৯৭২ সালে, বুখারেস্টে ১৯৭৪ সালে, মেক্সিকো সিটিতে ১৯৮৪ সালে। প্রথম সম্মেলনটির আলোচ্য বিষয় ছিল মানবিক পরিবেশ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সম্মেলনগুলি সোজাসুজি আলোচনা করেছে জনসংখ্যার সমস্যা নিয়ে। সর্বশেষ সম্মেলন হয়েছে রিও-ডি-জেনেইরোতে ১৯৯২ সালের জুন মাসে, যা কসমুল শীর্ষ সম্মেলন নামে খ্যাত।

এ বিষয়ে আজ দ্বিমত নেই যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির নিয়ন্ত্রিত হার যে কোন দেশের স্বাস্থ্যের পক্ষে সর্বাংশে কাম্য। পরিবেশের ক্ষতি কমিয়ে আনা ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা প্রয়োজনানুগ করে তোলার বিষয়টিও এই সহমতের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য রয়ে গেছে কর্তব্য নিয়ে, বিশেষ করে সদ্যস্বাধীন দেশগুলিতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পথ এবং উন্নয়ন ও পরিবেশ রক্ষা — এই দু'টি ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের প্রশ্নে।

২) দৃষ্টিভঙ্গি ঃ আপদ

পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে আপদ মনে করা আজকে নতুন নয়। ইংরেজ অর্থনীতিবিদ টমাস রবার্ট ম্যালথস্ ১৭৯৮ সালে একটি প্রবন্ধে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও হ্রাসের সমস্যা নিয়ে তাঁর বক্তব্যে এই আপদের দৃষ্টিভঙ্গি খুব স্পষ্ট করে প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর মতে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির তুলনায় মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় দ্রুততর গতিতে। ফলে সময়মত জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করা না গেলে যুদ্ধ বিগ্রহ, রোগভোগ, দারিদ্র ও খাদ্যাভাব সেই কাজ করবে। অর্থাৎ অধিক জনসংখ্যার আপদ নিজেদের উদ্যোগে বিদায় না করতে পারলে আর্থ-সামাজিক নিয়মেই তা বিদায় হবে।

এই দৃষ্টিভঙ্গিরই আধুনিক সংস্করণ দেখা গেছে 'ক্লাব অব রোম' নামক একটি আন্তর্জাতিক গোষ্ঠির বক্তব্যে। গোষ্ঠিটির প্রথম অধিবেশন হয় ১৯৬৮ সালে, রোমে। তাদের বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল বর্তমান পৃথিবীর অতি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলি মেটানোর পথ নির্দেশ করা। তাঁদের আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে ছিল ধনী ও দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে জীবন মানের ব্যবধান এবং

পরিবেশের দ্রুত অবক্ষয়। তাদের মূল বক্তব্য প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালে 'লিমিটস অব গ্রোথ' নামক পুস্তকে। এই বক্তব্যে বলা হয়েছে, তৃতীয় দুনিয়ার ক্ষুধা, দারিদ্র ও পরিবেশ দূষণ — এই সব কিছুর জন্য দায়ী জনসংখ্যা বৃদ্ধি। এর প্রতিষেধক দাওয়াই হ'ল, শিল্প কৃষিসহ সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয়, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার রোধ।

এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তারা ভবিষ্যৎ পৃথিবীর এমন চিত্র আঁকেন যাতে দেখানো হয় উপছে পড়া জনসংখ্যায় মানুষের বসবাসের স্থান সংকুলান হবে না, খাদ্যবস্ত্রের অভাব চরমে উঠবে, মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী জোগান দিতে প্রাকৃতিক সম্পদ যাবে নিঃশেষ হয়ে, কলকারখানা থেকে নিসৃত গ্যাসে পৃথিবীর রক্ষাকবচ 'ঘনীভূত অক্সিজেন স্তর' যাবে ক্ষয় হয়ে, জলবায়ু হয়ে উঠবে বিষাক্ত। এমন ভয়াবহ মৃত্যুর হাত থেকে পৃথিবীকে বাঁচাতে হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে ছলে বলে কৌশলে আটকাতেই হবে। শিল্পোন্নত দুনিয়ায় যেহেতু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার মোটামুটি স্তব্ধ হয়ে এসেছে, তাই দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে তৃতীয় দুনিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রতি,যেখানে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার খুব বেশী। এখানে কৃষি বা শিল্প বিস্তারের চেয়েও অনেক বেশী জরুরী হয়ে উঠেছে জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ রক্ষার জন্য আশু পদক্ষেপসমূহ।

৩) দৃষ্টিভঙ্গি ঃ সম্পদ

আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানীদের এক বড় অংশ উপরোক্ত অভিমত গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন না। তাঁরা মনে করেন শুধুমাত্র জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রচার ও আইন কানুন এবং বাধ্যবাধকতার বেড়াজালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। জীবনমানের সার্বিক উন্নতিই বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং পরীক্ষিত উপায়।

তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলি থেকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বার বার বলা হয়েছে, দারিদ্রই জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম মূল কারণ। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে বৃদ্ধির হার যে আজ স্তব্ধ হয়ে এসেছে তার কারণ সেখানে কয়েকশ' বছর ধরে ঔপনিবেশিক শোষণের উদ্বৃত নিয়ে যে প্রাচুর্য সৃষ্টি হয়েছে তার ফলে জীবন মান হয়েছে উন্নত।

কাজেই দারিদ্র দূর করার জন্য দ্রুত শিল্প ও কৃষি সহ সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথই তৃতীয় দুনিয়ায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পথ।

আর্থ-সামাজিক জীবন মানের সামান্যতম উন্নতি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে কতখানি প্রভাবান্বিত করে,তার নিদর্শন আমাদের দেশের দক্ষিণের ছোট রাজ্য কেরল।

কেরলে ১৯৮১ সালে প্রতি কিলোমিটারে জনসংখ্যা ছিল সর্বাধিক — ৬৫৪ । কেরলই ভারতের একমাত্র রাজ্য যেখানে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা বেশী, অর্থাৎ প্রতি হাজার পুরুষে ১,০২১ নারী। এখানে নারী-পুরুষের বিবাহের গড় বয়স সারা দেশের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু (পুরুষ ঃ ২৭.১৯ বছর, নারী ঃ ২১.৮৫ বছর)।

. এ রাজ্যে নারী-পুরুষের পূর্ণ সাক্ষরতা অর্জিত হয়েছে। এই সবের ফলে কেরলে জন্মহার ও নারীর উর্বরার হার সবচেয়ে কম।

একই ভাবে একথা আজ স্বীকৃত যে দারিদ্রকেই পরিবেশ দূষণের জন্য মূলত দায়ী করা যায়। দারিদ্র থেকে মুক্তির পথেই আছে পরিবেশ দূষণ থেকে তৃতীয় দুনিয়ার মুক্তির পথ। ১৯৭২ সালে স্টকহোম সম্মেলনে সেই কথাই বলেছিলেন উন্নয়নশীল দেশগুলির নেতৃবৃন্দ। অর্থাৎ মানুষ আপদ নয়, সম্পদ। সেই সম্পদের পূর্ণ বিকাশ, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং নিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার — সবই একসূত্রে গ্রথিত। এরই মধ্যে প্রতিটি মানুষের জন্য সামাজিক দায়িত্ববোধ অন্তর্নিহিত আছে। কাজেই এই দিক দিয়ে দীর্ঘমেয়াদী ও মৌলিক পথ একটিই যা হল, জীবন

মানের সার্বিক উন্নতি সাধনের সামাজিক দায়িত্ব পালনের পথ।

৪) সম্পদের অপব্যবহার ও পরিবেশ দূষণের সমস্যা ঃ

যাঁরা বোঝাবার চেষ্টা করেন যে অত্যধিক জনসংখ্যার চাপে তৃতীয় দুনিয়ায় সম্পদের অবক্ষয় দ্রুত ঘটছে, তাঁরা বিকৃত তথ্য পরিবেশন করেন।

একথা এখন সর্বজন স্বীকৃত যে শিল্পোন্নত দুনিয়ার ভোগলিপ্সাই পৃথিবীর সম্পদ অবক্ষয়ের জন্য মূলত দায়ী। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার মাত্র ২৫ শতাংশ শিল্পোন্নত দেশগুলিতে বাস করে। কিন্তু এই ২৫ শতাংশের চাহিদা মেটাতে ব্যবহৃত সম্পদের ৭৫ শতাংশ ব্যয়িত হয়। এক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথাই যদি ধরা যায়, তবে দেখা যাবে এই দেশে বসবাসকারী পৃথিবীর মাত্র ৬ শতাংশ মানুষ বিশ্বের ব্যবহৃত সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ ভোগ করে। মার্কিন লেখক ডবলিউ. এইচ. ডেভিস্ তাঁর বইতে দেখিয়েছেন যে ভারতের একজন সাধারণ নাগরিক অতি সামান্য সম্পদই ব্যবহার করে থাকেন। তাঁর দৈনিক প্রয়োজন কয়েক মুঠো চাল বা গম, একটু জল, পরিধেয় একটুকরো কাপড় ও আশ্রয় হিসাবে মাটির একটি কুড়ে ঘর। একজন মার্কিন নাগরিকের চাহিদা তার তুলনায় আকাশচুম্বী। মার্কিন দেশের সব নাগরিকের সব চাহিদা একত্র করলে দেখা যাবে প্রতি বছর তা থেকে ১৪.২০ কোটি টন ধোঁয়া বা গ্যাস, ৭০ লক্ষ ভাঙ্গা গাড়ি, ২ কোটি টন কাগজ, ৪ হাজার ৮ শত কোটি নানা আকারের কৌটা., ২ হাজার ৬ শত কোটি বোতল, অগণিত প্লাস্টিকের ঠোঙ্গা জঞ্জাল হিসাবে শুধু আমেরিকা নয়, সারা বিশ্বের পরিবেশকে দূষিত করে তোলে। সেই দিক দিয়ে সমগ্র তৃতীয় দুনিয়ার জনসংখ্যার থেকেও পরিবেশকে বেশী দূষিত করছে এক মার্কিন দেশের নাগরিকরাই।

শিল্পোন্নত দুনিয়ার কলকারখানার এক অতি বৃহৎ অংশ মারণাস্ত্র উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। এই খাতে যে অর্থ লগ্নী করা আছে তার ভগ্নাংশ দিয়ে সমগ্র পৃথিবীর পরিবেশের উল্লেখযোগ্য উন্নতি সম্ভব ছিল।

তাছাড়া তৃতীয় দুনিয়ার সম্পদের উপর ক্রমশই বেশী কর্তৃত্ব করছে শিল্পোন্নত দুনিয়ার বহুজাতিক সংস্থাগুলি। তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলি প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের আশায় বিপুল পরিমাণে প্রাকৃতিক সম্পদ কাঁচা মাল হিসাবে প্রতি বছর বিদেশে রপ্তানী করে। আর পরিবেশ রক্ষার জন্য নিজের দেশে নিষিদ্ধ পণ্যসামগ্রী শিল্পোন্নত দেশগুলি তৃতীয় দুনিয়ায় পাচার করে। এমনই একটি পণ্য হল ডি ডি টি।

কাজেই জনসংখ্যার চাপে তৃতীয় দুনিয়ায় প্রাকৃতিক সম্পদ অবক্ষয়ের যুক্তি একেবারেই অসার।

৫) সম্পদের প্রকৃত সংজ্ঞা ও মানব সম্পদের প্রকৃতি ঃ

এখানে সম্পদ সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে পরিষ্কার করে নেবার প্রয়োজন আছে। সম্পদ হল মানুষের পরিবেশের সেইসব উপকরণগুলি যা মানুষের চাহিদা ও সামাজিক লক্ষ্য মেটাতে সাহায্য করে। প্রাকৃতিক উপকরণ যতক্ষণ না মানুষের ব্যবহার যোগ্য হয়ে ওঠে ততক্ষণ তাকে সম্পদ বলা চলে না। প্রাকৃতিক উপকরণে প্রাণ সঞ্চার করার জন্য তাই প্রয়োজন হয় তাকে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা। অর্থাৎ মানুষের কাছে উপকরণের কার্যকারিতাই তাকে সম্পদে পরিণত করে।

চারিত্রিক বিশেষত্বের ভিত্তিতে সম্পদকে অনেক ভাবে ভাগ করা হয়। কিন্তু অত বিশদ আলোচনার মধ্যে না গিয়ে বলা চলে ক্ষয়িষ্ণুতার দিক থেকে বিচার করলে প্রাকৃতিক সম্পদসমূহকে অফুরন্ত বা পুনর্ব্যবহারযোগ্য এবং ক্ষয়িষ্ণু বা পুনর্ব্যবহারের অযোগ্য এই দুটি

শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। উভয় শ্রেণীর সম্পদই সাবধানতার সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়, কিন্তু যে সম্পদ ব্যবহারে নিঃশেষ হয়ে যায় তা সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় অনেক বেশী।

মানুষ প্রকৃতির বাইরে নয়। কিন্তু প্রকৃতির অন্তর্গত হলেও তাকে এক বিশেষ ধরণের সম্পদ হিসাবে গণ্য করা হয়। তা শ্রমশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে সে প্রাকৃতিক উপকরণসমূহ ব্যবহারযোগ্য করে তাকে সম্পদে পরিণত করে। মানব সভ্যতার বিকাশের ইতিহাস হ'ল কৃৎকৌশল ও বিজ্ঞানের সহায়তায় প্রাকৃতিক উপকরণসমূহের উন্নত থেকে উন্নততর ব্যবহারের প্রবর্তন। সম্পদের উন্নত বা সদ্ব্যবহারের সোজা অর্থ হল, কঠোর নিয়ন্ত্রণ, সংরক্ষণ ও বহুমুখী ব্যবহার — সবটাই সমাজের বা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে। আজকে সভ্যতার মান নির্ণিত হয় সম্পদের সদ্ব্যবহারের মাপকাঠিতে। স্বভাবতই মানুষই এখানে পরিচালিকা শক্তি।

সম্পদ শ্রেষ্ঠ মানুষ জন্মেই পূর্ণ সম্পদে পরিণত হয় না। সম্ভাব্য থেকে প্রকৃত সম্পদে পরিণত করতে হলে মানুষকে তার শ্রমশক্তি, চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের সব পথ উন্মুক্ত করে দিতে হয়। এই দায়িত্ব সমাজের ও রাষ্ট্রের। এই দায়িত্ব যে জাতি বা দেশ পালন করতে সক্ষম হয়, মানব-সম্পদের অফুরন্ত শক্তি এসে যায় তার মুঠোয়। দরিদ্র, অভুক্ত বা অর্ধভুক্ত, নিরক্ষর, স্বাস্থ্যহীন এবং আশ্রয়হীন মানুষ সম্ভাব্য সম্পদের চরম অপব্যবহারের প্রতীক।

তা ছাড়া সত্যিই কি পৃথিবীর জনসংখ্যা এমন জায়গায় পৌঁছেছে যেখানে পৃথিবীর সীমিত সম্পদে আর তার কুশলসাধন সম্ভব নয়? একথা এখনও কেউ বলেন নি। ভূপৃষ্ঠের সম্পদ ছাড়াও সমুদ্রবক্ষের সম্পদ বহুকাল ধরে মানুষের চাহিদা মেটাতে পারে। কিন্তু প্রয়োজন নতুন নতুন সম্পদের চিহ্নিতকরণ সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার ও সদব্যবহার। বর্তমান সভ্যতায় বিজ্ঞান ও কৃৎকৌশল এই দায়িত্বই পালন করছে। কয়লা কেন শুধু জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হবে? কয়লার পরোক্ষ ব্যবহার ক্রমশই অতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। কয়লা থেকে অ্যামোনিয়া, আলকাতরা, ন্যাপথলিন, স্যাকারিন, গ্যাস, কৃত্রিম পেট্রোল, গন্ধক, বেঞ্জন প্রভৃতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বহুল ব্যবহৃত দ্রব্য তৈরি হচ্ছে। ভবিষ্যতে আরও কত রকম ব্যবহার আবিষ্কৃত হবে তা কে বলতে পারে? কাজেই যারা অন্ধকার ভবিষ্যতের প্রবক্তা তাদের কথা বিনা দ্বিধায় মেনে নেবার কোন যুক্তি নেই।

৬) জীবন মান উন্নয়নের উপাদানসমূহ ঃ

মানব সম্পদের পূর্ণ বিকাশের সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যার যে ওতপ্রোত যোগাযোগ রয়েছে তা বুঝতে গেলে জীবনমান উন্নয়নের উপাদানসমূহ ও তাদের কার্যকারিতা সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার করা প্রয়োজন। জীবনমানের উপাদানগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে, যথা, বৈষয়িক, সাংস্কৃতিক ও স্বাস্থ্যগত। এগুলি সর্বক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সরাসরি জীবনমানকে প্রভাবিত করে।

বৈষয়িক উপাদানের মধ্যে রয়েছে জীবিকা, খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা। সাংস্কৃতিক উপাদানের মধ্যে রয়েছে শিক্ষার সুযোগ ও মানুষের পূর্ণতর বিকাশের জন্য অন্যান্য সাংস্কৃতিক ও মানসিক চাহিদা মেটানোর আয়োজন। স্বাস্থ্যগত উপাদানের মধ্যে পুষ্টিকর খাদ্য সংস্থানের সঙ্গে আছে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা। এই সব উপাদানগুলির মধ্য দিয়ে মানুষকে পূর্ণতর সামাজিক নিরাপত্তা দিতে পারলে তার বিকাশের মৌলিক ভিত্তি নির্মিত হতে পারে। এই দায়িত্ব সমাজের, রাষ্ট্রের। মানব সম্পদের বিকাশের অন্য কোন বিকল্প পথ নেই।

৭) মানবসম্পদ বিকাশে মেয়েদের সামাজিক অবস্থা ও পরিবেশের উন্নতির সম্পর্ক ঃ

(ক) মেয়েদের সামাজিক অবস্থা ঃ

মানবসম্পদ বিকাশে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে জনসংখ্যার সেই অর্ধেক অংশ মেয়েদের প্রতি

– যারা এতদিন সমাজে প্রশ্নাতীতভাবে থেকেছে অবহেলিত এবং যারা এখনও রয়ে গেছে সবরকমের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বাইরে।

একথা এখন সর্বজনবিদিত যে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মানের উন্নতি এবং জীবিকার সংস্থান যে কোন দেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত। সমাজের অর্ধেককে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বাইরে রেখে কোন সত্যিকারের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই মেয়েদের সামাজিক অবস্থান আজ এত জরুরী একটি বিশ্বময় আন্দোলনের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে।

এই জন্যই জাতি সংঘ ১৯৭৫ সালকে আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ এবং আন্তর্জাতিক নারী দশক হিসাবে ঘোষণা করেছিল এবং দক্ষিণ এশিয় রাষ্ট্রসমূহ এখন শিশুকন্যা দশক পালনে উদ্যোগী হয়েছে।

নানা সমস্যায় জর্জরিত ভারতের অসংগঠিত মেয়েদের অবস্থার একটা সামগ্রিক সমীক্ষার উদ্দেশ্যে যে জাতীয় কমিশন ১৯৮৭ সালে তৈরি হয়েছিল তার রিপোর্টে বলা হয়েছে, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা বেশী হলেও, ভারতবর্ষ সহ অল্প কয়েকটি দেশ এর ব্যতিক্রম। আমাদের দেশে ১৯৮১ সালের হিসাবে প্রতি এক হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা ছিল ৯৩৩ । ১৯৯১ সালে অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। এই অবস্থার কারণ শৈশবে মেয়েদের মধ্যে উচ্চ মৃত্যু হার, তাদের প্রতি সামাজিক বৈষম্য এবং তাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে অবহেলা।

জীববিজ্ঞানে মেয়েদের জীবনীশক্তি পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশী স্বীকৃত হলেও ভারতবর্ষে সাধারণভাবে মেয়েদের মৃত্যুহার পুরুষদের চেয়ে বেশী। মেয়েদের মৃত্যুর এক ষষ্ঠাংশই ঘটে জীবনের প্রথম বর্ষে এবং ২৭ শতাংশ প্রথম চার বছরে। মেয়েদের মধ্যে ব্যাপক নিরক্ষরতা এবং বাল্য বিবাহের প্রচলন ঃ এত বেশী শিশু মৃত্যুর জন্য দায়ী।

কমিশন বলেছে, আজও পর্যন্ত প্রসূতি মৃত্যুর হার অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে অনেক বেশী। ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের ক্ষেত্রে বাল্য বিবাহ অনেক ব্যাপক।

ভারতে মেয়েদের উন্নয়নের পথে অন্যতম প্রধান বাধা ব্যাপক নিরক্ষরতা। ১৯৮১ সালে ভারতে মেয়েদের মাত্র ২৪.৮ শতাংশ ছিল সাক্ষর। দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জেলাগুলিতে গ্রামীণ মেয়েদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ছিল ১০ শতাংশেরও কম। অনেক অঞ্চলে তপশিলী ও আদিবাসী জাতির মেয়েদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ছিল প্রায় শূণ্যের কোঠায়। ১৯৮১ সালের জনগণনায় ভারতের মাত্র ১৪ শতাংশ মেয়ে দেশের শ্রমবাহিনীর অংশ ছিল। অবস্থার কোন গুণগত উন্নতি গত ১০ বছরে হয়নি।

কোন দেশে জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশী অংশকে এমন অসহনীয় অবস্থার মধ্যে রেখে উন্নয়নের কথা ভাবা বাতুলতা। মানব-সম্পদের চূড়ান্ত অপব্যবহারের এমন নজীর খুবই কম আছে। **তাই মানব-সম্পদ বিকাশের জন্য প্রথম পদক্ষেপই হতে হবে মেয়েদের এই অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন।** এবং একথা আজ প্রমাণিত যে মেয়েদের সামাজিক অবস্থার উন্নতি সরাসরি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে নিয়ন্ত্রণ করে। কেরলই তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

(খ) পরিবেশ রক্ষা / সুস্থ পরিবেশ ঃ

পরিবেশ রক্ষা এবং মানবসমাজের জন্য একটি সুস্থ প্রাকৃতিক পরিবেশ গড়ে তোলার মধ্যেও মানব সম্পদ বিকাশের উদ্দেশ্য অন্তর্নিহিত আছে। আসলে আমাদের এই পৃথিবীতে সব মানুষের জন্য ক্রমোন্নত জীবনধারণের সংস্থান করতে হলে প্রয়োজন সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ, সদব্যবহার এবং যেখানে সম্ভব সেখানে নবীকরণের ব্যবস্থা। প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণও সদব্যবহার এবং তৃতীয় দুনিয়ার উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে অনেক সময়ে পরস্পরবিরোধী করে দেখানোর

চেষ্টার প্রতিবাদ সেই ১৯৭২ সালের স্টকহোম সম্মেলন থেকে ১৯৯২ সালের রাইও-ডি-জেনেইরোর 'আর্থ সামিট' বা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নিয়ে মহাসম্মেলনে বার বার উচ্চারিত হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলি থেকে বলা হয়েছে, পরিবেশকে অহেতুক ক্ষতিগ্রস্ত না করে বিজ্ঞানসম্মত নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার মানুষ ও পরিবেশের মধ্যে যে সুস্থ ভারসাম্য সৃষ্টি করা সম্ভব, মানব সম্পদ বিকাশের জন্য তার মূল্য অসীম।

তাই একথা আজ সকলেই স্বীকার করেন যে জীবন মান উন্নয়নের জন্য বিষমুক্ত প্রাকৃতিক পরি`৺ স্ত্রী-পুরুষের সমাজ অধিকারের ভিত্তিতে মানবসমাজের বৈষয়িক, স্বাস্থ্যগত এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নের পথই হ'ল দীর্ঘমেয়াদী বিজ্ঞানসম্মত নিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যার পথ। একমাত্র এই পথেই সম্পদ হিসাবে মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশ ও সামাজিক স্বার্থে তার পূর্ণ সদব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

৮) উদ্দেশ্য ঃ -

(ক) লক্ষ্যবস্তু ঃ

মানব সম্পদ সম্পর্কে উপরোক্ত ধারণা সমাজের চিন্তাধারায় প্রতিফলিত করতে হলে চেতনায় যে মৌলিক পরিবর্তন প্রয়োজন সেকাজ কষ্টসাধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী। এর জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ক্ষেত্র হ'ল আমাদের মতো দেশে বিধিবদ্ধ ও বিধিমুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা যার সাহায্যে কিশোর শিক্ষার্থীদের মানসিকতায় জাতীয় জীবনে মানব-সম্পদ বিকাশের সমস্যা ও তাৎপর্য সুস্পষ্ট করে এঁকে দেওয়া যায়।

কিন্তু শুধুমাত্র পাঠক্রমের পরিবর্তন সাধন করে, অথবা পাঠক্রমে নতুন একটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে এই কর্তব্য পালন সম্ভব নয়। বিধিবদ্ধ বা বিধিমুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাঁরা মনে করেন পাঠক্রমে একটি নতুন বিষয় হিসাবে মানব সম্পদের আলোচনা প্রবর্তন করলে বর্তমান পরিস্থিতিতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে বা। হয়ত বা ফল বিরূপও হতে পারে, শিক্ষার্থীদের মনে বিষয়টি সম্পর্কে অনীহা সৃষ্টির কারণও হতে পারে।

তাই বিধিবদ্ধ শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে যে পাঠক্রম বর্তমানে চালু আছে, তা বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান বা কলা যে কোন বিষয়ই হোক না কেন, — তার পঠন-পাঠনের মধ্যেই মানব-সম্পদের ধারণা গ্রথিত করে দিতে হবে। অন্যদিকে বিধিমুক্ত শিক্ষার সমস্ত ব্যবস্থাপনায় মানবসম্পদ বিকাশের সমস্যা ও তার তাৎপর্যের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যাই হয়ে উঠতে পারে মূল লক্ষ্যবস্তু।

বিধিবদ্ধ শিক্ষার ক্ষেত্রে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণীগুলির কিশোর শিক্ষার্থীদেরই এই ব্যাপক জাতীয় কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

কিন্তু বিধিবদ্ধ শিক্ষায় নিযুক্ত বিদ্যায়তনগুলিতে যে শুধুমাত্র অনুমোদিত পাঠক্রমে পাঠ্যসূচীর ভিত্তিতে পঠন-পাঠন হয় তা নয়। শারীরিক ও মানসিক বিকাশের অতীব তাৎপর্যপূর্ণ এই বছরগুলিতে পাঠক্রম বহির্ভূত নানা কাজকর্ম ও খেলাধুলার ভিত্তিতে কিশোর কিশোরীদের মনে যেসব সুস্থ সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টির চেষ্টা হয়, তারই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে মানবসম্পদ বিকাশের প্রশ্নটিকে। বিদ্যায়তনগুলির সামগ্রিক পরিবেশকে এই কাজে ব্যবহার করার জন্য উদ্যোগকে জাতীয় গুরুত্বের মর্যাদা দিতে হবে।

বিধিমুক্ত শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যায়তনগুলির বাইরে সমাজের বৃহত্তর পরিবেশের মধ্যে এই কথা ছড়িয়ে দিতে হবে।

(খ) মাধ্যম ঃ

বিধিবদ্ধ শিক্ষার কাজে ব্যাপৃত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যায়তনগুলির শিক্ষক সমাজ এবং

বিধিমুক্ত শিক্ষার কর্মীরাই এই কর্তব্য পালনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন। কিশোর মনে সুস্থ সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টির কাজে তাঁরাই সবচেয়ে উপযুক্ত মাধ্যম। মাধ্যম হিসাবে তাঁদের দায়িত্ব যাতে তাঁরা পালন করতে সক্ষম হন তার জন্য প্রাথমিক কর্তব্য হোলো, মানব-সম্পদের বিষয়টি তাঁদের কাছে উত্থাপন করা এবং যুক্তি তর্ক বিচার বিবেচনার মধ্য দিয়ে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বচ্ছ করতে সাহায্য করা।

এই কারণে যদিও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিধিবদ্ধ পাঠক্রমের এক নতুন বিষয়সূচী হিসাবে মানব-সম্পদের আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক সমাজের জন্য শিক্ষক-শিক্ষণ পাঠক্রমে তা গ্রহণ করা হয়েছে।

কিন্তু একে শুধু শিক্ষক-শিক্ষণ পাঠক্রমে একটি নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্তির সমস্যা হিসাবে ধরে নেওয়া ঠিক হবেনা। পাঠক্রমের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই এই মূল্যবোধের ধারণা আনতে সচেষ্ট হতে হবে। বিদ্যায়তনগুলির শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপযুক্ত মাধ্যম হিসাবে গড়ে তোলার এইটিই হবে পথ।

বিধিমুক্ত শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ করে স্বশিক্ষণ উপকরণ তৈরিতেও মানব-সম্পদ বিকাশের নানা দিক সম্পর্কে শিক্ষাকর্মীদের মানসিক প্রস্তুতি গড়ে তোলাও হবে অন্যতম দায়িত্ব।

(গ) কর্তব্য পাঠক্রমের উন্নয়ন ঃ

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কয়েকটি কর্মশালায় চালু পাঠক্রমের বিস্তারিত পর্যালোচনা করে দেখা গেছে পাঠক্রমের প্রায় সমস্ত বিষয়ের মধ্যেই মানব-সম্পদ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা সংশোধিত করে সঠিক ধারণা পরিবেশন করা উচিত ও সম্ভব। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ এই কর্মশালাগুলির আয়োজন করেছিলেন। মানব-সম্পদ বিকাশের জন্য শিক্ষামূলক প্রকল্পের অন্তর্গত ছিল এই কর্মশালাগুলি। **প্রকল্পের জন্য সাহায্য এসেছে জাতীয় শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের (NCERT) মাধ্যমে জাতি সংঘের একটি সংস্থার (UNFPA) কাছ থেকে।**

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে চালু পাঠক্রমে কোথায় ও কিভাবে মানব-সম্পদের ধারণাগুলি অঙ্গীভূত করা যায় তা নিম্নলিখিত তিনটি উদাহরণ থেকে স্পষ্ট হবে। এই তিনটি উদাহরণ নেওয়া হয়েছে নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে বর্তমানে ব্যবহৃত তিনটি বিষয়ের প্রচলিত পাঠক্রম থেকে। বিষয় তিনটি হ'ল ভূগোল, জীববিজ্ঞান ও অর্থনীতি।

ভূগোল

ভূগোলে নবম ও দশম শ্রেণীতে ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের বন্টন ও ব্যবহার, জনসংখ্যার বন্টন ও ঘনত্ব আলোচনা করা হয়েছে। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে আলোচিত হয়েছে সম্পদের সংজ্ঞা, তার ব্যবহার ও অপব্যবহারের উদাহরণ এবং প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সহ-অবস্থানের আঞ্চলিক চিত্র।

ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের আলোচনা প্রসঙ্গে শিক্ষার্থীদের কাছে ব্যবহারের মান, মান উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা এবং মান উন্নয়নের ফলে জনসাধারণের চাহিদা মেটানোর ক্ষমতা বৃদ্ধি সম্পর্কে সঠিক ধারণা পরিবেশন করা উচিত। শিল্পোন্নত যে কোন দেশের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করলেই দেখা যাবে আমাদের দেশের সম্পদের শুধুমাত্র উন্নততর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন ও অগ্রগতির বিকাশ অনেকদুর পর্যন্ত সম্ভব।

শুধুমাত্র কৃষির কথাই যদি ধরা যায় তবে দেখা যাবে ভারতে কৃষির জন্য যে পরিমাণ জমি বর্তমানে ব্যবহার করা হচ্ছে তাতে প্রতিটি ফসলে একর প্রতি উৎপাদনে আমাদের দেশ জাপানের

মতো দেশের তুলনায় অনেক পিছিয়ে রয়েছে। কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য আধুনিক কৃৎকৌশলের সাহায্যে ভূ-সম্পদের ব্যবহার উন্নততর করতে পারলে,এই পশ্চাৎপদতা দূর করা সম্ভব। ভারতের অল্প কিছু অঞ্চলে সবুজ বিপ্লবের অভিজ্ঞতা প্রমান করে কৃষিজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে কি বিপুল অগ্রগতি আনা যেতে পারে। যতটুকু অগ্রগতি হয়েছে তারই ফলে স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে খাদ্যে পরনির্ভরশীলতা কাটিয়ে ভারত স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পেরেছে। প্রতিটি ফসল নিয়ে এ আলোচনা করা যেতে পারে।

খনিজ সম্পদের আলোচনায় ব্যবহার ও অপব্যবহারের বহু উদাহরণ আছে। আমাদের আর্থিক ও কারিগরি অক্ষমতার ফলে খনিজ সম্পদ চিহ্নিতকরণের কাজ যে ব্যাহৃত হয়েছে, সম্পদের পূর্ণতর ব্যবহার যে সম্ভব হয় নি তা বোঝা যায় খনিজ তৈল শিল্পের অভিজ্ঞতা থেকে। আমাদের দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ অপব্যবহারের অসংখ্য উদাহরণ আছে। এই আলোচনার ভিত্তিতে এমন কথা শিক্ষার্থীদের বোঝানো যায় যে উন্নততর সম্পদ ব্যবহারে ভারতের মতো সুবৃহৎ জনবহুল দেশের মানুষের চাহিদা এখনো অনেকদূর পর্যন্ত মেটানো সম্ভব।

জীবন বিজ্ঞান

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাঠক্রমে মানব-সম্পদ বিষয়ক শিক্ষার ভাবধারা যে সব স্থানে সংযুক্ত করা সম্ভব সেগুলি নিম্নলিখিতরূপ।

নবম ও দশম শ্রেণীর জীবন বিজ্ঞানের পাঠক্রমে আছে সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে সৌর শক্তির রূপান্তর, অক্সিজেন ও কার্বন-ডাইঅক্সাইডের ভারসাম্য রক্ষা ও সমস্ত প্রাণীজগতের মৌলিক খাদ্য যোগান দেওয়ায় উদ্ভিদের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা। আলোচনা করা হয়েছে সহজলভ্য ও স্বল্পব্যয়ে সুষম খাদ্য প্রাপ্তি এবং খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে খাদ্যসামগ্রীর সুষম ব্যবহার নিয়ে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় মানুষের ভূমিকার বিশ্লেষণে সম্পদের পৌনঃপুনিক ব্যবহার, পুনরাবর্তন ও সংরক্ষণের সমস্যা, অজৈব ও সজীব উপাদানের সঠিক ভারসাম্য রক্ষার প্রশ্ন এবং পরিবেশ দূষণের প্রতিকার নিয়ে বক্তব্য উপস্থিত করা হয়েছে।

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে আছে মানুষসহ অন্য যে কোন সজীব দেহের কোষীয় গঠনের তুলনামূলক আলোচনা। পৃথিবীর সব মানুষের ক্রোমোজোম সংখ্যা সমান হওয়ায় বিভিন্ন জাতির মধ্যে মৌলিক কোন ভেদাভেদ নেই। আর আছে সুপ্রজনন বিদ্যার ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে উন্নতও পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদন ও রোগমুক্তি ; অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদ সম্পর্কে আলোচনা ; জনন কোষের মিলনে বাধা সৃষ্টি করে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা ; প্রাকৃতিক দূষণের সঙ্গে বিভিন্ন প্রকার সামাজিক দূষণ, যেমন দারিদ্র, ক্ষুধা, কুসংস্কার, নিরক্ষরতা ইত্যাদির তুলনামূলক আলোচনা।

উপরোক্ত বিষয়গুলির আলোচনায় শিক্ষার্থীদের কাছে মানব-সম্পদের বিকাশ সম্পর্কে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধ্যান ধারণা পরিষ্কার করে উপস্থিত করা সম্ভব। এর ফলে পাঠক্রমকে ভারাক্রান্ত না করেও মানব-সম্পদ বিকাশের সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে সচেতন করে তোলা যায়।

অর্থবিদ্যা

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষায় বিভিন্ন বিষয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত অর্থবিদ্যা। প্রচলিত পাঠক্রম পর্য্যালোচনা করলে দেখা যাবে অর্থবিদ্যায় প্রথম অধ্যয়ন "উৎপাদন ও উৎপাদন ব্যবস্থা" থেকে শুরু করে "জাতীয় "আয়, মাথা পিছু আয় এবং আয় বন্টন ব্যবস্থার" আলোচনার মধ্য দিয়ে সর্বশেষ অধ্যায়ের "আর্থ—সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন"-এর ব্যাখ্যায় মানব-সম্পদ বিকাশের মৌলিক কথাগুলি বলা যায় ও বলা প্রয়োজন।

মানবসমাজে উৎপাদনের মূল উপাদান হ'ল মানুষের শ্রমশক্তি। কাজেই অর্থবিদ্যার প্রায় সমস্ত অংশেই মানব-সম্পদের আলোচনা প্রায় অবধারিত।

অর্থবিদ্যার প্রধাণত যে চারটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় তা হ'ল উৎপাদন, উৎপাদিত দ্রব্যের বণ্টন, বিনিময় ও ভোগ। এই চারটি কাজেই সম্পন্ন হয় মানুষের দ্বারা।

কোন বস্তু যখন উৎপন্ন হয় তখন তার জন্য প্রয়োজন হয় মানুষের শ্রমশক্তির। উৎপাদনের সময় উপকরণগুলির মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, অথবা ব্যবহারমূল্য ও বিনিময় মূল্যের মাধ্যমে যে আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়,তাই শেষ পর্যন্ত কোন দেশের আর্থ-সামাজিক প্রকৃতি নিরূপন করে। এই সমস্ত প্রক্রিয়ার মধ্যে মানুষের গুণগত মান উন্নয়নই হ'ল মূল কথা।

মানুষের গুণগত মান নির্ভর করে মাথাপিছু প্রকৃত আয়ের উপর। মাথাপিছু আয়ের সুষম বণ্টন, সুশিক্ষা ও সুস্বাস্থ্যের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা মানব-সম্পদ বিকাশের জন্য প্রাথমিক কর্তব্য বলে গণ্য করা উচিত।

কাজেই বলা যায় অর্থবিদ্যার প্রতিটি অধ্যায়েই মানব-সম্পদ বিকাশের প্রশ্ন অন্তর্নিহিত আছে। কিন্তু বিশেষ করে চতুর্থ অধ্যায়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপাদানসমূহ আলোচনায় মানব-সম্পদের বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। এই অধ্যায়ে ভারতের জাতীয় আয় ও তার গঠন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির অর্থনৈতিক কারণ সমূহের ব্যাখ্যায় একথা সহজেই বোঝানো যায় যে নিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যার জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হ'ল মানব-সম্পদের বিকাশ। এই দুটি বিষয় পরস্পরের সঙ্গে এক অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত। অর্থাৎ মানবিক সম্পদের উন্নয়নই হ'ল সর্বোত্তম নিরোধ ব্যবস্থা।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান থেকে পদার্থবিদ্যা বা সাহিত্য পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ের পাঠক্রমেই অনুরূপ পরিবর্তন সম্ভব। পাঠক্রমকে অতিরিক্ত ভারাক্রান্ত না করেও মানুষ, সমাজ, রাষ্ট্র ও প্রকৃতির আলোচনাকে মানবসম্পদ বিকাশের দৃষ্টিভঙ্গিতে সমৃদ্ধ করা যায়। এই ভাবেই শিক্ষার্থীদের সুস্থ সামাজিক মূল্যবোধ তৈরীর কাজে বিদ্যায়তনের প্রচলিত শিক্ষার পরিবেশকে ব্যবহার করা সম্ভব।

(ঘ) পাঠ্যপুস্তকের ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ মানব-সম্পদ বিকাশের জন্য যে শিক্ষামূলক প্রকল্প গ্রহণ করেছে্ন, তার নানা আলোচনাচক্র ও কর্মশালায় একথা বোঝা গেছে যে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে চালু পাঠক্রমের অনেক স্থানে মানব-সম্পদের ধারণাগুলি আলোচনা করার সুযোগ রয়েছে।

এই কাজের দায়িত্ব সবটাই শিক্ষকদের উপর ন্যস্ত না করে পাঠ্যপুস্তকের উপর যদি খানিকটা ছেড়ে দেওয়া যায়, তাহলে সরাসরি ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে স্বশিক্ষণের জন্য বিষয়টি উপস্থিত করা সম্ভব হয়।

এর জন্য পাঠ্যপুস্তকের পাঠ্যাংশ ও কলেবর বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে সামান্যই। দরকার যা হবে তা হ'ল পাঠ্যপুস্তক রচয়িতাদের মানসিকতা ও চেতনায় প্রশ্নটিকে ঠিকভাবে উপস্থিত করা যাতে প্রচলিত পাঠক্রমের জন্য পুস্তক রচনার সময় মানব-সম্পদ বিকাশের অন্তর্নিহিত কথাগুলি শিক্ষার্থীদের সামনে সহজে হাজির করা যায়।

আসলে উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক রচনা শিক্ষা ব্যবস্থার অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক। পাঠ্যপুস্তক রচনার চারটি ধাপ আছে ঃ প্রথমত প্রয়োজন সুচিন্তিত পাঠক্রম প্রস্তুত করা। দ্বিতীয় ধাপে এই পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচনা করা। তৃতীয় ধাপে দরকার এমন একটি সম্পাদকমণ্ডলী যাঁরা রচিত পাঠ্যপুস্তকগুলিকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে তবেই ছাড়পত্র দেবেন।

সর্বশেষে প্রয়োজন রীতি পাঠ্যপুস্তকগুলির এমন যত্ন সহকারে প্রকাশনা যাতে সহজেই সেগুলি শিক্ষার্থীদের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপের কথা ইতিমধ্যেই আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় ধাপে রচিত পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের পূর্বে পরীক্ষার জন্য যে সম্পাদকমণ্ডলী কাজ করবেন তাদের চেতনাতেও মানবসম্পদ বিকাশ সম্পর্কিত ধারণাগুলি সঠিকভাবে গেঁথে দেবার প্রয়োজন আছে।

উপরোক্ত তিনটি ধাপে দায়িত্ব পালন করা গেলে পাঠক্রমের তালিকায় নতুন বিষয় গ্রহণ না করেও সামগ্রিক ভাবে শিক্ষার্থীদের চেতনা ও মানসিকতায় মানবসম্পাদ সম্পর্কে সঠিক বৈজ্ঞানিক ধ্যান ধারণা দে'ওয়া সম্ভব হবে বলে বিভিন্ন কর্মশালায় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা মত ব্যক্ত করেছেন।

মনে রাখা প্রয়োজন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্যের ১৫-১৬ বছর থেকে ১৮-১৯ বছরের কিশোর কিশোরীদের এক বিরাট অংশকে প্রয়োজনীয় শিক্ষাদানের প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থার মধ্যে মানবসম্পদ বিকাশের বিষয়টি উপযুক্তভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে পারলে একটি গুরুতর সামাজিক দায়িত্ব পালন করা হবে। ভবিষ্যৎ সমাজের যারা কর্ণধার হবে তাদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা দানের বাইরে সমাজ চেতনা বৃদ্ধির কাজে সহায়ক হবে।

(ঙ) শিক্ষক শিক্ষণে

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা পরিষ্কার যে আমাদের সমাজ ব্যবস্থার কিশোর কিশোরীদের কাছে পৌঁছতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হ'ল শিক্ষকসমাজ। আবার শিক্ষক সমাজের ব্যাপক অংশের চেতনায় মানবসম্পদ বিকাশের বিষয়টি বাস্তব করে তুলতে গেলে শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবহার সামান্য নিতান্ত প্রয়োজন।

কিশোর কিশোরী শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে যদিও প্রচলিত পাঠক্রমের কোন পরিবর্তন কাঙ্খিত নয়। কিন্তু শিক্ষক-শিক্ষণ পাঠক্রমে পৃথকভাবে মানবসম্পদ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন আছে।

আরও প্রয়োজন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকদের নিয়ে মাঝে মাঝে বিশেষ আলোচনাচক্র বা কর্মশালার ব্যবস্থা করা, যার মধ্য দিয়ে মানবসম্পদ সম্পর্কে ধ্যানধারণার আধুনিকীকরণের কাজ শিক্ষকদের মধ্যে ক্রমাগত চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। শিক্ষক শিক্ষণের প্রশ্নটি অন্যত্র বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

(চ) বিধিমুক্ত শিক্ষায়

বিধিমুক্ত শিক্ষায় মানবসম্পদ বিকাশের আলোচনা বিধিবদ্ধ শিক্ষার অনুরূপ হতে পারে না। বিধিমুক্ত শিক্ষার জন্য জনসংখ্যা শিক্ষা সহায়ক ও জনসংখ্যা শিক্ষা বিষয়ক স্বলিখন উপকরণসমূহের মধ্যে মানব সম্পদের কথাগুলি সহজ সরলভাবে উপস্থিত করা প্রয়োজন আছে।

তাছাড়া প্রদর্শনী ও নানাবিধ সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে এই সব ছেলে-মেয়েদের মনে বাস্তব পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি ও সমাজ সম্পর্কিত ধ্যান ধারণা পরিষ্কার করার সঙ্গে সঙ্গে মানব সম্পদের মূল কথাগুলি তুলে ধরা সম্ভব।

মানবসম্পদ বিকাশের প্রেক্ষাপটে বিধিমুক্ত শিক্ষার পড়ুয়াদের সমাজ ও পরিবেশ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসাকে সঠিকখাতে পরিচালিত করার জন্য রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ নানাবিধ স্ব-শিক্ষণ উপকরণ তৈরি করেছেন। এই উপকরণের ক্রমাগত পরিবর্তন ও পরিমার্জনের মধ্য দিয়ে তাকে সমৃদ্ধতর করার প্রয়োজন আছে। এ সম্পর্কে অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা আছে।

CHAPTER—2

Indian Population — Present Status, Distribution, Density and other Features :

Prof. Kamal Kumar Chatterjee.

SUMMARY

Introduction :

India's population continues to grow at the rate of 2.11 percent annually. The nation now adds 16 million people every year or as Professor P.N. Srivastava puts it "an australia". It is seen that upto 1921, population growth was small. After 1921, the growth has been steadily rising. In 1961-70, it was more than double of that in 1921-30. Upto 1921, both birth and death rates were equally high with only a small gap in between After 1921. death rate steadily declined. The year 1921 is, therefore, considered as the "great Divide"

Distribution

The spatial distribution and growth of population have largely been influenced by the interplay of geographical, histrorical, social and cultural factors. Madhya Pradesh and Uttar Pradesn together forming the central Zone, account for 22.4 per cent of the area and 23.8 per cent of the total population (1981 Census). The respective shares of the Eastern and the Southern Zones are 26 per cent and 24.1 per cent of India's population (1981 Census). The Western and the Northern Zones bear 14.3 per cent and 11.8 per cent of country's population respectively (1981 Census).

Density

The Northern Zone, with sparsely populated states of Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Rajasthan had the lowest density of 112.4 per square kilometre in 1981 and the Southern Zone had the highest density in comparison to other Zones. The density of population in the country according to 1991 census is 267 per square kilometre as against 216 at the 1981 census. West Bengal and Kerela are now the most density populated states in the country. A number of union Territories -- Chandigarh, Delhi, Lakshadweep and Pandicharry have much higher density of population. But the rate of growth of population of Kerale is the honest and the growth rates of population in West Bengal is not alarming although density of population is high due to migration is to some extent.

Sex and Age Composition

Sex and age are the most basic of all demographic characteristics. The objective measures used in the study of the sex composition of a population include the sex ratio, the masculinity proportion or feminity ratio. The uniform feature of all census from 1901 onwards is a continuous and almost uninterrpted higher proportion of males in the total population. In respect of age composition, India suffers from a heavy

burden of dependency, particularly at young ages. The sex-age pyramid of India has broad-based and steeply sloping sides, indicating a large proportion of children and young persons and a small proportion of old people in the population.

There are three basic components of population change, viz, fertility, mortality and migration, which determine the size and sex-age composition of the population of a region. The crude birth rate (CBR) of the country has long remained at a high level, but the recent data indicate a clear declining trend. The pace of decline in the crude death rate (CDR) is relatively rapid due to success in controlling epidemics like plague and small pox and on account of advancement in medical science and the technology. The review of mortality situation clearly reveals that the level of mortality among Indian females has always been higher than that of males due to the continued neglect of femaies, and in particular, the girl child.

The major migratory movements in India are rural to rural, particularly among females. Migration is largely of yonger proportion in the age group 15 to 35. The migration. flows of males are mainly for seeking employment.

Role of BIMARU States in Population stablisation

The 1991 Census data fully confirm the prognosis that the crux of India's population problem lies in the four problem states of Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh (in alphabetical order, the acronym is BIMARU) which account for 39 per cent of India's population and 42 per cent of the net addition to the population of India during 1981-91 decade. Unless these states progress socially, economically and demographically, India can never be on the path of population stablisation. The most disquieting feature of India's population, that is, unexpected decline in the sex ratio is also evident in these four major states in Hindi Heart land.

Literacy Map of India

Inspite of the rapid increase of literates during last decade (1981-91), the literacy rate continues to be low in several major states of India. The female literacy rate in India as a whole is less than 40 per cent and in a state like Rajasthan it is less than 21 per cent. On the whole, poverty and literacy are two major factors for contributing high rate of growth of Population.

The six states of Andhra Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Orissa, Rajasthan and Uttar Pradesh which comprise 51 per cent of India's population account for 59 per cent of the illiterate poulation of India.

Literacy rates in some Progressive States as in 1991 are as follows:

In per centage -- kerela (90.6), Tamil Nadu (63.7), Himachal Pradesh (63.5), Maharashtra (63.1), Gujarat (60.9), West Bengal (57.7), Punjab (57.1), Karnataka (56.0), Haryana (55.3) and Assam (53.4).

Literacy rates in some Weak States as stated above, are as follows :

Bihar (38.5), Rajasthan (38.8) Uttar Pradesh (41.7), Madhya Pradesh (43.5), Andhra Pradesh (45.1) and Orissa (48.6).

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতের বর্তমান জনসংখ্যার বিন্যাস, ঘনত্ব, এবং অন্যান্য দিক

অধ্যাপক কমল কুমার চ্যাটার্জী

মুখবন্ধ ঃ

কয়েকবছর আগে (২২.৯.৮৯) রাজধানী নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল রাষ্ট্রপুঞ্জের জনসংখ্যা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থার বিংশতিতম বার্ষিকী। সেখানে বিশেষজ্ঞদের মত ছিল, ভারতের বর্তমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বছরে ২.১ শতাংশ। এই হার যদি হ্রাস না পায়, তবে আগামী ৫০ বছরে ভারতের জনসংখ্যা হবে ১৭০ কোটি। সুতরাং সকল বিশেষজ্ঞগণ এই ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করেছেন। এই অনুষ্ঠানে আরও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। এই অধ্যায়ের মূল আলোচনা করার আগে এই তথ্যগুলি আমাদের জানা দরকার। সেগুলি হচ্ছে –

☞ ১. **সাক্ষরতা ও জন্মহারের মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক সম্পর্ক।**

☞ ২. **পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশে এবং আমাদের দেশে-কেরালা রাজ্যে এই তথ্যটি এখন এক পরীক্ষিত সত্য।**

☞ ৩. **মহিলাদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সঙ্গে রয়েছে জনসংখ্যাবৃদ্ধি হারের এক নিকট সম্পর্ক।**

☞ ৪. **উন্নত দেশগুলিতে সমন্বিত শিশুকল্যান কর্মসূচীর ফলে শিশুমৃত্যুর হার কেবল কমেছে তাই নয়, তার সঙ্গে পরিবারের জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়ার ফলে শিক্ষিত পিতামাতার কাছে ছোট পরিবার গ্রহনীয় হয়ে উঠেছে। জনস্বাস্থ্য ও বার্ধক্যে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রসারিত হওয়ার ফলে বেশী সংখ্যক সন্তানের প্রয়োজনও অনেক কমে গেছে।**

☞ ৫. **এর পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার যে সব দেশগুলি এখনও অনুন্নয়ন, দারিদ্র ও অশিক্ষার শিকার হচ্ছে সেই সব দেশে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।**

এই সাধারণ মন্তব্যের পর ভারতের জনসংখ্যার বিভিন্ন দিকের উপর আলোচনা উপস্থিত করা হচ্ছে।

প্রারম্ভিক তথ্য ঃ

মানবজাতি এই পৃথিবী নামক গ্রহের সকল জীবের মধ্যে সবচেয়ে (শক্তিশালী এবং) সৃজনশীল জীব। পৃথিবীকে জীবনধারণের জন্য উপযোগী করে তোলার জন্য মানবজাতির সক্রিয় ভূমিকা অতীতে যেমন দেখা গেছে বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকেও তেমন সমান ভাবেই পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই গ্রহের সংরক্ষণ এবং গুণগত উন্নয়নের জন্য পরিবেশ বিজ্ঞানীগণ যেভাবে গঠনশীল কর্মধারা পরিচালনা করছেন তার কোন তুলনা নেই।

জনসংখ্যার বিচারে পৃথিবীর মধ্যে চীনদেশের পর আমাদের দেশ ভারত দ্বিতীয় বৃহত্তম জনবহুল দেশ। দেশের মোট আয়তনের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের জনসংখ্যার ঘনত্ব হল প্রতি বর্গকিলোমিটারে ২৬৭ জন। ১৯৮১'র লোক গণণায় জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ২১৬ জন। ১৯৯১'র হিসাবে প্রতি ১০০০ পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা ৯২৯

জন। জনসম্পদের দৃষ্টিকোন থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতবাসীর সংখ্যা ৫২.১১ শতাংশ, এর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৬৩.৮৬ শতাংশ এবং নারীর সংখ্যা ৩৯.৪২ শতাংশ। শিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতবাসীর সংখ্যা গণণায় ০-৬ বয়সের শিশুদের ধরা হয় নি।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি প্রকৃতি ঃ

১৮৮১ সাল থেকে ভারতে প্রতি দশ বছরে আদমশুমারীর (সেন্সাস) মাধ্যমে লোকগণনা করা হয়। এই আদমশুমারীর সংগৃহীত তথ্যের সাহায্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষন করা হয়ে থাকে। সারনী -১ থেকে এই বৃদ্ধির ধারাটি লক্ষ্য করা যেতে পারে।

সারনী—১

১৯০১-৯১ প্রতিদশকে জনসংখ্যা এবং বৃদ্ধির গতিপ্রকৃতি

বছর	জনসংখ্যা (কোটি)	বিগত দশকে বৃদ্ধির শতাংশ	বৃদ্ধির গতি এরিথমেটিক	(প্রতিশতকে বার্ষিক হার) জিওমেট্রিক
১	২	৩	৪	৫
১৯০১	২৩.৮৪	—	—	—
১৯১১	২৫.২০	+ ৫.৭৫	০.৫৮	০.৫৬
১৯২১	২৫.১৩	-০.৩১	-০.০৩	-০.০৩
১৯৩১	২৭.৯০	+১১.০০	১.১০	১.০৪
১৯৪১	৩১.৮৭	+১৪.২২	১.৪২	১.৩৩
১৯৫১	৩৬.১১	+১৩.৩১	১.৩৩	১.২৫
১৯৬১	৪৩.৯২	+২১.৫১	২.১৬	১.৯৬
১৯৭১	৫৪.৮২	+২৪.৮০	২.৪৮	২.২০
১৯৮১	৬৮.৩৩	+২৪.৬৬	২.৫০	২.২২
১৯৯১	৮৪.৩৯	+২৩.৫০	—	২.১১

* **উৎস ঃ** ভারতের সেন্সাস রিপোর্ট, ১৯৯১

দ্রষ্টব্যঃ

১. ১৯৮১ সংশোধিত জনসংখ্যা ৬৮,৩৩,২৯,০৯৭, প্রকাশিত প্রাথমিক সংখ্যা ছিল ৬৮,৫১,৮৪,৬৯২।

২. জম্মু ও কাশ্মির রাজ্যে ১৯৯১ জনগণনা না হওয়ায় বিশেষজ্ঞদের ষ্টাণ্ডিং কমিটি রাজ্যের জনসংখ্যাকে আনুমানিক গড় হিসাবে ধরেছেন।

উপরের সারনী থেকে বোঝা যায়। ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সাম্প্রতিক কালে অত্যন্ত দ্রুত। ১৯২১ সালকে ভারতের জনসংখ্যা নিরূপনের একটি দিক চিহ্ন হিসাবে ধরা হয়। কারণ ১৯২১ সালের আগে জনসংখ্যা বৃদ্ধিরকোন সঠিক ধারা লক্ষ করা যায় না। এই বছরের পরবর্তী সময়ে জনসংখ্যা নিয়মিতভাবে বেড়েই চলেছে। মৃত্যুহারের আধিক্যের জন্য ১৯২১ সালের পূর্বে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল অনেক কম। চিকিৎসা পরিষেবার মাধ্যমে সংক্রামক জনিত মহামারী রোগ কমে যাওয়াতে এবং আমদানীকৃত জীবননাশক ঔষধের ব্যপ্তির জন্য ভারতে মৃত্যুহার লক্ষ্যনীয় ভাবে কমে গেছে এবং ভারত বাসীর আয়ুষ্কালও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞদের মতে ভারত প্রতিবছর একটি অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের সমান সংখ্যক ভারতবাসী সৃষ্টি করে চলেছে। ১৯৯১ সালের বৃদ্ধির হার আগের দশকের হার থেকে কম হলেও

বৃদ্ধির মোট সংখ্যার বিচারে ভারতকে পৃথিবীর অন্যতম ক্রমবর্দ্ধমান জনবহুল দেশ হিসাবে গণ্য করা হয়।

ভারতের জনসংখ্যার বিন্যাস ও ঘনত্ব ঃ

ভারতের জনসংখ্যার বিন্যাস ও ঘনত্ব সকল রাজ্য ও অঞ্চলে একই রকম নয়। তারতম্যের কারণগুলি হল – ভারতের –

(ক) ভূ-প্রকৃতি নদনদী, মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য

(খ) উত্তাপ, বৃষ্টিপাত এককথায় জলবায়ু,

(গ) খনিজ ও বনজ সম্পদ

(ঘ) কৃষিজ ও শিল্পজাত উন্নয়ন

(ঙ) পরিবহন পরিষেবা এবং

(চ) শিক্ষা সংস্কৃতি ও ধর্মীয় প্রভাব।

উপরোক্ত কারণগুলির ফলে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে জনসংখ্যা ও ঘনত্বের পরিমানে অনেক তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। জনসংখ্যার আয়তনের বিচারে ভারতের মধ্যে প্রথম স্থান উত্তর প্রদেশের। কিন্তু ঘনত্বের বিচারে পশ্চিমবঙ্গের স্থান উত্তর প্রদেশের আগে। পশ্চিমবঙ্গের ঘনত্ব অনেক গুনে বৃদ্ধি পেয়েছ Pakistan এবং Bangladesh থেকে আগত মানুষদের জন্য। ভারতের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রাথমিক তথ্য সারনী-২ এ উপস্থিত করা হল।

সারনী—২

ভারতের কয়েকটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মোট জনসংখ্যা এবং জন-ঘনত্ব (১৯৯১)

রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	জনসংখ্যা (কোটি) (১৯৯১)	জন ঘনত্ব (প্রতি বর্গকি. মি) (১৯৯১)
১	২	৩
রাজ্য		
১. উত্তর প্রদেশ	১৩.৮৮	৪৭১
২. বিহার	৮.৬৩	৪৯৭
৩. মহারাষ্ট্র	৭.৮৭	২৫৬
৪. পশ্চিমবঙ্গ	৬.৮০	৭৬৬
৫. কেরালা	২.৯০	৭৪৭
৬. আসাম	২.২৩	২৮৪
৭. পাঞ্জাব	২.০২	৪০১
৮. হরিয়ানা	১.৬৩	৩৬৯
কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল		
১. দিল্লী	০.৯৪	৬,৩৯১
২. চণ্ডীগড়	০.০৬	৫,৬২০
৩. আন্দামান নিকোবর	০.০৩	৩৪
৪. লাক্ষাদ্বীপ	০.০০,৫২	১,৬১৫

* উৎস ঃ ভারতের সেন্সাস রিপোর্ট, ১৯৯১

আলোচনা ঃ

১. উত্তর প্রদেশ, বিহার, মহারাষ্ট্র ও পশ্চিমবঙ্গ ভূ-প্রকৃতি, মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য, কৃষিজ, খনিজ সম্পদ, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং সর্বোপরি আয়তনের বিচারে মোট জনসংখ্যার দিক থেকে প্রথম চারটি স্থানে রয়েছে।

২. জন-ঘনত্বের বিচারে দিল্লী, চণ্ডীগড়, লাক্ষাদ্বীপ (মিনিকয় ইত্যাদি) প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কারণে উল্লেখযোগ্য স্থানাধিকার করেছে।

৩. উত্তর ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকা প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক কারণেই প্রাধান্য পেয়েছে।

৪. পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালা রাজ্য দুইটি কৃষিজ, শিল্পজ, শিক্ষা সংস্কৃতি এবং প্রশাসনিক ও ঐতিহাসিক কারণে জন-ঘনত্বের বিচারে লক্ষ্যনীয় স্থানে রয়েছে। রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান জন-ঘনত্বের দিক থেকে প্রথম।

৫. জন-ঘনত্বের দিক থেকে সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলির মধ্যে রয়েছে উত্তর-পূর্ব ভারতের সীমান্ত অঞ্চল এবং আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। জনবিরল এই অঞ্চলগুলি প্রাকৃতিক কারণেই অনুন্নত।

৬. ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতাংশের হিসাবে (১৯৮১ সালের আদমসুমারীর তথ্যের ভিত্তিতে) দেওয়া হল–

৭. জন বসতির ঘনত্বের সঙ্গে ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা জড়িত নয়। এছাড়াও কোন রাজ্যে জন বসতির ঘনত্ব বেশী হলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ইহা সহায়ক নয়। যেমন, কেরালায় জন বসতির ঘনত্ব বেশী কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বাকী রাজ্যগুলি থেকে সবচেয়ে কম। অন্যদিকে উত্তর প্রদেশে জনবসতির ঘনত্ব কম কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশী। ভারতবর্ষে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা যে চারটি রাজ্যে বেশী তাহা হলো উত্তর প্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান।

সারনী—৩

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের আয়তন (শতাংশে), জনসংখ্যা (শতাংশে) (১৯৮১)

	অঞ্চল	১৯৭১ আয়তন (ভারতের মোট আয়তনের শতাংশে)	১৯৮১ (ভারতের মোট জনসংখ্যার শতাংশে)
১.	উত্তর	২১.৭৯	১১.৭৭
২.	পূর্ব	২০.৯৩	২৫.৯৮
৩.	মধ্য	২২.৪২	২৩.৮৩
৪.	পশ্চিম	১৫.৪৫	১৪.৩২
৫.	দক্ষিণ	১৯.৪১	২৪.১০
	ভারত	১০০.০০	১০০.০০

* উৎস ঃ ভারতের সেন্সাস রিপোর্ট। ১৯৮১□১৯৭১

আয়তনের আপেক্ষিক বিচারে পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলে জনবসতি বেশী—দেশের মোট আয়তনের ৪০% শতাংশে বসবাস করছে ভারতের জনসংখ্যার ৫০% শতাংশ অধিবাসী।

ভারতের জনসংখ্যার ঃ গুণগত বিচার ঃ নারী পুরুষের আপেক্ষিক হার/বয়সের আনুপাতিক হার

নারী-পুরুষের হার এবং বয়সের আনুপাতিক তারতম্য প্রতিটি দেশের জনসংখ্যার গুণগত বিশ্লেষনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহন করে থাকে। কারণ জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ এই তিনটি বিষয়ে এই কারণে প্রভাবিত হয়ে থাকে। তাছাড়া সমাজের বিভিন্ন বৃত্তি ও উপজীবিকায় কর্মরত জনসংখ্যা এবং অন্যান্য সামাজিক কর্মপ্রয়াসের পেছনে রয়েছে বয়স ভিত্তিক হার ও নারীপুরুষের হারের প্রভাব। জনসংখ্যাকে মানব-সম্পদ উন্নয়নে সামাজিক অর্থনৈতিক প্রচেষ্টায় এই তথ্য কেবল প্রাসঙ্গিক নয়, একান্তই তাৎপর্যপূর্ণ। তাই এই দুই দিক থেকে ভারতের জনসংখ্যার গুণগত বিশ্লেষন করার জন্য কয়েকটি সারনী উল্লেখ করা হল।

নারী পুরুষের হার নির্ণয় করার জন্য **ভারতীয় সেন্সাস কর্তৃপক্ষ প্রতি ১০০ জন পুরুষে নারীর সংখ্যা উল্লেখ করে থাকে।** অবশ্য 'সেক্স রেসিও' বলতে প্রতি ১০০ জন নারী পিছু পুরুষের সংখ্যাই বোঝায়। এছাড়া আরো দুটি কথা এই প্রসঙ্গে আসে। 'ম্যাসকুলিনিটি' ও 'ফেমিনিটি' রেসিও বা হার। দেশের মোট অধিবাসীদের সংখ্যার মধ্যে পুরুষের সংখ্যার শতাংশকে 'ম্যাসকুলিনিটি এবং মহিলাদের সংখ্যার শতাংশকে 'ফেমিনিটি' রেসিও বলা হয়।

আলোচনাঃ

১. নারী-পুরুষের সংখ্যার তারতম্যের বিচারে পুরুষের সংখ্যাবৃদ্ধি লক্ষণীয়।

২. ভারতে নারীদের জীবনযাত্রার মান আপেক্ষিকভাবে পুরুষের অপেক্ষা অসন্তোষজনক। আমাদের সমাজে নারীর স্থান এই ঘটনার জন্য দায়ী। একটি বালিকা- শিশু বালক-শিশুর তুলনায় চিকিৎসা ও পুষ্টির ব্যাপারে বৈষম্যের শিকার হয়।

সারনী—৪

ভারতে জনসংখ্যায় প্রতি ১০০০ জন পুরুষ পিছু নারীর সখ্যার নিম্নগামী ধারা

১৯৮১ ও ১৯৯১

কয়েকটি বড় রাজ্যের নারী পুরুষের হার

রাজ্য	১৯৮১	১৯৯১
উত্তর প্রদেশ	৮৮৫	৮৮২
বিহার	৯৪৬	৯১২
রাজস্থান	৯১৯	৯১৩
মধ্যপ্রদেশ	৯৪১	৯৩২
মহারাষ্ট্র	৯৩৭	৯৩৬
গুজরাট	৯৪২	৯৩৬
উড়িষ্যা	৯৮১	৯৭২
তামিলনাড়ু	৯৭৭	৯৭২
অন্ধ্রপ্রদেশ	৯৭৫	৯৭২
কর্নাটক	৯৬৩	৯৬০

* উৎস ঃ ভারতের সেন্সাস রিপোর্ট। ১৯৯১

আলোচনা :

১৯৯১ এর সেন্সাসে সবচেয়ে নৈরাশ্যজনক তথ্য হলো। ভারতে নারী সংখ্যার নিম্নগামী ধারা।

সারনী ৫

জনসংখ্যায় প্রতি ১০০০ জন পুরুষ পিছু নারী সংখ্যা উচ্চগামী ধারা ১৯৮১-১৯৯১

ভারতের কয়েকটি বড় রাজ্যের নারী-পুরুষের হার

রাজ্য	১৯৮১	১৯৯১
হরিয়ানা	৮৭০	৮৭৪
পাঞ্জাব	৮৭৯	৮৮৮
পশ্চিমবঙ্গ	৯১১	৯১৭
হিমাচলপ্রদেশ	৯৭৩	৯৯৬
কেরালা	১০৩২	১০৪০

* উৎস : ভারতের সেন্সাস রিপোর্ট। ১৯৯১

আলোচনা :

নারী সংখ্যার আপেক্ষিক উচ্চ ও নিম্ন-গামীনতার সঙ্গে মানব-সম্পদ বিকাশের কী-উপাদান সংশ্লিষ্ট, সেই আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে করা হবে। এখানে উল্লেখ্য বিষয়টি হল, ভারতে জনসংখ্যা সংক্রান্ত প্রধান প্রধান সমস্যাবহুল রাজ্যগুলি-বিহার, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশ যারা দেশের মোট জনসংখ্যার ৩৯ শতাংশের অধিকারী এবং ১৯৮১-৯১ এর দশকে যারা দেশের জনসংখ্যার মোট বৃদ্ধির ৪২ শতাংশের জন্য দায়ী, সেই সব রাজ্যে নারীর সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় নিম্নমুখীতা লক্ষ্যনীয়। (সারনী-৪ দ্রষ্টব্য)

নারী-পুরুষের হারের মতোই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, বিভিন্ন বয়স সীমায় নারী-পুরুষের সংখ্যা। জন্মের সময় সঠিক তথ্য পাওয়ার উপরই এই বিষয়টি নির্ভরশীল। দেশের জনসাধারণ দারিদ্র, নিরক্ষরতা কুসংস্কার ও নানাধরনের ভয়ের শিকার হওয়ার ফলে সরকারের সার্বজনীন শিশু জন্মের সঠিক তথ্য রাখা সম্ভবপর হচ্ছে না এবং সেন্সাসের সময়েও প্রাসঙ্গিক তথ্য লিপিবদ্ধ করা যাচ্ছে না। এই সকল সীমাবদ্ধতা মনে রেখেই পরের সারনীগুলি উপস্থিত করা হল। যে- গুলির ভিত্তি হল ছোট ছোট নমুনার; উপর সংগৃহীত তথ্য।

সারনী—৬

প্রতি পাঁচবছর অন্তর বয়সসীমায় নারী ও পুরুষ জনসংখ্যার বিন্যাস (শতাংশে)

ভারত : ১৯৭১ ও ১৯৮১

বয়সসীমা	১৯৭১		১৯৮১	
	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী
০-৪	১৪.২	১৪.৯	১২.২৮	১২.৮৫
৫-৯	১৪.৯	১৫.১	১৪.০৩	১৪.১৩
১০-১৪	১২.৮	১২.২	১৩.১৬	১২.৬৫
১৫.১৯	৮.৯	৮.৪	৯.৮৯	৯.৩৭
২০-২৪	৭.৬	৮.২	৮.৪৩	৮.৮২
২৫-২৯	৭.২	৭.৮	৭.৪৯	৭.৭৭

৩০-৩৪	৬.৪	৬.৮	৬.২৭	৬.৪৭
৩৫-৩৯	৬.১	৫.৯	৫.৭৯	৫.৯০
৪০-৪৪	৫.৩	৫.০	৫.২৪	৫.০৩
৪৫-৪৯	৪.৪	৩.৯	৪.৪৭	৪.৩১
৫০-৫৪	৩.৯	৩.৬	৪.০১	৩.৬১
৫৫-৫৯	২.৪	২.৩	২.৪৭	২.৪৬
৬০-৬৪	২.৬	২.৬	২.৭৩	২.৭৩
৬৫-৬৯	১.৩	১.৩	১.৩৯	১.৪৭
৭০ এবং তদুর্দ্ধে	২.০	২.১	২.২৮	২.৩৮
মোট বয়সের	১০০.০	১০০.০	১০০.০০	১০০.০০

* উৎস ঃ পপুলেশন এডুকেশন-এ ন্যাশনাল সোর্সবুক, এন. সি. ই. আর. টি. ১৯৯১

আলোচনা ঃ

১. ০-৪ বয়সীমায় পুরুষ ও নারীর সংখ্যা আনুপাতিক ভাবে ১৯৭১ থেকে ১৯৮১ সালে কমে গেছে। এর অর্থ হল শিশু জন্মের হারের নিম্নগামী গতি।

২. কিন্তু সন্তান উৎপাদনে সবচেয়ে কার্যকারী ২০-৩৯ বয়সসীমায় পুরুষ ও নারীর সংখ্যা আনুপাতিক ভাবে ১৯৭১ থেকে ১৯৮১ সালে কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে। শতাংশের হিসাবে পুরুষের সংখ্যা ২৭.৩ থেকে ২৮.০ এবং নারীর সংখ্যা ২৮.৭ থেকে ২৯.০।

জনসংখ্যার বয়সভিত্তি বিশ্লেষণ সাধারনতঃ তিনটি বয়স সীমায় করা হয়ে থাকে—প্রয়োপযোগী বয়সসীমার নীচে প্রয়োপযোগী বয়সসীমা এবং প্রয়োপযোগী বয়সসীমার উপরে। এই সীমা নির্ধারিত হয়েছে এই ভাবে (ক) ১৫ বছরের নিচে, (খ) ১৫ থেকে ৫৯ বছর এবং (গ) ৬০ বছর এবং তার উর্দ্ধে। সারনী ৭ 'এ উপরের বয়সসীমায় জন সংখ্যার বিন্যাস, এজিং রেসিও, ১৯০১-১৯৮১ সময় কালের, উপস্থিত করা হল।

সারনী—৭

মোট জনসংখ্যার শতাংশের হিসাবে তিনটি প্রধান বয়সসীমায় বিন্যাস,'এজিং' রেসিও-র ভারত ১৯০১-১৯৮১।

আদমসুমারী বছর	শতাংশে বিভিন্ন বয়সীমায় জনসংখ্যা বিন্যাস				এজিং রেসিও-র সূচক *
	০-১৪	১৫-৫৯	৬০+	সকল বয়স	
১৯০১	৩৮.৬০	৫৬.৩৫	৫.০৫	১০০.০	১৩.০৮
১৯১১	৩৮.৪৫	৫৬.৪০	৫.১৫	১০০.০	১৩.৩৯
১৯২১	৩৯.২০	৫৫.৫৫	৫.২৫	১০০.০	১৩.৩৯
১৯৩১	৪০.০০	৫৫.৯৫	৪.০৫	১০০.০	১০.১৩
১৯৪১	৩৮.২৫	৫৬.৮৫	৪.৯০	১০০.০	১২.৮১
১৯৫১	৩৭.৫০	৫৬.৮৫	৫.৬৫	১০০.০	১৫.০৭
১৯৬১	৪১.০০	৫৩.৩৬	৫.৬৪	১০০.০	১৩.৭৪
১৯৭১	৪২.০২	৫২.০১	৫.৯৭	১০০.০	১৪.২১
১৯৮১	৩৯.৫৫	৫৩.৯৬	৬.৪৯	১০০.০	১৬.৪১

* উৎস ঃ ভারতের সেন্সাস ১৯০১-৮১

$$\text{এজিং এর সূচক} = \frac{\text{৬০+ বয়সীমায় জন সংখ্যার শতাংশ}}{\text{০-৪ বয়সীমায় জনসংখ্যার শতাংশ}} \times ১০০$$

$$\text{উদাহরণ : ১৯৮১ } \frac{৬.৪৯}{৩৯.৫৫} \times ১০০ = ১৬.৪০৯৬ = ১৬.৪১$$

আলোচনা :

১. ১৯৫১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন বয়সসীমায় জনসংখ্যার বিন্যাস মোটামুটি একই চেহারায় ছিল। পরবর্তী দুই দশকে। ০-১৪ এবং ৬০+ বয়সীমা ধরে জনসংখ্যার বিন্যাস আপেক্ষিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কর্মক্ষম বয়সসীমায় অর্থাৎ ১৫-৫৯ বয়সসীমায় জনসংখ্যা লক্ষ্যনীয় ভাবে হ্রাস পেয়েছে। এজিং এর সূচকে দৃশ্যতঃকোন ধারা দৃষ্টিগোচর হয় না, তবে ১৯৮১-র সেন্সাসে সূচকের বৃদ্ধির কারণ হিসাবে জন্ম ও মৃত্যু হারের ঐ দশকে হ্রাসকে ধরা যেতে পারে।

২. সারনী লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কম বয়সসীমায় অপেক্ষাকৃত সংখ্যায় পুরুষ ও নারী জনবিন্যাস ঘটেছে এবং বয়সসীমা বৃদ্ধি পেয়েছে ততই জনবিন্যাসে ক্রমহ্রাস বৈশিষ্ট্যটি দেখা যাচ্ছে। যে দেশের জনসংখ্যায় কম বয়সী নারী-পুরুষের সংখ্যা বয়স্ক নারী-পুরুষদের তুলনায় বেশী. সেই দেশের জনসংখ্যা (Population) কে 'নবীন' (Young) বলা হয়ে থাকে। এই বৈশিষ্ট্য 'উন্নয়নশীল' দেশগুলিতে দেখা যায়। কিন্তু 'উন্নত' দেশগুলিতে এর বিপরীত ছবি অর্থাৎ বয়স্ক মানুষদের আপেক্ষিক আধিক্য দেখা যায়। যে সকল দেশে জনসংখ্যার এই ছবি তাদের বলা হয় 'প্রবীন' (Old) জনসংখ্যা।

ভারতে শিশুমৃত্যুর হার : আই. এম. আর.

(ইনফ্যান্ট মর্টালিটি রেটস্)

শিশু মৃত্যু এমন একটি ঘটনা যা আমাদের কোন একটি দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক গুণগত মান, পরিবেশিক প্রভাব, শিশু স্বাস্থ্য পরিবেশ এবং সাধারণভাবে জীবনধারার মানকে বুঝতে সাহায্য করে। উন্নত দেশগুলিতে আজ শিশু মৃত্যু হারকে প্রায় নামমাত্র জায়গায় নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। অপরদিকে উন্নয়নশীল ও অনগ্রসর দেশগুলিতে শিশুমৃত্যুর হার এক উদ্বেগজনক অবস্থায় রয়েছে। ভারতের সকল রাজ্যের অবস্থা একই রকম নয়। এই চিত্রটি সারনী ১৩-র মাধ্যমে উপস্থিত করা হল।

সারনী—৮

ভারতে শিশুমৃত্যুর হার (আই. এম. আর) এস.আর. এস. ১৯৮৯
(প্রাথমিক তথ্য) প্রতি ১০০০ জন ভূমিষ্ট জীবন্ত শিশু

কয়েকটি নির্বাচিত রাজ্য	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	সমগ্ররাজ্য
১. মধ্যপ্রদেশ	১২৪	৭৮	১১৭
২. বিহার	৯৩	৬৩	৯১
৩. উত্তরপ্রদেশ	১২৬	৭৫	১১৮
৪. রাজস্থান	১০৩	৫৯	৯৬
৫. কেরালা	২৩	১৫	২২
৬. মহারাষ্ট্র	৬৬	৪৪	৫৯

৭.	কর্নাটক	৮৯	৫৩	৮০
৮.	তামিলনাড়ু	৮০	৪৩	৬৮
৯.	অন্ধ্রপ্রদেশ	৮৭	৫৩	৮১
১০.	আসাম	৯৩	৬৩	৯১
১১.	পশ্চিমবঙ্গ	৮২	৫৩	৭৭
১২.	ভারত	৯৮	৫৮	৯১

* **উৎস** ঃ ভারতের সেন্সাস রিপোর্ট। ১৯৯১

আলোচনা ঃ শিশু মৃত্যু হারের সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হারের একটি সরাসরি সম্পর্ক আছে। শিশু মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পেলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা অবশ্যই থাকবে। কারণ শিশু মৃত্যুর হার বেশী হলে পরিবার সব সময়ে বেশী সন্তান সন্ততি চাইবে। ইহা অর্ধোন্নত বা উন্নতিকামী দেশগুলিতে সবথেকে বেশী করে দেখা যায়।

ভারতে স্থানান্তর গমন (মাইগ্রেশন) সম্পর্কিত সমস্যা

জনসংখ্যা আলোচনায় জন্ম ও মৃত্যুহারের পর সব চেয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য হল **স্থানান্তর গমন** সম্পর্কিত। সাধারণত স্থানান্তরিত হওয়া তিন ভাবে ঘটে থাকে ঃ —

(ক) যখন দেশ থেকে বিদেশে গমন করা হয়, সেটি বোঝায় আন্তর্জাতিক স্তরে **স্থানান্তর** গমন।

(খ) যখন কোন অঞ্চল থেকে ঐ দেশের আর একটি অঞ্চলে গমন করা হয়, সেটি দেশের মধ্যে আভ্যন্তরীন **স্থানান্তর গমন** সূচনা করে।

(গ) যখন একই অঞ্চলের কোন স্থান থেকে আর একটি স্থানে গমন করা হয় সেটিকে বলে **স্থানীয়স্তরে স্থানান্তর গমন।**

যেহেতু প্রথম ও তৃতীয় পদ্ধতিতে কেন নির্দিষ্ট অঞ্চলের জনসংখ্যার উপর কোন স্থায়ী প্রভাব পড়ে না, সেহেতু দ্বিতীয় পদ্ধতিটি এ ক্ষেত্রে আলোচ্য বিষয়।

সংগৃহীত তথ্য থেকে দেখা যায়, ভারতের মধ্যে সব চেয়ে বেশী **স্থানান্তর গমন** হয়ে থাকে গ্রামাঞ্চল থেকে গ্রামাঞ্চলে এবং সাধারণত পরিবারের মহিলারাই এই স্থানান্তরে অংশীদার হন। বিবাহের কারণেই মেয়েরা এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলের পরিবারে চলে যান। এদের বয়স সাধারণত ১৫ থেকে ৩৫ বছর। পুরুষদের মধ্যে স্থানান্তর গমন ঘটে চাকুরী বা বৃত্তির সন্ধানে। ভারতের চারটি মেট্রোপলিটন শহর – বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী ও মাদ্রাজে প্রায় সব সময়ে বহিরাগত মানুষের ভীড় থাকে। এরা নিকটবর্তী রাজ্যগুলির গ্রামাঞ্চল এবং শহরাঞ্চল থেকে আসেন জীবিকার সন্ধানে।

সুতরাং আভ্যন্তরীন স্থানান্তরের ব্যাপকতা এবং গতিমুখ প্রধানত তিনটি কারণে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে–জীবিকা, আয় ও দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি। যে সব অঞ্চলে জীবিকা ও আয়ের অপ্রতুলতা রয়েছে সেখানকার কর্মক্ষম পুরুষ ও নারীরা জীবিকা এবং আয়ের অনুকূল অঞ্চলে চলে যেতে থাকেন। নতুন নতুন শিল্পনগরী এবং মাথা পিছু আয়ের বৃদ্ধির সম্ভাবনাময় অঞ্চলের দিকে দলে দলে জীবিকা ও কর্মসন্ধানী মানুষের গমনের গতি লক্ষ্য করা যায়।

ভারতের অভ্যন্তরীন প্রতিকূল কারণগুলি হল ঃ

(ক) কৃষির উপর বেশীর ভাগ মানুষের অবিরত নির্ভরশীলতা

(খ) সমাজে জাত ও গোষ্ঠী ব্যবস্থা ;

(গ) দৃঢ়বদ্ধ সামাজিক জীবনযাত্রা ;

(ঘ) ভাষা ও সংস্কৃতিক বিভিন্নতা;

(ঙ) শিক্ষার অভাব এবং

(চ) দেশে শিল্পায়নের নিম্নগতি।

স্থানান্তর গমন প্রক্রিয়ার অবশ্যম্ভাবী ফল হচ্ছে সামাজিক পরিবর্তন। বহিরাগত মানুষেরা যখন অন্য অঞ্চলে বসবাস করতে শুরু করে, তখন সেই অঞ্চলের জনসংখ্যার উপর গভীর প্রভাব পড়ে। পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের মানুষেরা ভীড় করে উন্নত উৎপাদনশীল অঞ্চলগুলিতে। আবার জনসংখ্যার আধিক্য যে সব অঞ্চলে রয়েছে সেখানকার মানুষ চলে যেতে শুরু করে সেই সব অঞ্চলে যেখানে জনসংখ্যার চাপ কম। মানুষের সঙ্গে সঙ্গে চলে সামাজিক পরিবর্তনের নানা উপাদান-শিক্ষা, সংস্কৃতি, আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, দৃষ্টিভঙ্গী এবং এই উপাদানগুলি আবার একটি দেশের মধ্যে নিয়ে আসে জাতীয় ও সামাজিক ঐক্যবোধ ও সংহতি-চেতনা।

আন্তর্জাতিক স্তরের স্থানান্তর গমন ঘটনা এখনও দেশে উল্লেখযোগ্যভাবে ঘটছে না। ভারত বিভাগের সময় এবং তার পরও পাঞ্জাব রাজ্যে এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে ব্যাপক স্থানান্তর গমন এবং আগমন এক ঐতিহাসিক ঘটনা, সামাজিক অর্থনৈতিক প্রভাব এখনও গভীর ভাবে অনুভূত হচ্ছে।

জনসংখ্যা ও শিক্ষা :

বিভিন্ন রাজ্যের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ছবিটি লক্ষ্য করলে আমরা বুঝতে পারব জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণটি। ভারতের জনসংখ্যার জাতীয় বৃদ্ধির হার থেকে অন্তত শতকরা ৪%-৫% বেশী হার রয়েছে উত্তর ভারতের চারটি বড় বড় রাজ্যে। রাজ্যগুলি হচ্ছে—বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ এবং রাজস্থান। এই রাজ্যগুলির মোট জনসংখ্যা সারা দেশের জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৩৯%। ১৯৮১-র হিসাবে দেশে নারী সাক্ষরতার জাতীয় হার যেখানে শতকরা ৩০%, সেখানে এই রাজ্যগুলিতে নারী সাক্ষরতার হার শতকরা ১৪%-১৯%। দেশের মধ্যে শিশুমৃত্যুর হারও এই রাজ্যগুলিতে সব চেয়ে বেশী প্রতি হাজারে ৯১-১১৮, যেখানে জাতীয় হার ৯১ (১৯৯১-র হিসাবে)।

পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী অপেক্ষাকৃত সার্থকতা লাভ করেছে যে সব রাজ্যে—তার মধ্যে রয়েছে কেরালা, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু এবং পাঞ্জাব। শিশু জন্মের জাতীয় হার ৩০ থেকে এই রাজ্যগুলির হার অনেক কম। (১৯৮৯-র হিসাবে) যেমন, কেরালা এখানে শিশুজন্মের হার ২০। কেরালায় নারী সাক্ষরতার হার শতকরা ৮৬.৯৩% যেখানে সারা দেশের শতকরা ৩৯.৪২% (১৯৯১-র হিসাবে)। এই রাজ্যে বালিকাদের সাধারণত একটু বেশী বয়সেই বিয়ে হয়। অতএব জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে অনুন্নয়ন এবং অশিক্ষা বিশেষভাবে সম্পর্কিত। বিষয়টি তৃতীয় অধ্যায়ে আরো বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হবে।

একটি কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। অনেক সমাজ বিজ্ঞানীর মতে পরিবার পরিকল্পনায় যে বিপুল পরিমানে অর্থ স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ব্যায় করা হয়েছে সেই সম্পদ যদি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান এবং পরিবেশ উন্নয়নে ব্যয়িত হতো, তবে ভারতে জনসংখ্যার আস্বাভাবিক বৃদ্ধির হার অনেকাংশে হ্রাস করা সম্ভব হতো। সাক্ষরতার হার যে যে রাজ্যে অপেক্ষাকৃত বেশী, সেই সব রাজ্যগুলির সংগৃহীত তথ্য আমাদের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। সুতরাং জনসংখ্যাবৃদ্ধি সমস্যাটিকে সংকীর্ন দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে বিচার না করে আমাদের দেশের সামগ্রিক প্রগতি তথা শিক্ষা প্রথার কর্মসূচীর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে সমাধানের পথ বার করতে হবে।

সারনী ১৪-র মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সাক্ষরতা কর্মসূচীর প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে সাক্ষরতার হার উল্লেখ করা হলো।

সারনী—৯

ভারতের নির্ধাচিত কয়েকটি রাজ্যে ৭ এবং তার বেশী বয়সের সকল অধিবাসীদের মধ্যে সাক্ষরতার হার (শতাংশ)

ভারত/ রাজ্য/ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল (নির্বাচিত)	১৯৮১			১৯৯১		
	মোট	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী
ভারত	৪৩.৫৬	৫৬.৩৭	২৯.৭৫	৫২.১১	৬৩.৮৬	৩৯.৪২
২. বিহার	৩২.০৩	৪৬.৫৮	১৬.৫১	৩৮.৫৪	৫২.৬৩	২৩.১০
৩. মধ্যপ্রদেশ	৩৪.২২	৪৮.৪১	১৮.৯৯	৪৩.৪৫	৫৭.৪৩	২৮.৩৯
৪. রাজস্থান	৩০.০৯	৪৪.৭৬	১৩.৯৯	৩৮.৮১	৫৫.০৭	২০.৮৪
৫. উত্তরপ্রদেশ	৩৩.৩৩	৪৭.৪৩	১৭.১৮	৪১.৭১	৫৫.৩৫	২৬.০২
৬. কেরালা	৮১.৫৬	৮৭.৭৪	৭৫.৬৫	৯০.৫৯	৯৪.৪৫	৮৬.৯৩
৭. তামিলনাড়ু	৫৪.৩৮	৬৮.০৫	৪০.৪৩	৬৩.৭২	৭৪.৮৮	৫২.২৯
৮. কর্নাটক	৪৬.২০	৫৮.৭২	৩৩.১৬	৫৫.৯৮	৬৭.২৫	৪৪.৩৪
৯. মহারাষ্ট্র	৫৫.৮৩	৬৯.৬৬	৪১.০১	৬৩.০৫	৭৪.৮৪	৫০.৫১
১০. পশ্চিমবঙ্গ	৪৮.৬৪	৫৯.৯৩	৩৬.০৭	৫৭.৭২	৬৭.২৪	৪৭.১৫
১১. লাক্ষাদ্বীপ	৬৮.৪২	৮১.২৪	৫৫.৩২	৭৯.২৩	৮৭.০৬	৭০.৮৮
১২. দাদর-নগরহাভেলী	৩২.৭০	৪৪.৬৯	২০.৯৮	৩৯.৪৫	৫২.০৭	২৬.১০
১৩. দিল্লী	৭১.৯৩	৭৯.২৮	৬২.৫৭	৭৬.০৯	৮২.৬৩	৬৮.০১

* উৎস ঃ ভারতের সেন্সাস রিপোর্ট। ১৯৯১

আলোচনা ঃ

পূর্বেই বলা হয়েছে ভারতের মধ্যে সাক্ষরতা হারের বিচারে সবচেয়ে পিছিয়ে রয়েছে চারটি বড় রাজ্য বিহার, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশ। তুলনামূলকভাবে দক্ষিনের চারটি রাজ্য — কেরালা, তামিলনাড়ু, কর্নাটক ও মহারাষ্ট্র অনেক সন্তোষজনক অবস্থায় রয়েছে। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে সব চেয়ে উন্নত এবং সবচেয়ে পিছেয়ে পড়া অঞ্চল দুটিকে উল্লেখ করা হয়েছে। এই সকল তথ্যের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সাক্ষরতার হার আশানুরূপ ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে এই রাজ্যে যেভাবে গুরুত্ব সহকারে সাক্ষরতা কর্মসূচী গ্রহন করা হয়েছে, সুদুর ভবিষ্যতে তার প্রতিফলন নিশ্চয়ই দেখা যাবে।

CHAPTER—3

Population and Quality of Life

Prof. Dhiraj Kr. Bandopadhyay

SUMMARY

Some social scientists have long voiced their concern about poverty or absolute misery of the third world as a whole due to large volume of population or higher rate of growth of population. But we have the view that the implications of a large and growing population for third world's development in general and India in particular can be judged by re-thinking the interrelationships between poverty, education, health, fertility and mortality. This alternative positive approach views poverty, illiteracy, infant mortality and problems of health, lack of sheltered jobs as the end products of social mismanagement and distorted man-management. It is universally accepted fact that scientific management through removal of these problems is positively co-related with decrease in the rate of growth of population. That is what has happened all-over the developed world.

In the past, India has attached overwhelming importance to planning of the commodity producing sectors at the expenses of social sectors. The development of human resource is closely related to the improvements in social sectors. It is also now generally recognised that the quality of life can be substantially improved with development of social sectors and this can be achieved even as comparatively low income levels. But this world requires major changes in the institutional structure of planning. Here only decentralised planning with mass participation at local levels could bring positive results.

We know that the rate of growth of population in European countries between 1750 and 1950 was far higher than that of the rest of world population only after 1940, however, the population of the third world as a whole has ben growing at a faster than the population of either the advanced capitalist or socialist countries. Population growth has not been accompanied by industrialization in most poor countries. Fall in mortality in such countries was not caused by a rise in private living standards nor even by an improvement in rate of growth of education, public health facilities and sanitation. It seems rather to have been caused by spectacular advances in the medical technology for controlling such bacterial deseases as malaria, small pox and cholera. It is fact that without an improvement in the income prospects and life expectations of the poor, the poor will have neither the incentive nor the means for palnning their family sizes. So, poverty, illiteracy and associated insecurity of health and life can be direct causes of a high birth rate. The poverty line is usually defined as the income which just allows an average person to satisfy his basic nutritional needs. We know that the Malthusian theory of population has been falsified in all the economically advanced countries. On the other hand, we find that in recent years also food production has been

kept pace with the population growth in the third world as a whole . The only problem remains the distribution of food in unequal societies. The third world countries in general and India in particular the approach to family planning also suffers from certain inherent limitations arising from its heavy dependence on medical infrastructure. On the whole, reduction of poverty, infant mortality, illiteracy and social disparities could only give the positive results.

"Developments of Human resource is the best contraceptive."

জনসংখ্যা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন

অধ্যাপক ধীরাজ কুমার বন্দোপাধ্যায়

ভূমিকা ঃ কিছু সমাজ তত্ত্ববিদ-মনে করেন যে অনুন্নত বা উন্নতীকামী (তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি) দেশগুলিতে যাবতীয় আর্থ-সামাজিক সমস্যার মূল কারণ হোল অধিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি বা অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ। এখানে আর্থ-সামাজিক সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে — দারিদ্রতা, বেকারতত্ব, উৎপাদন কম, মাথা পিছু আয়ের স্বল্পতা ইত্যাদি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে যখন অনুন্নত দেশগুলিতে অতিরিক্ত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করল, তারপর থেকে উপরোক্ত বক্তব্যটির প্রচার তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির জনসংখ্যা নীতি প্রণয়নে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে। ইহাই হলো ম্যালথাসিয়ান তত্ত্বের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা—অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নের বাধাস্বরূপ। আমরা জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমস্যাটির পরিপ্রেক্ষিতে এই অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাটিকে বা যুক্তিটিকে সমর্থন না করে একটি প্রগতিশীল বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেব এবং তা হবে তথ্যভিত্তিক আলোচনা। আমরা মনে করি যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন জনসংখ্যা বৃদ্ধির আকৃতি নিরূপন করে। আরো একটু পরিস্কার ভাবে বলা যায় যে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা সমাধানের প্রকৃষ্ট পথ। আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন বলতে আমরা বুঝি-জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন। জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন হল মাথাপিছু আয় এর বৃদ্ধি, আয়ের সমবন্টন ব্যবস্থা, সুস্বাস্থ্য সম্পর্কে সুনিশ্চিত করা এবং সার্বিক সুশিক্ষার প্রসার ঘটানো। আমরা মনে করি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে যদি গরীব মানুষদের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করা যায় প্রত্যেক মানুষের নিকট যদি নুন্যতম পুষ্টিজাত খাদ্য দেওয়া যায়, প্রত্যেক মানুষের নিকট যদি নূন্যতম বস্ত্র প্রদান করা হয়, প্রত্যেক মানুষকে যদি স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা দেওয়া হয় এবং প্রকৃত শিক্ষার প্রসার ঘটানো সম্ভব হয়, তা হলে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমস্যা না হয়ে সম্পদে পরিগণিত হবে।

আমরা এই অধ্যায়ের জনসংখ্যা সম্পর্কিত আলোচনা কয়েকটি অংশে ভাগ করে উপস্থাপন করবো। প্রথম অংশে আমরা সমগ্র পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি ও প্রকৃতির রূপরেখা বিশ্লেষণ করবো। দ্বিতীয় অংশে দেশগুলির আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপর তাহার প্রভাব কিরূপ তাহা আলোচনা করবো। তৃতীয় অংশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঠিক কারণগুলি কি কি এবং কোন্ তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে জনসংখ্যা নীতি রূপায়ণের চেষ্টা চলছে তাহা বিশ্লেষণ করবো। চতুর্থ অংশে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে—দারিদ্রতার ব্যপকতা এবং অনুপযুক্ত শিক্ষার ও স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে তাহা আলোচনা করবো। আমাদের এই অধ্যায়ের আলোচনার উদ্দেশ্য হোলো যে নিদারুণ দারিদ্রতা, ব্যাপক নিরক্ষরতা ও প্রকৃত শিক্ষার অভাব এবং সুস্বাস্থ্যের অনগ্রসরতা অর্ধোন্নত বা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে এবং বিশেষভাবে ভারতবর্ষে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১) সমগ্র বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি-প্রকৃতির রূপ রেখা ঃ আমরা জানি যে উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপ মহাদেশে সব থেকে বেশী জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ ছিলো। এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ পূর্বের যে কোন শতাব্দী থেকে বেশী হারে ছিলো। অপরদিকে অন্যান্য মহাদেশগুলিতে ঐ একই শতাব্দীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারে স্থিতাবস্থা বজায় ছিলো। অবশ্য সেই সময় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে ল্যাটিন আমেরিকাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিলো সবথেকে বেশী। যদিও সেই

সময় দক্ষিণ ইউরোপ থেকে আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলে প্রচুর পরিমাণে উদ্বাস্তু এসে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে আরও বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করেছিলো (Gloss and Grebenik, 1965)। কেবলমাত্র ১৯০০ সাল থেকে এবং বিশেষ করে ১৯৩০ সাল থেকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে জনসংখ্যা বেশী হারে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে (Bairoch, 1975, chap–1)। এতৎসত্ত্বেও ১৭৫০ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত্য ইউরোপ মহাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অবশিষ্ট পৃথিবীর তুলনায় সব থেকে বেশী ছিলো। অধ্যাপক কুজনেইটস (Prof. Kugnets.............., 1966, -pp. 36) তাঁর আলোচনায় দেখিয়েছেন যে ১৭৫০ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত্য সমগ্র ইউরোপের মোট জনসংখ্যা ১৫০ মিলিয়ণ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৮০০ মিলিয়ণে পৌছায়, অর্থাৎ প্রায় চারশত শতাংশ বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে পৃথিবীর অবশিষ্ট দেশগুলিতে মোট ৫৮০ মিলিয়ণ থেকে ১৬০০ মিলিয়ণ বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ প্রায় দুইশত শতাংশের কম বৃদ্ধি পায়। আমরা যদি আরো একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখবো যে ফ্রান্স, জার্মানি, ইংল্যাণ্ড (treland) স্ক্যানডেভিয়ান দেশ সমূহ , বেলজিয়াম ও নেদারল্যাণ্ড প্রভৃতি উন্নত দেশগুলিতে এবং উত্তর আমেরিকা ও ওসিনিয়া (Occanians) সম্মিলিতভাবে মোট জনসংখ্যার পরিমান ৫৯ মিলিয়ন থেকে ৩৭২ মিলিয়ণে পৌছায় অর্থাৎ প্রায় পাঁচশত শতাংশ বৃদ্ধি পায় (১৭৫০—১৯৫০)। অন্যদিকে পৃথিবীর বাকী দেশেগুলিতে মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে দুইশত শতাংশের মতো।

উপরোক্ত এই আলোচনা করার উদ্দেশ্যই হোল এমন যেন সমাজতত্ত্ববিদরা মনে না করেন যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যাটি মানব সমাজের সৃষ্টি থেকে কেবলমাত্র অনুন্নত বা উন্নতিকামী দেশগুলিতে ব্যাপকহারে হয়েছে এবং যাবতীয় আর্থ-সামাজিক অব্যবস্থার মূল কারণ হিসাবে নির্ধারক হয়েছে। আরোও উল্লেখযোগ্য বিষয় হোল যে-তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে ১৯৬০ সাল থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমতে শুরু করেছে। পূর্ব এশিয়ার বেশ কিছু দেশে যেমন – তাইওয়ান, হংকং, সিঙ্গাপুর এবং বিশেষ করে চীনে ১৯৬০ সাল থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমতে শুরু করেছে। আর্জেন্টিনা এবং উরুগুয়েতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে গিয়ে পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকার সমান হয়ে গিয়েছে। অবশ্য এটা ঠিকই যে ১৯৪০ সালের পর থেকে সমগ্র তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অধিকতর হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যাই হোক উন্নত দেশগুলির পক্ষে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা কি করে সমাধান করা সম্ভব হোল এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে কেনই বা তা সম্ভব হোল না—এই সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। কিছু জনসংখ্যা বিষয়ক সমাজতত্ত্ববিদ্ মনে করেণ যে—উন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়াই জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধে সক্ষম হয়েছে। তত্ত্বগত ব্যাখ্যাটি হোল—উন্নতদেশগুলিতে শিল্প বিপ্লবের ফলে উন্নত পুষ্টিজাত খাদ্যদ্রব্য জনসাধারণের জন্য খুব বেশী পৌছে দেওয়া গেছে, শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটানো সম্ভব হয়েছে এবং স্বাস্থ্যের সুযোগ প্রায় সকল মানুষের কাছে পৌছে দেওয়া গেছে। এর ফলে শিশু মৃত্যুর হার কমেছে, জন্মের হার কমেছে ও স্বাভাবিক মৃত্যুর হার সমান থাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশীভাবে বৃদ্ধি পায় নি। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে সকল মানুষের জন্য জীবনমানের উন্নয়ন করা সম্ভব হয়েছে বলেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা দেখা দেয় নি। যদিও সকল উন্নত দেশগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার একই প্রকৃতিতে কমতে শুরু করে নি (Mc Kcown, Brown & Record, 1972 and Ruggell, 1974)। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা সমাধানে সক্ষম হয় নি। এর কারণ হোল, প্রকৃত জাতীয় আয় এর উৎপাদন নিম্নমানে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফল সকল মানুষের কাছে পৌছে দেওয়া যায় নি। দারিদ্রতা দূরীকরণ সম্ভব হয় নি। সার্বিক শিক্ষার হার বৃদ্ধি পায় নি এবং সকল মানুষের জন্য স্বাস্থ্যের সুযোগ ও প্রসার ঘটানো সম্ভব হয় নি। ফলস্বরূপ, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যার সমাধান হয় নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে তৃতীয় বিশ্বের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রকৃতি কিরূপ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপর তাহার প্রভাব কিরূপ তাহার উপর

আলোকপাত করা যেতে পারে।

২) তৃতীয় বিশ্বের আর্থ-সামাজিক অবস্থার রূপরেখা এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা ঃ ১৯৯২ সালের ২৯ শে এপিল ইউ. এন. এফ. পি. এ [UNFPA (UNITED NATIONS FUND FOR POPULATION ACTIVITY)] বিশ্ব জনসংখ্যার অবস্থা সম্পর্কিত রিপোর্টি প্রকাশ করেছে । এই রিপোর্টের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি আলোচনা এবং বিশ্লেষণ করা বিশেষ প্রয়োজন। এই রিপোর্টের শিরোনাম হোলো – **"জনসংখ্যা, দারিদ্রতা এবং অর্থনৈতিক বিকাশ"**। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে – বিকাশশীল দেশগুলি, তাদের জনগণের জীবনযাত্রার অবস্থার উন্নতি করেছে যথেষ্ট। এতৎসত্বেও দারিদ্র, নিরক্ষর অশিক্ষিত এবং অপুষ্টির শিকারেও জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে। অভিমত হলো ঃ

ক) ১,১৫৬ মিলিয়ণ মানুষ পুরোপুরি দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন কাটাচ্ছে। ১৯৭০ সালের তুলনায় এই সংখ্যা ২১২ মিলিয়ণ বেশী।

খ) শুধু তাই নয়, অতিরিক্ত ৬০ মিলিয়ণ শিশুকে স্কুল ছাড়তে হয়েছে, অতিরিক্ত ৬৫ মিলিয়ণ নিরক্ষর থাকছে এবং অতিরিক্ত ৫০ মিলিয়ণ অপুষ্টিতে ভুগছে।

ইউ. এন. এফ. পি. এ দ্বারা উপরোক্ত রির্পোটে "মানব-সম্পদ বিকাশ" শিরোনামে বলা হয়েছে যে—দারিদ্রতা নির্মূলকরণ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নতিসাধন এবং নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি ক্রমশঃ আরোও সুষম উপায়ে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ রোধে বিশেষ অবদান যোগাবে। অবশ্য এর জন্য প্রয়োজন অবিলম্বে এর নিরন্তর এবং সুসংহত কর্মসূচীর রূপায়ন। নিরন্তর বিকাশের প্রথম ও প্রধান অর্থ হোল সম্পূর্ণ রূপে দারিদ্রতা নির্মূল করণ। বর্তমানে সারা দুনিয়ায় দারিদ্র কবলিত মানুষের সংখ্যা ১.১ বিলিয়ণের বেশী অর্থাৎ প্রায় ১১০ কোটির মতো। দ্বিতীয় বিষয়টি হোলো প্রায় ৩০০ কোটি মধ্যবিত্তের, যারা ধনী অথবা গরীব কোনটাই নয়। আশা-আকাংখা অবশ্যই পূরণ করতে হবে মাথা পিছু প্রকৃত অর্থের উর্পাজনের মাধ্যমে। তৃতীয়ত এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হবে ভবিষ্যত প্রজন্মের সুযোগ-সুবিধা বানচাল না করে, মানব-সম্পদ যোগাবার এবং বর্জপদার্থ গ্রহণের ক্ষেত্রে পৃথিবীর সীমিত সামর্থকে নিঃশেষ না করে। তা না হলে মানব জাতির দুর্দশার প্রাবল্যের শক্তির কাছে এই 'বিকাশ' কেবল নাটকের মাঝখানের গর্ভাঙে পরিণত হবে।

উপরোক্ত বির্পোটে আরো বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে—

মহিলাদের উচ্চতর শিক্ষা, স্বাস্থ্যের যত্ন, পরিবার পরিকল্পনা এবং ব্যক্তিগত আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নায্য মজুরীতে কাজকর্মের সুযোগ সুবিধে প্রদান করলে দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশ এবং পরিবারের আকার ছোট রাখার ব্যাপারে সহায়তা হবে। এক্ষেত্রে সমাজে নারীর ভূমিকা হবে গুরুত্বপূর্ণ।

পরিবারের আকার ছোট হলে উন্নত শিক্ষা, সুস্বাস্থ্য গঠন এবং পুষ্টিসাধন-এ প্রত্যক্ষ অবদান যোগাতে পারা যায়। ছোট পরিবারের ছেলেমেয়েরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয় এবং তাদের পুষ্টির অভাব ঘটে না। কুড়ি বছরের অনধিক বয়সের তরুণীদের গর্ভধারণ এবং সন্তানের জন্ম দান এড়ানো গেলে ৫ বছরের নীচেই শিশুদের মৃত্যুর হারও; সমসংখ্যায় অর্থাৎ প্রায় ১৭ শতাংশ কমানো যাবে। অতএব শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য মহিলাদের সমান অধিকার দানের বিষয়টিকে সর্ব্বোচ অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা রিৰ্পোটে উল্লেখ করা হয়েছে। স্বীকার করা হয়েছে যে—এর ফলে তাদের ব্যক্তিগত বিকাশ, ছোট আকারের পরিবারের গঠন এবং মাতা ও সন্তানের স্বাস্থ্য রক্ষা সুনিশ্চিত করতে উল্লেখযোগ্য অবদান যোগানো যাবে।

সুতরাং **উপরোক্ত** রিৰ্পোটের সর্বোপরি মতামত হোল-স্থায়ী উন্নয়নের জন্য চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু হোল **মানুষ। প্রকৃতির** সঙ্গে সমন্বয়ের ভিত্তিতে মানুষ সুস্থ ও উৎপাদনশীল জীবনের অধিকারী।

স্থায়ী উন্নয়নের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় কর্তব্য হোল দারিদ্রতা দূরীকরণ। শুধু তাই নয় ইউ. এন. এফ. পি. এ পরোক্ষভাবে স্বীকার করলো যে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যার মূল কারণ হোল — দারিদ্রতা, নিরক্ষরতা, শিক্ষার অভাব, নারীদের শিক্ষার অনগ্রসরতা, অতিরিক্ত শিশুমৃত্যুর হার এবং স্বাস্থ্য দানের সুযোগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ভাবে অনগ্রসরতা। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি যদি এই সমস্যাগুলি সমাধানে সচেষ্ট হোত তাহলে জনসংখ্যা নীতি কেবলমাত্র পরিবারের আয়তনকে নিয়ন্ত্রন করার প্রবণতা থেকে বিরত থাকত। অন্যভাবে বলা যায় যে জনসংখ্যা নীতিগুলির কেবলমাত্র কৃত্রিম উপায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি নেওয়ার প্রয়োজন হোত না। এই পরিপ্রেক্ষিতে তত্ত্ব এবং তথ্যভিত্তিক তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির জনসংখ্যানীতি পর্যালোচনা করার প্রয়োজন আছে।

৩) **অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনসংখ্যা সম্পর্কিত প্রগতিশীল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ঃ** সমাজ বিবর্তনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হোল মানবজাতি। এ কথা ঠিকই যে কোন সমাজের উৎপাদন-সম্পর্ক এর পরিবর্তনের সাথে সাথে মানবজাতির সংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাবকে ভিন্নভাবে দেখা যায় না এবং সেই প্রসঙ্গে আমরা এখানে যেতেও চাইছি না। কিন্তু মানবজাতির গুণগত মান উন্নয়ন ছাড়া সমাজ বিবর্তন সম্ভব নয়। অন্যভাবে বলা যায় যে মানবজাতির গুণগত মান উন্নয়নের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সমাজ বিবর্তনের প্রক্রিয়া জড়িত। যে বিষয়টি বোঝা দরকার সেটা হোল অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিভাবে মানবজাতির সংখ্যার বৃদ্ধির সহিত জড়িত। সাম্প্রতিক কালে বেশ কিছু সমাজতত্ত্ববিদ গোঁড়া তত্ত্বকে অবলম্বন করে নূতন নূতন পদ্ধতির মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের বাধাস্বরুপ হিসাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করে চলেছেন। এদের মতে— বিকাশশীল দেশগুলির পক্ষে জনসংখ্যা বৃদ্ধি বিশেষ করে ক্ষতিকর যেহেতু সীমিত উপরকরণ এবং সীমিত বিণিময় যোগ্য উপাদান মাথা পিছু আয় কমিয়ে দেয়, দারিদ্রতা বৃদ্ধি করে চলেছে, বেকারত্ব সৃষ্টি করে, ইত্যাদি। সুস্পষ্টভাবে এই ধরণের আলোচনাগুলিতে অধ্যাপক ম্যালাথাস্ এর তত্ত্বের যথেষ্ট প্রভাব পড়েছে। আমরা জানি ১৭৯৮ সালে রচিত অধ্যাপক ম্যালথাস্ এর বইটির নাম হোলো- "Essay on the Principle of Population as it affects the future improvement of Society". এই বইটির বিষয়বস্তু দুইটি শর্তের (Promises) উপর নির্ভর করে জনসংখ্যা সম্পর্কিত তত্ত্বগত আলোচনা বিশ্লেষণ করেছে। কিন্তু এই তত্ত্বগত আলোচনা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে জনসংখ্যানীতি রূপায়নে বিপথে পরিচালিত করেছে। উপরোক্ত দুইটি শর্ত হোল, ক) সমগ্র পৃথিবীর উপকরণ সীমিত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে প্রতি মানুষ উপাদেয় দ্রব্য কম পরিমানে পেতে থাকবে ; খ) মানুষ যখন তাহার প্রয়োজনের নূন্যতম দ্রব্য ও সেবাকার্য যতটুকু পাওয়া দরকার তার থেকে বেশী পেতে থাকবে তখন মানুষের পুষ্টি বৃদ্ধি পাওয়ায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি ক্ষমতা বেশী করে অর্জন করতে পারবে অর্থাৎ জনসংখ্যার পরিমান বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং ফলস্বরুপ পুনরায় মাথা পিছু আয় কমতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত উপাদেয় মাথাপিছু দ্রব্য ও সেবাকার্য নূন্যতম পর্যায়ে না পৌছায়। দুইটি শর্ত দ্বারা বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলে যে বিষয়টি বেরিয়ে আসে তা হোল সমগ্র পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েই চলবে এবং সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা কখনই ভালো হবে না। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা রোধ তখনই হবে যখন মহামারী, দুর্ভিক্ষ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ দ্বারা কোটি কোটি মানুষ মারা যাবে। অধ্যাপক ম্যালথাস্ এর তত্ত্বভিত্তিক বিষয়বস্তু সমগ্র পৃথিবীতে বিপরীতভাবে ঘটতে লাগলো এবং ভবিষ্যৎবানী যা করা হয়েছে তা কোন দেশের ক্ষেত্রেই ঘটেনি এবং জনসংখ্যার গতি-প্রকৃতি অন্যরকম ঘটেছে। উন্নত দেশগুলিতে মাথা-পিছু আয় বৃদ্ধি পাওয়ার পর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে গেছে এবং অনেক বিকাশশীল তৃতীয় বিশ্বের দেশেও মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি পাওয়ার পর জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ কমে গেছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি পাওয়ার পর জনসংখা বৃদ্ধির হার কমেনি এবং দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা সমাধানে সক্ষম হয় নি। ইহা

ছাড়াও অধ্যাপক ম্যালথাস তাঁর সমস্ত আলোচনার মধ্যে বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশল জাত উন্নতির ফলে যে সীমিত উপকরণের মধ্যে উৎপাদন অনেক গুনে বাড়িয়ে দিতে পারে তা আলোচনাই করে নি। বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলজাত উন্নতির অন্তর্নিহিত বিষয়টিই হোল মানবজাতির গুণগত মাণের উন্নয়ন। শুধু তাই নয় ম্যালথাথের আলোচনায় মানবজাতিকে চাহিদা সৃষ্টি করার কর্তা হিসাবে বেশী করে চিহ্নিত করা হয়েছে কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদন এর গুণগত মান উন্নয়নের পিছনে যে মানবজাতির একমাত্র ও বিশেষ ভূমিকা আছে তা অবজ্ঞা করা হয়েছে। উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা পরিস্কার হওয়া গেল যে অর্থনৈতিক উন্নয়নই কেবলমাত্র জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা সমাধান করতে পারে। কিন্তু ম্যালথাসের তত্ত্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ব্যহত করে তা দেখানো হয়েছে এবং পরোক্ষে মানুষকে 'আপদে' সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। বস্তুগতভাবে মানুষকে যদি ঠিকমতভাবে গড়ে নেওয়া যায় তাহলে সে সম্পদে রূপান্তরিত হবে। এর জন্যই অবশ্যই যেটা প্রয়োজন তা হোল নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী বর্জন করে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী নিতে হবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঠিক কারণগুলি আলোচনা করলেই বোঝা যাবে যে– ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী কতো বেশী জরুরী।

বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অধ্যাপক Espenshaete ১৯৭২ সালে প্রকাশিত ('For Survery of Socio-economic Theories of Fertility') বইটিতে দেখিয়েছেন যে - কোন পরিবারের আয়তন কত সদস্য বিশিষ্ট হবে তা কেবলমাত্র সঙ্কীর্নযুক্ত অর্থনৈতিক উপকরণ দ্বারা নির্ধারিত হয় না। যেটা হয় তা হোল সেই পরিবারের পিতা-মাতা সমাজে শ্রেণী কাঠামো ও জনস্বাস্থ্যের নিরাপত্তা দ্বারা প্রভাবিত হয়। সাধারণভাবে শিশুমৃত্যুর সম্ভাবনা যতো বেশী থাকবে তত বেশী পিতা-মাতা জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রতি অনীহা হয়ে উঠবে। অধ্যাপক Rao এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখিয়েছেন যে শিশুমৃত্যুর হার কমে গেলে জন্মের হারও কমে যাবে। তৃতীয় বিশ্ব তথা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে অধিকাংশ মানুষ গরীব এবং জীবনযাত্রার মধ্যে কোন অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা নেই বলে শিশু জন্মাবার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। স্থির উপার্জনকারী চাকুরিজীবি পরিবারগুলির ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে তারা পরিবারের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা অনেকটা দিতে পারছে এবং ছেলেমেয়ে শিক্ষা সম্পর্কে বেশ কিছুটা ব্যবস্থা করতে পারছে বলেই এদের ক্ষেত্রে জন্মের হার কমতে দেখা যাচ্ছে। অন্যদিকে যারা ভূমিহীন কৃষক, শ্রমিক ও অস্থিতি স্বল্প উপার্জন কারী ব্যক্তি তাদের পরিবারের সন্তান বৃদ্ধি পেলে তাকে সম্পদ হিসাবে গণ্য করে, কারণ তা পরিবারের ভবিষ্যতের উপার্জন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবে। যদিও বাস্তবে পরিবারের আয় বৃদ্ধি করেনা বরং অভাব অনটন ডেকে আনে। সুতরাং বর্তমানে নিম্ন আয় পরিবারগুলির মধ্যে জনসংখ্য বৃদ্ধির প্রবণতা সব থেকে বেশী। এই পরিবারগুলির নিম্ন আয় হওয়ার ফলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উপর নজরও বিশেষ দিতে পারে না।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে পরিস্কারভাবে যেটা বোঝা যায় তা হোল তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যার মূল কারণ নিম্নমাণের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা। দারিদ্রতা, অশিক্ষা ও অভাবণীয় ভাবে স্বাস্থ্যের প্রতি অবজ্ঞা তৃতীয় বিশ্বের মানুষদের নিম্নমাণের জীবযাত্রায় পরিচালিত করে চলেছে এবং তাহার ফলস্বরুপ অতিরিক্ত ভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমস্যা প্রকট ভাবে দেখা দিয়েছে। এই বিষয়গুলিকে একটু বিস্তারিতভাবে আমরা আলোচনা করব। কিন্তু তার পূর্বে তৃতীয় বিশ্বের তথা ভারত বর্ষের জনসংখ্যা নীতির মূল্যায়ণ করার বিশেষ প্রয়োজন।

৪) ভারতবর্ষের জনসংখ্যা নীতির মূল্যায়ণ ঃ ভারতবর্ষের জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করতে পরিকল্পনা গুলি কতখানি সক্ষম হয়েছে তা বিশ্লেষণ করার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। আমাদেরও নিরীক্ষণ করে দেখা দরকার ভবিষ্যত যে ভারত সরকারের পরিকল্পনা-মাফিক স্বাস্থ্য দপ্তরের উপর ব্যয় কতখানি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমাতে সক্ষম হয়েছে। সুনিশ্চিতভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্য

দপ্তরের এই নীতি রূপায়ণে অধ্যাপক ম্যলথাস্রে তত্ত্বের প্রভাব রয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এটাও বোঝা যাবে যে তৃতীয় বিশ্ব তথা ভারতবর্ষের জনসংখ্যা নীতি কতখানি বাস্তব সম্মত।

ভারতবর্ষে স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পর জনসংখ্যা আড়াইগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বশেষ জনসংখ্যা সুমারী থেকে জানা যায় যে ১ লা মার্চ ১৯৯১ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার পরিমান হোলো ৮৪৩.৯ মিলিয়ণ (Premi)। এইভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকলে সামনের ৩৫ বৎসরে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা আরো ৬০০ মিলিয়ণ বৃদ্ধি পাবে (U. N. Report, 1991, PP. 208)। ২০০০ সালে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা ১০০০ মিলিয়ণে গিয়ে পৌছবে এবং তাহা সমগ্র এশিয়া মহাদেশের প্রায় ২৮ শতাংশের মতো। কিন্তু দুঃখের বিষয় হোলো ভারতবর্ষের চল্লিশ বৎসরের পরিকল্পনা মাফিক অর্থনৈতিক উন্নয়ণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে রোধ করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। চল্লিশ বৎসরে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা ২.১ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। ১৯৫১-৬১ দশকে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা ৭৭.৬৮ মিলিয়ণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ১৯৮১—৯১ এর দশকে ১৬০.০০ মিলিয়ণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সারণী—১ এর মাধ্যমে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যভিত্তিক জন্মের ও মৃত্যুর হার এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধিরহারের পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষের রাজ্যগুলিতে জন্মের ও মৃত্যুর হারের মধ্যে কখনো স্থিতিশীল এবং কখনো অস্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে।

(সারণী-১) TABLE-1: PERCENTAGE CHANGE IN BIRTH AND DEATH RATES, 1971–89

States	Live Birth Rates 1979-81	Live Birth Rates 1987-89	Per Cent Change in Birth Rate	Death Rates 1979-81	Death Rates 1987-89	Per Cent Change in Death Rate
1	2	3	4	5	6	7
Andhra	31.6	27.8	−12.03	11.7	9.9	−18.18
Assam	32.9	32.1	−2.43	11.5	11.3	−1.77
Bihar	38.4	36.1	−5.99	14.7	12.6	−16.67
Goa	17.7	17.5	−1.13	7.1	7.8	8.97
Gujarat	35.1	29.7	−15.38	12.4	10.2	−21.57
Haryana	36.8	34.5	−6.25	11.0	9.0	−22.22
Himachal Pradesh	31.6	30.2	−4.43	10.8	8.9	−21.35
Jammu & Kashmir	31.3	31.4	0.32	9.3	7.9	−17.72
Karnataka	28.0	28.5	1.79	9.7	8.8	−10.23
Kerala	26.0	20.7	−20.38	6.8	6.2	−9.68
Madhya Pradesh	37.5	36.3	−3.20	15.7	13.5	−16.30
Maharashtra	28.3	28.9	2.12	10.0	8.4	−19.05
Orissa	31.9	31.1	−2.51	14.0	12.7	−10.24
Punjab	29.6	28.5	−3.72	9.2	8.2	−12.20
Rajasthan	37.1	34.2	−7.82	13.5	12.1	−11.57
Tamil Nadu	28.3	23.3	−17.67	11.7	9.3	−25.81
Uttar Pradesh	39.5	37.3	−5.57	16.4	13.4	−22.39
West Bengal	32.5	28.8	−11.38	11.3	8.7	−29.89
All India	33.8	32.1	−16.85	12.7	10.7	−31.54

* *Source* : Estimated from *Sample Registration Bulletin*, June 1991.

উল্লেখযোগ্য বিষয় হোল পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষ একমাত্র দেশ যেখানে জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য জনসংখ্যা নীতি সরকারীভাবে ১৯৫২ সালে প্রথম ঘোষণা হয়েছিলো। ভারতসরকারের এই জনসংখ্যা নীতি কেবলমাত্র পরিবার পরিকল্পনায় নামাঙ্কিত জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি রূপায়িত করে চলেছে, কিন্তু এই সরকারী নীতি ও পদ্ধতির সহিত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের প্রসার ঘটানোর কোন যোগসূত্র স্থাপন করেনি। প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরে স্বাস্থ্য দপ্তর প্রচুর পরিমাণে অর্থ ব্যয় করে চলেছে। ১৯৫১ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত ভারত সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর মোট ১,০২০ কোটি টাকা পরিবার পরিকল্পনা তথা জন্মনিয়ন্ত্রের জন্য ব্যয় করেছে। কেবলমাত্র ষষ্ঠ পঞ্চম—বার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারত সরকার ১,৫০০ কোটী টাকা পরিবার পরিকল্পনার খাতে ব্যয় করেছে (Planning Commission 1985)। কিন্তু দুঃখের বিষয় হোল জন্মের হার কমে যাওয়ার সাথে পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে আর্থিক ব্যয় এর কোন সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক পাওয়া যায়নি। ষষ্ঠ—পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য দপ্তর জন্মনিয়ন্ত্রনের উপর প্রচুর পরিমাণে ব্যয় করেছে, কিন্তু তার ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার মোটেই কমেনি। শুধু তাই নয়, জন্মের হার কমাতে গেলে জীবনমান উন্নয়নের, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের প্রসারের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তাহা স্বাস্থ্য দপ্তর উপলব্ধি করতে পারেনি। আরো উল্লেখ যোগ্য বিষয় হোলো – যে বয়সের মানুষদের "নির্বীজন" এর আওতায় আনা হয়েছে তাদের বয়স গড় ৩২.১ (Reports of Fifth, Sixth and Seventh Plan); Planning commission; 1992, pp. 332; ministry of Health & Family Welfare)। অবশ্য অষ্টম পরিকল্পনায় সঠিকভাবে স্বীকার করা হয়েছে যে নির্বীজনের আওতায় সঠিক বয়সের মানুষদের চিহ্নিত করে জন্মনিয়ন্ত্রণের আওতায় নিয়ে আসা হয় নি। কারণ ভারবর্ষের মানুষদের বিবাহের গড় বয়স হোলো ২০ বৎসর ও তাহার কম অথচ সেখানে নির্বীজনের আওতায় গড় বয়স নেওয়া হয়েছে ৩২.১ বৎসর বয়সের মানুষদের। যে বিষয়টি স্বীকার করা হয়নি তা হোলো জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সাফল্যের সঙ্গে রূপায়িত করতে গেলে অন্য যে বিষয়গুলি জড়িয়ে আছে যথা, আর্থিক আয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থান প্রভৃতির গঠন মূলক ব্যবস্থা করা। অষ্টম পরিকল্পনায় আরেকটি গুরুত্ব-পূর্ণ কথা স্বীকার করেছে যে, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের যথাযথ সুযোগ বৃদ্ধির অভাবে শিশু মৃত্যুর হার বেড়ে চলেছে। কেরালা ও গোয়া রাজ্য দুইটিকে বাদ দিলে দেখা যাবে যে বাকী রাজ্যগুলিতে – বিশেষ করে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান প্রদেশগুলিতে স্বাস্থ্যের নূন্যতম সুযোগ জনসাধারণের কাছে পৌছায়নি। শিশু মৃত্যুর হারের সহিত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যে ধণাত্মক সম্পর্ক আছে তাহা পূর্বে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে এবং আরো একটু বিশদভাবে আমরা আলোচনা করবো।

৫) দারিদ্র্য ও জনসংখ্যার বৃদ্ধির উপর তার প্রভাব : কোন দেশের দারিদ্র্যের অনেক গুলি ক্ষেত্র আছে সেগুলির সবকটিকে সুস্পষ্ট ব্যাখা দেওয়ার যথেষ্ট অসুবিধে রয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির তথা ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের মূল কারণ হোল অসম উৎপাদিত দ্রব্যের অসম বন্টন ব্যবস্থা। প্রায় চল্লিশ শতাংশের মতো মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করে। যারা দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করে তাদের মাথাপিছু আয় এতই কম যে ক্রয়ক্ষমতা একেবারে নেই বললেই চলে। অতি কম মানের ক্রয়ক্ষমতা থাকার ফলে প্রায় চল্লিশ শতাংশ-এর মতো মানুষের সুস্থ ও স্বাভাবিক ভাবে বেঁচে থাকার জন্য যে পরিমান নুন্যতম প্রায়োজন, প্রয়োজনীয় নূন্যতম খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্র পরিধান, একটা বাসস্থান—এর যোগাড় ও জীবনের বেঁচে থাকার জন্য নূন্যতম স্বাস্থ্যের সুযোগের সুরাহা করতে পারে না। স্বল্প মানের ক্রয় ক্ষমতার মূল কারণ হোলো দেশের দ্রব্য ও সেবাকার্য্যের উৎপাদনের ক্ষেত্রে এদের নিয়োগ করা হয়নি, এবং শ্রমের উপযুক্ত বিনিময়ের আয় এরা পায়না। কিন্তু ভারতবর্ষের খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন যথেষ্ট পরিমানে বৃদ্ধি পেয়েছে। উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্যের অসম বন্টন ব্যবস্থা যথেষ্ট ভাবে বিদ্যমান। দেশের চল্লিশ শতাংশ মানুষের কাছে নূন্যতম খাদ্যদ্রব্য যোগান দিয়ে কিছুটা শারীরিক পুষ্টি প্রদান করতেও ভারত সরকার অক্ষমতা

প্রর্দশন করেছে। এই চল্লিশ শতাংশ মানুষ খাদ্যদ্রব্যের উপর যখন ব্যয় করতে পারে না তখন তাদের ক্রয়ক্ষমতা থেকে স্বাস্থ্য, বাসস্থান ও শিক্ষার উপর ব্যয় করাটা আরো বেশী কঠিন বলে এরা মনে করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই চল্লিশ শতাংশ মানুষের প্রতি খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী সমাজসেবামূলক দীর্ঘকালীন স্তরে ব্যয় করার দায়িত্বকে কোন ভাবেই অবজ্ঞা করা উচিৎ নয় বা ভারত সরকারের যে এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রয়োজন আছে তাহা সহজেই অনুমেয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এই গরীব পরিবারগুলির এবং অতি অশিক্ষিত নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার গুলির মধ্যে বেশী করে দেখা যাচ্ছে। এই শ্রেনীর মানুষেরা বা পরিবারবর্গ এই ধারনা পোষন করে যে নূতন শিশু তাহার পরিবারের আয় বৃদ্ধি করবে এবং জনস্বাস্থ্যের সুযোগের অভাবে শিশুর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কম থাকলে পরিবারের সদস্য বৃদ্ধির প্রবণতা আরো বেশী করে বৃদ্ধি পাবে।

'জনসংখ্যা' ও 'দ্রারিদ্রতা' এই দুইটি ধারণার মধ্যে প্রাপ্ত খাদ্যের বিষয়টি নিগূঢ় যোগসূত্রস্থাপন করে। ভারতবর্ষের মতো দেশে প্রাপ্ত খাদ্যের পরিমানের উপর নির্ভর করে দারিদ্রতার গভীরতা কতখানি। ঐতিহাসিকভাবে জনসংখ্যা সম্পর্কিত আলোচনা শুরু হয়েছে 'জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সহিত খাদ্যের যোগানের যোগসূত্রস্থাপন ক'রে। অধ্যাপক ম্যালথাস এর মতে অতিরিক্ত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তার খাদ্যের যোগানের উপর চাপ পড়বে এবং খাদ্যের যোগান জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সমানভাবে বৃদ্ধি পাবে না। বাস্তবে দেখা যায় যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। মানুষ তার চাহিদার তাগিদে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়। জমি ও তার উপকরণ অপরিবর্তিত থাকলেও উন্নত পদ্ধতির দ্বারা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। শিল্পের উৎপাদনের ক্ষেত্রে ঠিক একই রকম খাটে। উৎপাদনে এই উন্নত পদ্ধতির আবিষ্কার ও তার প্রয়োগ মানুষের গুণগত মান উন্নয়নের দ্বারাই সম্ভব হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাপক ম্যালথাসের 'Optimum Theory of Population' এর ব্যাখ্যা বাস্তবসম্মত নয়। প্রকৃত ঘটনা হোল জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে খাদ্য উৎপাদেন বৃদ্ধি পায় কিন্তু উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্যের অসম বন্টন ব্যবস্থা, কতিপয় মানুষের দ্বারা কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি ও খাদ্যের অসম মূল্য ব্যবস্থা, তৃতীয় বিশ্বের প্রচুর সংখ্যক মানুষদের দারিদ্রতার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে।

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে একটু গভীরভাবে বিষয়টিকে আলোচনা করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমরা দেখি জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে খাদ্যের উৎপাদন ও যোগান দুইটিই বৃদ্ধি পেয়েছে এবং স্বাধীনতার পর অনেকগুলি বড় আকারের দুর্ভিক্ষ বা খাদ্যভাবের অবস্থা সামাল দেওয়া গেছে। প্রকৃতপক্ষে যে বিষয়টি পরিস্কার ভাবে জনসংখ্যার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করা উচিত তা হোল খাদ্যের সুষম বন্টন। ভারতবর্ষের প্রায় পঞ্চাশ শতাংশের মতো মানুষকে আর্থিক ব্যবস্থা দুটি মেরুর মধ্যে জীবন যাপন করতে হয়। একটি হোল অসম আয় বন্টন ব্যবস্থা এবং অপরটি হোল খাদ্যদ্রব্যের অসম বন্টন ব্যবস্থা।

অবশ্য এখানে আমরা দারিদ্রতার ব্যপ্তি ও পরিমাপ কতখানি এবং তাহার ফলে গরীব মানুষেরা কতখানি পুষ্টিজাত খাদ্যদ্রব্য পাচ্ছে ও তাহার সহিত জনসংখ্যা বৃদ্ধির সম্পর্ক কিরূপ সেরকম কোনো তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যে যাচ্ছি না। যে বিষয়টি নজর দেওয়া ও বোঝা প্রয়োজন তা হোল--ভারতবর্ষের কেবলমাত্র চল্লিশ শতাংশের মতো মানুষ নয় বরং প্রায় পঞ্চাশ শতাংশের মতো মানুষ কতটুকু পুষ্টিজাত খাদ্যদ্রব্য ভোগ করতে পারছে। দারিদ্রতার সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধির যোগসূত্রটি নির্ভর করে তা হোল নূন্যতম পুষ্টিজাত খাদ্যদ্রব্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের খাদ্যদ্রব্যের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটির প্রকৃতি কিরূপ তাহা নিরীক্ষণ করার যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে।

ভারতের খাদ্যশষের উৎপাদন ১৯৫৩ সালে ৫৯.২ মিলিয়ন টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৬৯ সালে হয়েছে ১৭০.২৫ মিলিয়ন টন। খাদ্যশষ্য উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে ঠিকই কিন্তু

মাথা পিছু খাদ্যশবের প্রাপ্তির পরিমান বৃদ্ধি পায়নি। ১৯৭১-১৯৮৯ সালের মধ্যে মাথাপিছু খাদ্যশষ্য প্রাপ্তি আগের দশকের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে (Ministry of Agriculture, 1990) এটা পরিস্কার ভাবে দেখা যায় যে খাদ্যশষ্যের মধ্যে চাল, গম, চিনি বাদ দিলে নিরপেক্ষভাবে খাদ্যশষ্যের মাথাপিছু প্রাপ্তি হ্রাস পেয়েছে। অপরদিকে ভারতবর্ষের তিনটি রাজ্যে গমের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় মাথাপিছু গম প্রাপ্তি বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু সাধারণভাবে মাথাপিছু খাদ্যশষ্য প্রাপ্তি কমে গেছে। যেটা ঘটে চলেছে তা হোল খাদ্যশষ্যের উৎপাদনে গঠন প্রকৃতির একটা গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য্য আছে। অপরদিকে ভারতবর্ষের খাদ্যশষ্য উৎপাদনের হার সব রাজ্যগুলিতে এক নয়। ১৯৬৫ সালের পর থেকে পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং উত্তরপ্রদেশ এই তিনটি রাজ্য বাদ দিলে বাকী রাজ্যগুলিতে খাদ্যশষ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির হার (চাল, গম বাদ দিলে) মোটামুটিভাবে অপরিবর্তিত আছে। মোটা খাদ্যশষ্য যথা—বাজরা, জোয়ার, ভুট্টা ইত্যাদি উৎপাদনের হার তিনটি রাজ্য বাদ দিলে গোটা ভারতবর্ষে স্থিতাবস্থার মধ্যে রয়েছে। এটা সর্বজনগ্রাহ্য যে ভারতবর্ষের প্রায় চল্লিশ শতাংশের মত মানুষের মূল পুষ্টিজাত খাদ্যশষ্য হোল—এই মোটা জাতীয় খাদ্যশষ্যগুলি জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা ইত্যাদি।

বিগত ত্রিশ বৎসর ধরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যগুলিতে খাদ্যশষ্যের উৎপাদন বৈষম্যহারে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে রাজ্যগুলির মধ্যে খাদ্যশষ্য উৎপাদনের এক ব্যপক ফারাক লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ১৯৬৫ সালের সবুজ বিপ্লবের ফলে হরিয়ানা, পাঞ্জাব এবং উত্তরপ্রদেশে খাদ্যশষ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ; কিন্তু অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যশষ্যের উৎপাদন প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থায় আছে। অপরদিকে বাকী রাজ্যগুলিতে খাদশষ্য উৎপাদনে হ্রাস পাওয়ার ঝোঁক রয়েছে। ফলস্বরুপ, বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে খাদ্যশষ্যের বাজারের যোগান অসম হারে বর্তমান। যদিও কয়েকটি রাজ্য খাদ্যশষ্যের ঘাটতি সামাল দিতে কোনরকমে সক্ষম হয়েছে।

ভারতবর্ষে রাজ্যগুলির খাদ্য দ্রব্যের ভোগ প্রবনতা নিজ নিজ রাজ্যের মাথা পিছু আয়ের উপর নির্ভর করে না। যে ঘটনাটি বাস্তবে দেখা যায় তা হোল—বিভিন্ন রাজ্যগুলির খাদ্যদ্রব্যের ভোগ নিজ নিজ রাজ্যের খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের উপর নির্ভর করে। তুলনামূলক ভাবে যে রাজ্যে মাথা পিছু আয় বেশী, সে রাজ্যে খাদ্যদ্রব্যের ভোগ কম। অপরদিকে এটা কখনই দায়িত্ব নিয়ে বলা যায় না যে—কোন রাজ্যে মাথা পিছু আয় বেশী হলেই সে রাজ্যের মানুষদের খাদ্যদ্রব্যের ভোগ বেশী। কিন্তু ভারতীয় অর্থনীতিতে খোলাবাজারে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে বিনিময় ক্রিয়া সম্পন্ন করে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনে উদ্বৃত্ত রাজ্যগুলি থেকে ঘাটতি রাজ্যগুলির অভাব পূরণ করে না। খাদ্যদ্রব্যের খোলা বাজারের অসফলতা (চাহিদা-যোগানের ভারসাম্যহীনতা) খুবই ঘনিষ্টভাবে দারিদ্রতা ও অসম আয়বন্টন ব্যবস্থার সহিত সম্পর্ক যুক্ত। N S S-র 1981পরিসংখ্যান নিরীক্ষণ করে দেখা গেছে যে সকল রাজ্যগুলিতে মাথাপিছু খাদ্যশষ্য উৎপাদন কম সেই রাজ্যগুলিতে খাদ্যশষ্যের দামও বেশী। খোলা বাজারে খাদ্যশষ্য উৎপাদনে উদ্বৃত্ত রাজ্যগুলি থেকে খাদ্য দ্রব্য উৎপাদনে ঘাটতি রাজ্যগুলির শহরাঞ্চলগুলিতে খাদ্যশষ্য চলাচল করে। এর কারণ খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনে ঘাটতি রাজ্যগুলির শহরাঞ্চল গুলিতে মানুষদের আয় বেশী হওয়ার জন্য তারা বেশীদামে খাদ্যশষ্য ক্রয় করতে সক্ষম হয়। কিন্তু খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনে ঘাটতি রাজগুলির গ্রামাঞ্চলের বেশীরভাগ স্বল্প-ক্রয়-ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষেরা বেশী দাম দিয়ে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করতে পারে না এবং তার ফলে খোলাবাজারে উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্যের উদ্বৃত রাজ্যগুলি থেকে, খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনে ঘাটতি রাজগুলির গ্রামাঞ্চলে পৌঁছায় না।

এইভাবে ভারতের খাদ্যদ্রব্যের খোলাবাজারের অর্থনীতিতে 'চাহিদা—যোগানের' স্বয়ং ক্রিয় সাফল্য অর্জন করতে পারে না। এক্ষেত্রে যেহেতু ঘাটতি রাজ্যগুলির গ্রামাঞ্চলের বেশীরভাগ মানুষের আয়-গত স্থিতিস্থাপকতা খাদ্যশষ্যের প্রতি খুব বেশী এবং দাম-গত স্থিতিস্থাপকতাও খুব

বেশী, সেহেতু দাম বেশী হওয়ার জন্য খাদ্যশস্যের চাহিদা ও ভোগ অভাবের তুলনায় খুব বেশীভাবে হ্রাস পায়। অবশ্য মাথা পিছু খাদ্যশষ্য উৎপাদন যে রাজ্যগুলিতে বেশী সেই সব রাজ্যগুলির গ্রামাঞ্চলে খোলাবাজারের খাদ্য অর্থনীতির অসাফল্যের সৌভাগ্যে গরীব মানুষদের কাছে খাদ্যদ্রব্য বেশী করে ভোগ করার সুযোগ থাকে। অবশ্য এখানেও জমিদারশ্রেণী ও খাদ্যশয্য ব্যাবসায়ীরা বিভিন্নভাবে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে থাকে। আমরা 'National Sample Survery' এর পরিসংখ্যান থেকে জানতে পারি যে ভারতের যে সব রাজ্যগুলিতে খাদ্যশয্য উৎপাদনে ঘাটতি আছে সেই রাজ্যগুলিতে উৎপাদনে উদ্বৃত্ত রাজ্যগুলি দ্বারা খাদ্যশয্য যোগান দিয়ে খোলাবাজারের খাদ্য অর্থনীতিকে সচল রাখতে পারে নি। 1980 সালের পর থেকে একটি রাজ্য থেকে অন্যরাজ্যের খাদ্যদ্রব্য চলাচল করতে সবরকম নিয়ম সরকার তুলে নেওয়ার পরেও খাদ্যদ্রব্যের খোলাবাজার উৎপাদনে ঘাটতি রাজ্যগুলির গরীবমানুষের কাছে যোগান দেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে শহরাঞ্চলের মানুষদের জন্য ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীরা খাদ্যদ্রব্যের যোগান নিয়মিত দিয়ে চলেছে। এর কারণ অবশ্যই শহরাঞ্চলের মানুষেরা বেশী দাম দিতে পারে, ক্রয়ক্ষমতাও রয়েছে ও এখানে যানবাহন খরচ কম। কিন্তু উৎপাদনে ঘাটতি রাজ্যগুলির গ্রমাঞ্চলে গরীব মানুষেরা খাদ্যদ্রব্যের দাম বেশী দিতে পারে না, ক্রয়ক্ষমতা কম এবং ফলস্বরুপ বাধ্য হয়ে খাদ্যশষ্য ভোগ করতে হয় কম।

যাই হোক ভারতের প্রায় চল্লিশ শতাংশের মতো মানুষ নূন্যতম খাদ্যদ্রব্য ভোগ করে স্বাভাবিক ও সুস্থভাবে বেঁচে থাকার নূন্যতম পুষ্টিটুকুও পাচ্ছে না। এখানে নূন্যতম পুষ্টি বলতে আমরা দারিদ্র্য সীমারেখায় যতটুকু পুষ্টিজাত খাদ্যদ্রব্য পাওয়া উচিৎ সেই বিষয়টিই বলছি। যদিও ভারতের পরিকল্পনা দপ্তর দারিদ্রতার সীমারেখাকে কোন মানুষের মোট ভোগব্যয়ের উপর নির্ভর করে সীমারেখা টেনেছে ভারতের কতজন মানুষ দরিদ্র সীমার নীচে রয়েছে। এতৎসত্ত্বেও, আমরা যদি National Sample Survey 1961 থেকে 1988/89 সাল পর্যন্ত নিরীক্ষণ করি তাহলে দেখতে পাবো যে ভারতের নিম্ন ব্যয়ের ত্রিশ শতাংশের বেশী মানুষ মোট খাদ্যদ্রব্য-এর উপর ব্যয় অপরিবর্তিত অবস্থায় রেখেছে, অর্থাৎ এদের খাদ্যশয্যের উপর ব্যয় খুবই কম যাতে করে তারা নূন্যতম পুষ্টিজাত খাদ্য দ্রব্য পায় না। এই নূন্যতম পুষ্টিজাত খাদ্যদ্রব্যগুলি হোল জোয়ার, ভুট্টা, বাজরা ইত্যাদি–যেগুলি থেকে গরীব মানুষেরা নিজেদের নূন্যতম সুস্থ অবস্থায় রেখে উৎপাদনে কর্মক্ষমতা সবল রাখতে পারে। এটাকে যদি দারিদ্রতার সীমারেখা হিসেবে ধরা হয় তাহলে দেখা যাবে, দারিদ্রতা ভারতের প্রায় ত্রিশ কোটি মানুষের ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৮৯ সালের মধ্যে কোনো পরিবর্তন হয় নি। পরিকল্পনা দপ্তর যে মোট ভোগব্যয়কে দারিদ্র্য সীমারেখার মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহার করে থাকুক এবং সেই হিসেবে বলে চলেছে যে ১৯৬১-১৯৮১ সালের মধ্যে দারিদ্রতার পরিমান বা গরীব মানুষের সংখ্যা কমেছে। এটা এক ভূল তথ্য ও চিত্র প্রদর্শন করে।

আবশ্য এটা ঠিক যে সরকারী গণ-বন্টনী-ব্যবস্থা রাজ্যগুলির মধ্যে খাদ্য-উৎপাদনের অসম হার থাকা সত্বেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। তবে খাদ্যশষ্যের মধ্যে চাল ও গম বন্টনের ক্ষেত্রে সেটা সীমাবদ্ধ। এখানে অধ্যাপক মহেন্দ্রদেব ও অধ্যাপক সূর্য্যনারায়ন এর National Sample Survry–1986–এর উপর ভিত্তি করে একটি গবেষণামুলক রচনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। গণ-বন্টন ব্যবস্থা কিরুপ এবং গরীব মানুষের দারিদ্রতার উপর প্রভাব কতখানি–এই দুইজন অধ্যাপক কয়েকটি অংশে ভাগ করে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করছেন। এখানে চারটি পদ্ধতির (Cirterion) কথা বলা হয়েছে–(ক) খাদ্যদ্রব্যের মোট কতখানি অংশ গ্রামের মানুষেরা পাচ্ছে ; (খ) গ্রামে খাদ্যের প্রাপ্তি ও মোট গণবন্টনের খাদ্যদ্রব্যের পরিমানের অনুপাত দিয়ে দেখা যেতে পারে যে গ্রামের গরীব মানুষেরা কতখানি "গণবন্টন" ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল ; (গ) মাথাপিছু কতখানি খাদ্যদ্রব্য গণবন্টন ব্যবস্থা দ্বারা গ্রামের মানুষেরা ক্রয় করে থাকে এবং (ঘ) গণবন্টন

ব্যবস্থার উপর ক্রয়ের ক্ষেত্রে নির্ভরশীলতা কতখানি। এই চারটি পদ্ধতি দ্বারা উপরোক্ত দুইজন সমাজতত্ত্ববিদ বৈজ্ঞানিক সম্মত পরিসংখ্যান দিয়ে দেখিয়েছেন যে "গণবন্টন ব্যবস্থার" উপর ভারতের প্রায় চল্লিশ শতাংশ মানুষের নির্ভরশীলতার ব্যাপ্তি কতোখানি। এই আলোচনার মতে-- ভারতের গ্রামের দরিদ্র মানুষেরা গণ-বন্টন ব্যবস্থার উপর ১৬ শতাংশের মতো চাল, গম ক্রয়ের ক্ষেত্রে নির্ভরশীল অর্থাৎ দরিদ্র মানুষদের প্রয়োজনের তুলনায় বা মোট চাহিদার মাত্র ১৬ শতাংশ চাল ও গম গনবন্টন ব্যবস্থা থেকে যোগাড় করতে পারে। মোট জাতীয় খাদ্যশস্যের মোট চাহিদার কেবলমাত্র পাঁচ শতাংশ 'গনবন্টন ব্যবস্থা' থেকে পেয়ে থাকে। এর থেকে খুব সহজেই অনুমেয় যে গনবন্টন ব্যবস্থা ভারতের প্রায় চল্লিশ শতাংশ মানুষের নূন্যতম খাদ্যদ্রব্য যোগান দিতে তো পারেই না বরং মোট নূন্যতম চাহিদার এতই কম পরিমান গনবন্টনব্যবস্থা যোগান দিয়ে থাকে যে চাহিদার বাকী অংশ এরা খোলাবাজারে অত্যন্ত চড়াদামে ক্রয় করতে বাধ্য হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এখানে যদি একুট সর্তকভাবে নিরীক্ষণ করি তাহলে দেখতে পাবো যে ভারতের যে সকল রাজ্যগুলিতে খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন চাহিদার তুলনায় কম এবং গনবন্টন ব্যবস্থা যেখানে গরীব মানুষদের চাহিদার খুব অল্প অংশই যোগান দিচ্ছে, সর্বোপরি ব্যক্তিগত উদ্যোগে যখন দামেরদ্বারা প্রভাবিত আর্কষন বিহীন খাদ্যদ্রব্যের যোগান 'উদ্বৃত্ত-উৎপাদনকারী' রাজ্যগুলি থেকে গরীব মানুষের মাথাপিছু প্রাপ্তি খোলাবাজারের মাধ্যমে সুনিশ্চিত করতে পারেনা, তখন নূন্যতম পুষ্টির অভাব কতখানি তাহা কি ভারতের পরিকল্পনা দপ্তর কখনোই নিরীক্ষণ করে দেখেছেন বা অনুভব করেছেন? আর তা যদি না করেই থাকে (পরিকল্পনা গুলির আলোচনা দেখে এটা সুনিশ্চিত ভাবে বোঝা গেছে) তা হলে দরিদ্র সীমার নীচে কতজন মানুষ বাস করছেন এবং প্রতিটি পরিকল্পনায় কতজন গরীবমানুষের সংখ্যা কমানো গেছে সেটা কেবলমাত্র কয়েকজন সমাজত্ত্ববিদগণের তাত্ত্বিক দরিদ্র সীমার ব্যাখ্যা দিয়ে কেন ভারতের বুদ্ধিজীবি মানুষদের প্রতারণা করার চেষ্টা করছেন?

আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হোলো গনবন্টন ব্যবস্থা দ্বারা যখন খাদ্যশষ্য বেশী দাম দিয়ে উৎপাদনকারীর নিকট কেনা হয়। এখানে বেশী দামটি হোল প্রান্তিক ব্যয় ও ধার্য্য দামের সমতার থেকে আরো কিছুটা বেশী দাম দিয়ে খাদশষ্য ক্রয় করার কথা বলা হয়েছে। এই বেশী দাম দেওয়ার পদ্ধতিকে বলা হয় Subsidy দেওয়া। কিন্তু গনবন্টন ব্যবস্থা যে খাদ্যশষ্যের ক্ষেত্রে Subsidy দিয়ে থাকে (পরোক্ষভাবে আর্থিকভাবে সাহায্য দেওয়া) সেক্ষেত্রে এক শ্রেণী মানুষের অদ্ভূত রাজনৈতিক স্বার্থ অর্ন্তনিহিত থাকে। এই Food Subsidy দেওয়ার ফলে বড়-বড় কৃষক (এবং উৎপাদনকারী কৃষক) বেশী লাভবান হয়। ক্ষুদ্র চাষী বা মধ্যবিত্ত কৃষক বড় বড় কৃষক সমাজরের কাছে তাহাদের উৎপাদিত খাদ্যশয্য কম দামে বিক্রয় করতে বাধ্য হয় এবং বড় বড় কৃষক (আসলে এদিকে সে অর্থে বড় কৃষক না বলে জমিদার শ্রেণী বলাই ভাল) Food Subsidy পাওয়ার পর বেশী মুনাফা অর্জন করে। পরীক্ষামূলকভাবে দেখা গেছে যে Food Subsidy দেওয়ার ফলে জমির উৎপাদন শক্তি কমে যায়। কারন বড় কৃষকরা মনে করে যে কৃৎকৌশজাত বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার না করে Food Subsidy এর রাজনৈতিক ফায়দার উপর জোর/ফাটকা মুনাফা বেশী অর্জন করতে সচেষ্টা হয়। সেইজন্য খাদ্যশষ্য কম উৎপাদনকারী রাজ্যগুলি যদি উৎপাদনী শক্তির উপর জোর না দিয়ে যদি Food Subsidy উপর জোর দেয় তাহলে মারাত্মক ভূল হবে। উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা পরিস্কাব হওয়া গেল যে নিদারুণ দারিদ্র্যের ফলে ভারতের অধিকাংশ মানুষ পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। এর ফলে সব সময়ই এই সকল পরিবারবর্গ সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবারের আয় বৃদ্ধির প্রবণতাকে প্রশয় দেয় এবং ফলস্বরূপ এই প্রবণতা ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর সঙ্গে আমরা যদি শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের প্রভাব জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কতখানি, তাহা আলোচনা করি তাহলে দেখতে পাবো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি কতখানি ভুল জনসংখ্যা নীতি রুপায়ন করে চলেছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপর শিক্ষাও স্বাস্থ্যের প্রভাব ঃ এখান আমরা সাধারণভাবে সামাজিক উন্নয়ন ও মানব-সম্পদ বিকাশের জনসংখ্যার উপর এবং সুস্পষ্টভাবে জন্মের হারের উপর কি প্রকারের প্রভাব সৃষ্টি করে তাহা আলোচনা করব। সামাজিক উন্নয়ণ ও মানব সম্পদ বিকাশের দুটি উল্লেখযোগ্য শর্ত হোল—শিক্ষার বিস্তার ও স্বাস্থ্যের প্রসার।

এই পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত বিষয়ের উপর ভারতের দুইটি রাজ্যের দৃষ্টান্তের প্রতি আলোকপাত করা বিশেষ প্রয়োজন। শিক্ষার বিস্তার ও স্বাস্থ্যের উন্নতি এই দুইটি রাজ্যের উপর কিরুপ প্রভাব জনসংখ্যার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সৃষ্টি করেছে তাহা সঠিকভাবে মূল্যায়ণ করা উচিত। ভারতবর্ষের এমন দুইটি রাজ্য হোল—কেরালা ও গোয়া—যে রাজ্যদুইটিতে গত ৩৫ বৎসরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ কমতে শুরু করেছে। কেরালাতে 1971-73 সালে জন্মের হার ছিল প্রতি 1,000 জনে 30.5 এবং তা কমে গিয়ে 1987-89 সালে হয়েছে প্রতি1,000 জনে 20.7। ঠিক একই সময়ে গোয়া রাজ্যে জন্মের হার 25.4 থেকে কমে গিয়ে 17.5 হয় (Registrar-General, June—1991)। অতএব উপরোক্ত দুইটি রাজ্য আমাদের মূল্যবান জনসংখ্যা শিক্ষার বিষয় বস্তুর উপর আলোকপাত করে। কেবলমাত্র এটাই বড় কথা নয়—কেরালা এবং গোয়ার অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানতে পরি যে যদি দৃড়তার সহিত সঠিকভাবে সামাজিক, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার প্রকৃত উন্নয়ন ঘটানো যায় তা হলে 25 বৎসরের মধ্যে প্রতি 1,000 পিছু জনসংখ্যাকে 35 থেকে 20 তে নামামো সম্ভব।

সঠিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি পরিবর্তনের প্রক্রিয়া নির্ভর করে কতকগুলি মানসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, কৃৎকৌশল ও কাঠামোগত পরিবর্তনের উপর। কোন সমাজের সমষ্টিগতভাবে উপরোক্ত বিষয় গুলির উপর গুরুত্ব দিয়ে পরিবারের আয়তন সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। কিছু সমাজতত্ববিদ এই মত পোষণ করে থাকেন যে আধুনিকতা, শহ্রাঞ্চলে পরিবর্তন হওয়া এবং শিল্পায়নের উন্নতি হলেই জনসংখ্যার বৃদ্ধি চাপ এড়ানো যাবে। তাহা যে সম্ভব হয় নি ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে তাহা সহজেই অনুমেয়। কেরালা এবং গোয়া রাজ্য দুইটির ক্ষেত্রে কখনোই বলা যায় না যে শিল্পায়নের এবং শহারাঞ্চলের জন্যই জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার কমেছে। এমনকি যে পরিমান শিল্পায়ন এরং শহ্রাঞ্চলের ভিত্তিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানো যায় সেই পরিমান আধুনিক শিল্পায়ন ও নগরাঞ্চল কেরালা এবং গোয়াতে হয় নি।

সাম্প্রতিক কালে এই অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে যে আধুনিক মানসিকতা হোলো স্বাস্থ্যের উন্নত ও জনসংখ্যার আকার পরিবর্তনের মূল নির্ধারক [Mechanic1992]। পরিবারের আকৃতি সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে পরিবারের কর্তার মানসিকতার পরির্বতনের উপর অর্থাৎ পরিবারের কর্তারা তাহাদের ছেলেমেয়েদের সুস্বাস্থ্যের প্রতি কতখানি যত্নবান বা সর্তকতা অবলম্বন করে থাকে। এই ধরণের মানসিকতার সহিত শিশু বেঁচে থাকা অনেকখানি সরাসরি যোগসূত্র স্থাপন করে। যদি পরিবারের কর্তারা মনে করে যে তাহাদের সন্তানসন্ততিদের বাঁচার সম্ভাবনা বেশী তাহ হলে তাহারা কম শিশু লইয়া ছোট পরিবারের কথা চিন্তা করে। অতএব জন্মের স্বল্প হার দুইটি পূর্ব শর্তের উপর নির্ভরশীল। একটি হোল—শৈশবকালীন মৃত্যুর হার বা শিশু মৃত্যুর হার কমাতে হবে এবং দ্বিতীয়টি হোলো—সুস্বাস্থ্যের এবং ছোট পরিবারের আকৃতির প্রতি সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেতে হবে। বাস্তবিকভাবে শৈশবকালীন মৃত্যুর হার এবং শিশুমৃত্যুর হার নির্ভর করে সাধারণভাবে জীবনযাত্রার মানের উপর এবং সুনির্দিষ্টভাবে সাধারণ সুস্বাস্থ্য, শিশু স্বাস্থ্য, এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির গুণগত মানের উপর। মূলত এটা হোল কোন সমাজব্যবস্থায় পরিবার কতখানি শিশু স্বাস্থ্যের রক্ষণাবেক্ষণ এর জন্য সুবিধা দিচ্ছে এবং শিশু অসুস্থ হলে তার প্রতি পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গী কি রুপ এবং শিশুর স্বাস্থ্যের প্রতি কতখানি যত্নবান। এগুলির উপর নির্ভর করছে শিশু মৃত্যুর হার কমবে না বাড়বে। স্বাস্থ্যের সুযোগসুবিধা ভোগ নির্ভর করে সাধারণতঃ তিনটি বিষয়ের উপরঃ (ক)

Locational সুযোগ সুবিধা ; (খ) অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা এবং (গ) সামাজিক সুযোগ সুবিধা। Locational সুযোগ সুবিধে না থাকলে গরীব বা নিম্নআয়ের মানুষের স্বাস্থ্যের প্রতি সুযোগ-ব্যয় (Opportunity Cost) অনেক বেশী বাড়িয়ে দেয়। কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্র যদি গ্রামের থেকে অনেক দূরবর্ত্তী শহরে থাকে তাহলে কোন গরীব কৃষককে স্বাস্থ্যের সুযোগ-সুবিধা পেতে গেলে একদিনের আয় পরিত্যাগ করে শহরে আসতে হয়। সেইজন্য স্বাস্থ্যের খুব বেশী খারাপ না হলে বা খুব বেশী প্রয়োজন না হলে দূরবর্ত্তী শহরের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সে যেতে চায় না। আমরা সারণী-২ থেকে দেখতে

(সারণী-২) TABLE-2: DISTRIBUTION OF BEDS
UNDER HEALTH CARE SYSTEM

States	No of Beds per Lakh Population 1989	Per Cent of Beds in Rural Area in 1989	No of Beds per Lakh Population in Rural Area 1989
1	2	3	4
Andhra	59	10.59	9
Assam	60	23.56	16
Bihar	34	8.20	3
Goa	257	24.20	105
Gujarat	129	11.06	22
Haryana	50	7.32	5
Jammu and Kashmir	107	4.30	na
Karnataka	80	9.82	12
Kerala	254	56.12	193
Madhya Pradesh	36	9.41	4
Maharashtra	130	9.98	21
Orissa	43	16.28	8
Punjab	115	41.48	68
Rajasthan	51	8.55	6
Tamil Nadu	86	21.05	28
Uttar Pradesh	40	12.44	6
West Bengal	85	15.04	18
All India	77	17.75	18

* *Source* : Estimated from CMIE, *Basic Statistics Relating to Indian Economy, Vol 2, September 1991.*

পাই যে প্রায় অধিকাংশ রাজ্যের 4 ভাগের 3 ভাগ হসপিটাল Bed শহরের হাসপাতালে অবস্থিত এবং বড় ও ভাল স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি দূরবর্তী শহরাঞ্চলে অবস্থিত। কেবলমাত্র কেরালা এবং গোয়া রাজ্য দুইটি ক্ষেত্রে দেখতে পাই যে প্রতি লক্ষ জনসংখ্যা পিছু হসপিটাল Bed এর সংখ্যা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বেশী এবং দুইটি রাজ্যের সুযোগ সুবিধে এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় একই। ফলে এই দুইটি রাজ্যে শিশু মৃত্যুর হারও একই এবং অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বেশ কম। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা উল্লেখ করার কোন প্রয়োজনই নেই। আমরা জানি যে কোন সুস্থ-সমাজব্যবস্থায় বিনামূল্যে বা সরকারী আর্থিক সহায়তায় স্বাস্থ্যের সুযোগ-সুবিধা অপরিহার্য হয়ে থাকে। ভারতের মতো দেশে সামাজিক সুযোগ সুবিধা এখন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে বা হওয়া

উচিত ছিল।

এটা অবশ্যই সত্য যে স্বাস্থ্য ও পরিবারের আয়তন (আকৃতি) সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে শিক্ষার পরিমান ও হার এবং কতখানি বেশী নারীদের শিক্ষিত করা হয়েছে তার উপর। বিভিন্ন উন্নতদেশের তথ্য থেকে জানা গিয়েছে যে যেখানে নারীদের শিক্ষার পরিমান ও হার বৃদ্ধি পেয়েছে শিশুর জন্মের হার সেখানে কমে গিয়েছে এবং শিশু মৃত্যুর হারও সেখানে কমে গিয়েছে। মেয়েদের বা নারীদের বেশী বেশী করে শিক্ষিত করে তুললে কেবলমাত্র যে স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং পরিবারের আয়তন ছোট হয় তাই নয় নারীর পরিবারের মধ্যে এবং সমাজের মধ্যে মর্যাদাও বৃদ্ধি পায়। আমরা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে দুইটি রাজ্যে ইহা উল্লেখযোগ্যভাবে দেখতে পাই। এই দুইটি রাজ্যেই স্বাস্থ্যের সুযোগ -সুবিধা এবং মেয়েদের শিক্ষার হার ও সার্বিক শিক্ষার পরিমাণ, অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশী এবং ফলে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় কম।

এই প্রকার সামাজিক সুযোগ-সুবিধার পরিবর্তন প্রথম রুপায়ণ করা হয়েছিল সামন্ত রাজ্য Trarancore এবং Cochin এ উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে এবং পরবর্তীকালে কেরোলা রাজ্য হিসাবে ঘেষিত হওয়ার পর স্বাস্থ্য ও সার্বিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে শুরু করলো। স্বাস্থ্যের সুযোগ বৃদ্ধি ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে Bed বন্টন এর ব্যবস্থা কেরোলা এবং গোয়া রাজ্য দুইটিতে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় আশাপ্রদ। এই দুইটি রাজ্যের গ্রামগুলিতে পরীক্ষামূলক ভাবে দেখা গেছে যে শিশু মৃত্যুর হার কম, মায়েরা শিশুর প্রতি অনেক বেশী যত্নবতী। স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দেয় বেশী এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বা হাসপাতালের সুযোগ সুবিধা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশী। ১৯৮৯ সালের একটি 'সার্বিক রোগবিশিষ্ট অনাক্রম্য' এর মূল্যায়ণের রিপোর্টি (An evaluation of Universal immunisation Programm under Tokia in 1989) থেকে জানা যায় যে গর্ভবতী মায়ের সংখ্যা/শিশু রোগ অনাক্রম্য এর অনুপাত কেরোলা এবং গোয়া রাজ্যে সবচেয়ে বেশী।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সামাজিক সুযোগ-সুবিধা জনস্বাস্থ্য প্রসারের ক্ষেত্রে কেরোলা রাজ্য বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল বা করে চলেছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে কেরোলা রাজ্যে জনগনের মধ্যে স্বাস্থ্যের সুযোগ ও প্রসারের প্রবণতা মাথা চাড়া দিতে শুরু করেছিল। এর কারণ হোল শহরাঞ্চলগুলিতে যখন স্বাস্থ্য ও শিক্ষার প্রভাব বিস্তার করতে লাভ করে, ঠিক সেই সময় অর্থনৈতিক দিক থেকে অনুন্নত এবং অস্পৃশ্য উপাজাতি সম্প্রদায় শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য জোর কদমে আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলনের সাফল্য অবশ্যই তারা পেয়েছে। সামাজিক এবং মানসিক অবস্থার একটা ইতিবাচক উন্নতি কেবলমাত্র শিক্ষা প্রসারের আলোকে সম্ভব হয়। ভারতের দুইটি রাজ্যে কেরোলা এবং গোয়ার ক্ষেত্রে নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য এই ইতিবাচক ভূমিকা স্বাস্থ্যের প্রসার ও উন্নতি, শিশু মৃত্যুর হ্রাস এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে গেছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের প্রসারের সঙ্গে জন্মের হারের এই ইতিবাচক সম্পর্কটি পরিসংখ্যার একটি বিশেষ তত্ত্ব দিয়ে দেখাতে পারি। এই তত্ত্বগত পদ্ধতি হোল-"Test of Significance"। খুব সহজভাবে এটা দেখানো যায় যে, নারী শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে স্বাস্থ্যের প্রতি সচেতনতার মধ্যে দিয়ে কতখানি জন্মের হার কমে যেতে পারে। Regression Relationship বের করা হয়েছে (estimated) নারী শিক্ষার হার, ও শিশু মৃত্যু হার এবং জন্ম হারের সহিত। এ ছাড়াও এখানে মোট উর্ব্বরতার হারের জন্মের হারের পরিবর্তে ধরা হয়েছে এবং এর কারণ হোল বয়স বন্টন এর ক্ষেত্রে উর্ব্বরতার হার বিশেষভাবে 'Standarised'। এইজন্য আমরা দুই ধরণের পরিসংখ্যান নিয়েছি। একটি রাজ্য স্তরে ও আরেকটি জেলা স্তরে।

জেলা স্তরে পরিসংখ্যান নেওয়া ক্ষেত্রে শিশুমৃত্যুর হার, মোট উর্ব্বরতার হার এবং শিক্ষার হারের ক্ষেত্রে সম্পর্ক বের করার জন্য 1981 সালের পর আর পরিসংখ্যান পাওয়া যায় নি (Registrer General, 1989)। যাই হোক Explanatory variable এর উপস্থিতিতে "High degree of Multicominiorrity" থাকার জন্য রাজ্য স্তরে খুব একটা তাৎপর্য্যপূর্ণ ফলাফল পাওয়া যায়নি। এই Regression Relationship টির মাধ্যমে পরীক্ষামুলক ভাবে যেটি লক্ষ্য করা যায়া, তা হোল নারী শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের বিবাহের বয়স বেড়ে যাবে এবং শিশু মৃত্যুর হার কমে যাচ্ছে এবং তার ফলে কেবলমাত্র উর্ব্বরতার হারই কমছে, তাই নয় জন্মের হারও কমে যাচ্ছে। আমরা তুলনামূলক "Regression Relationship" বের করেও (estimate) দেখতে পাচ্ছি যে উপরোক্ত সম্পর্ক প্রায় বর্তমান। পরিসংখ্যান এর "Test of Singnificancy" এর প্রয়োগটি এই অধ্যায়ের পরিশিষ্টে দেখানো হয়েছে।

উপসংহার ঃ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রনের পরিপ্রেক্ষিতে কোন যুক্তিসংগত পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ন করতে গলে যে সকল সমস্যাগুলির প্রথমেই সমাধান করতে হয়, সেগুলি হোল-প্রকৃত আয় বৃদ্ধি করা, সার্বিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা বিশেষ করে নারী শিক্ষা প্রতিটি দরিদ্রমানুষকে নিম্নতম পুষ্টিজাত দ্রব্য ভোগ প্রদানে নিশ্চিত করা এবং প্রত্যেকের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান হওয়া। যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে—তাতেকরে স্বাস্থ্য দপ্তর পরিচালিত 'গরিবার পরিকল্পনা' বিভাগ কোন ভাবেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে এক শতাংশে নামাতে সক্ষম হবে না—এটা নিশ্চিত ভাবে বলা যায়। নিশ্চিত ভাবে ধরে নেওয়ার কারণ হোল-যে পদ্ধতিতে 'পরিবার পরিকল্পনা' বিভাগ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালাচ্ছে সেই পদ্ধতিটাই ত্রুটিপূর্ণ। ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যতটুকু কমেছে তার মূল কারণ হোল শহ্রাঞ্চলের বেশ কিছুটা প্রসার হয়েছে, মেয়েদের বিয়ের বয়স সামান্য কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার প্রসার ও স্বাস্থ্যের কিছুটা সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এতদিন পর্যন্ত আমরা প্রতিটি পরিকল্পনায় কেবলমাত্র দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বেশী করেছি এবং এটা করা হয়েছে সামাজিক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হ্রাস করে। কিন্তু এটা কোন ভাবেই ঠিক হয়নি। দ্রব্য উৎপাদন এর ক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল না পাওয়ার মূল কারণ হোল উৎপাদনের উপকরণ বা উপাদান গুলির উৎপাদনি শক্তি বৃদ্ধি পায়নি এবং অতিরিক্তভাবে অপচয় বৃদ্ধি পেয়েছে। উৎপাদন শক্তির হ্রাস এবং অতিরিক্ত হারে অপচয় বৃদ্ধির মূল কারণ হোল মানব সমাজের অপূর্ণ বিকাশ। মানব সম্পদের পূর্ণ বিকাশ নির্ভর করে সামাজিক ক্ষেত্রের উন্নতির উপর। মানুষের জীবনযাত্রার মান খুব বেশী নির্ভর করে এই সামাজিক ক্ষেত্রের উন্নতির উপর। এরজন্য ভারতের পরিকল্পনার প্রতিষ্ঠানগত কাঠামো পরিবর্তন করা বিশেষ প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠানগত কাঠামো পরিবর্তনের ব্যাপারটি হোল পরিকল্পনার বিকেন্দ্রীকরণ। সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নতি/ পরিকল্পনার বিকেন্দ্রীকরণ ছাড়া সম্ভব নয়। এই পরিস্থিতিতে ভারতের বর্তমান পরিকল্পনার কৌশল যখন কেবল গরীব মানুষের কাজের অধিকারকে সুনিশ্চিত করার বদলে স্বল্প মজুরী, বেকারী, শ্রমের উদ্বৃত্ত মূল্য নিয়ে অতি ধনী ব্যক্তিদের (বনিক শ্রেণী, জমিদার শ্রেমী ও অতিউচ্চ ধনী শ্রেণী) অবাধ আয় ভোগের সুযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা। ক্রমাগত ভোগ্য পণ্যের (বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্য, ঔষধ, বস্ত্র ইত্যাদি) মূল্যবৃদ্ধি ও গরীব মানুষের অর্থনৈতিক দুঃখ-দুর্দশা অব্যাহত রেখে প্রয়োগ করে চলে, দারিদ্র রেখার নীচে বসবাসকারী মানুষের কাছে তখন পরিবার পরিকল্পনার, কর্মসূচী তাদের সম্পত্তির একমাত্র উৎসের' ওপর আক্রমন বলে মনে করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করার 'স্বাভাবিক' বুদ্ধিদীপ্ত সামাজিক ব্যবস্থা চালু করার প্রধান উপায় হবে, যত ব্যাপক আকারে সম্ভব' মানুষের সৃজনশীল শ্রম বিনিয়োগের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা। মানুষের জীবনযাত্রার মান স্বল্প আয়ের স্তরে সম্ভব যদি দেখা যায় সামাজিক ক্ষেত্রের উন্নতি লাভ করেছে।

জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সঙ্গে মানব-সমাজের পূর্ণ বিকাশ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মানব সমাজের পূর্ণ বিকাশের সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যা যে ওতপ্রোত যোগাযোগ করেছে তা বুঝতে গেলে জীবনমান উন্নয়নের উপাদানসমূহ ও তাদের কার্যকারিতা সম্পর্কে ধারনা পরিস্কার করা বিশেষ প্রয়োজন। পরিশেষে একথা বলা যায় যে, জীবনমানের উপাদানগুলি হোল বৈষয়িক, সাংস্কৃতিক ও স্বাস্থ্যগত। এগুলি জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রত্যেক মানুষের জীবনমানকে প্রভাবিত করে। বৈষয়িক উপাদান হোল—জীবিকা, খাদ্য এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা। সাংস্কৃতিক উপাদান হোল—শিক্ষার সুযোগ ও মানুষের পূর্ণ বিকাশের জন্য পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ও মানসিক চাহিদা, সর্বোপরি স্বাস্থ্যগত উপাদান হোল, পুষ্টিকর খাদ্য ও উপযুক্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা। এই সব উপাদানগুলি স্বল্প আয়ের স্তরে থেকেও মানুষের সামাজিক জীবন সুনিশ্চিত করে। মানব-সম্পদ বিকাশের ভিত্তি নির্মান করা যেতে পারে। এই দায়িত্ব সকল সমাজের ও রাষ্ট্রের পালন করা উচিত। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য মানব সমাজের বিকাশ গুরুত্বপূর্ণ পালন করে—অন্য কোন বিকল্প পথও নেই।

CHAPTER—APPENDIX [অধ্যায়—পরিশিষ্ট]

List of Variables :

1. BR = Crude Birth Rate
2. TFR (un–adj) = Total Fertility Rate unadjusted
3. TFR (adj) = Total Fertility Rate-adjusted
4. PMF = Proportion of Married Females
5. CMR = Child Mortality Rate
6. FLR = Female Literacy Rate
7. CP = Couples Protected
8. IMR = Infant Mortality

Regressions with State Data

(1) $BR = 50.38 + 0.0899\,(IMR) - 1.585\,(AM) + 0.045\,(CP)$
(2.4159) (−2.422) (0.6261)

$R2 = 0.786$

(2) $BR = 34.23 + 0.0436\,(IMR) + 0.00358\,(CP) - 0.2156\,(FLR)$
(0.7237) (0.0510) (−2.0322)

$R2 = 0.760$

Spearman Rank Correlation Matrix (State-wise Data)

	PMF	FLR	CMR	BR	TFR
PMF	1.00	−0.78 ***	0.75 ***	0.57 *	0.66 *
FLR		1.00	−0.60*	−0.72 **	−0.67 **
CMR			1.00	0.59	0.76 ***

Significance Level : * 5%, ** 1%, *** .01%

Regression Results with District Data

Dependent	Constant	PMF	CMR	FLR	R2	F-Value
BR	35.928 (32.185)	–0.0222 (–2.029)	0.349 (5.9086)	–10.3891 (–5.8041)	0.31	58.66
TFR (Unadj)	2.4185 (10.13)	0.0080 (3.3865)	0.0108 (8.4414)	–1.0567 (–2.7269)	0.44	104.83
TFR (adj)	5.0087 (19,946)	–0.00302 (–1.2274)	0.00695 (5.2303)	–2.4835 (–6.1679)	0.32	61.99

Figures in Brackets show t-values

Note : TFR (adj) for sample registration estimates may under - or over - estimate the rates in some cases. The question with TFR (unadj) provides better results.

Population, Environment and Resources

Dr. Jyoti Prakash Ghosh

SUMMARY

Proper development of human resources requires proper utilisation of natural resources and this in turn necessiates proper management of the Environment. Environment of our concern is the **Biosphere** where the living and the non-living components of the Environment closely interact among themselves, and through a close harmonic association constitute the global ecosystem which , in turn, is composed of a large number of smaller ecosystems such as ecosystem of a forest, that of a mountain, a desert, a plain-land etc. The specific feature of each ecosystem is that there is a harmonic balance between the components of the system, if any component of the system is changed or removed, the balance is disturbed,the harmony is lost, This due to the hazardous aspects of the Environment lies mainly in such disturbance of balance in the ecosystem.

At the primitive stage of human civilisation, population size of our globe was very small compared to the huge, almost inexhaustible resource of natural resources. Moreover ecological balance was not lost as man could gradually learn to develop a friendly relationship with the nature around shaking off his primary helplessness and fear to nature. As soon as the man alienated himself from the nature by being changed from forest-roamer to community dweller, problems in the Environment began to develop but the problems were not acute until there was the industrial revoluation. Since this revolution man particularly in the industrially developed countries, has been exploiting the Environment mercilessly through the wide application of science and technology. Today, the attitude of the man towards nature is that of a master towards his slave, such an attitude is the main roote of Environmental hazard to day.

Rapid growth and large size of Population do, naturally, exert a tremendous pressure on the Environment , increasing demand of an over increasing population for shelter, food, clothing etc. the essential element for living, is posing a great problem to the Environment no doubt. But this is not the prime cause of Environmental hazards. Accoding to U. Thant, the ex-secretary General of the U.N.O., lack of proper planning in respect of population growth, large urbanisation and application of new technology is the main factor responsible for acute environmental hazards.

So far as the environmental problem at global level is concerned, the consumerism (or consumptionism) of the people in rich countries is much

more responsible than the rapid growth rate of population in the third world countries. For example only 23 per cent of world population living in the developed countries consume 75-80 percent of the natural resources of the world, where as the remaining 77 percent of world population living mostly in developing and under developed countries share only 20-25 percent of the natural resuurce, of the globe, 23% of the amount of carbondioxide emitted in the atmoshpere is contributed by the U.S.A. representing 5-6% of world population. Whereas only 3% of such carbondioxide contributed by India, representing 16-17% of world population.

However, so far as the environmental hazards at the national level is concerned, rapid population growth is one of the prime factors responsible for such hazard. But along with adoption of proper developmental planning including population planning, a wide environmental consciousness is to be aroused among the people. In this chapter different aspect, of environmental hazards viz, environmental pollution, conservation of natural environment and depletion of natural resources have been highlighted, The prime causes behind the problems have been tried to be traced out with a view to finding out possible remedial measures, if any, which may be adopted in this regard. Role of the people in proper maintenance of the Environment and of the ecological balance through judicious use of natural resures, has been particulaly emphasised upon.

জনসংখ্যা, পরিবেশ ও সম্পদ

ডঃ জ্যোতিপ্রকাশ ঘোষ

পরিবেশ

পরিবেশ শব্দটি উচ্চারিত হলেই দুই ধরণের পরিবেশের কথা আমাদের মনে হয়– প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সামাজিক পরিবেশ। যদিও উভয় ধরণের পরিবেশের মধ্যে একটা নিবিড় এবং অচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান তবুও আমাদের আলোচনায় মূলতঃ প্রাকৃতিক পরিবেশই থাকবে।

পরিবেশ কথাটি অত্যন্ত, ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মহাবিশ্বজাগতিক সবকিছু নিয়েই হল বিশাল পরিবেশ। আমরা অবশ্য সেই পরিবেশের আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ থাকব যেখানে প্রানের অস্তিত্ব আছে অর্থাৎ জীব-মণ্ডলের (Biosphere) এর পরিবেশে। বিশেষজ্ঞগনের মতে এই মণ্ডলের ব্যাপ্তি ঊর্ধ্বদেশে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে 10-15 কিলোমিটার পর্যন্ত অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলের নিম্নদেশ –ঘনমণ্ডলে (troposphere) এর বিস্তৃতি, সমুদ্রদেশে জলস্তরের 8-10 কিলোমিটার গভীর অঞ্চল পর্যন্ত এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে 2-3 কি. মি. গভীরতার মৃত্তিকাস্তর পর্যন্ত। এই অঞ্চল সীমানাতে সমগ্র জীবকূল – উদ্ভিদ, প্রানি এবং অনুবীক্ষনীয় জীবসমূহের আবাসন সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ এইঅঞ্চলেই জীবকূল পরস্পরের সঙ্গে এবং পরিবেশের জল, বায়ু, মৃত্তিকার সঙ্গে নিয়ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় রত। পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাব আনুমানিক 300-350 কোটি বছর পূর্ব থেকে এবং তখন থেকেই জৈব এবং অজৈব জগতের নিজেদের মধ্যে এবংপারস্পরিকএই ধরণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া (ভূ-রাসায়নিক প্রক্রিয়া বা geochemical process) অবিরত চলেছে এবং যতদিন জীবকূল ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয় ততদিন চলতেই থাকবে।

জল, বায়ু, মৃত্তিকার সঙ্গে ঐকতানে গ্রথিত জীবকূল গড়ে তুলেছে বিশাল পার্থিব বাস্তুতন্ত্র (Global ecosystem) যেটি আবার কল্পিত হতে পারে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাস্তুতন্ত্রের সমষ্টিরূপে। ক্ষুদ্রতর এই ধরনের বাস্তুতন্ত্রের উদাহরণ হল বনভুমির বাস্তুতন্ত্র, মরুভুমির, সমতলভুমির, পার্বত্যভুমির বাস্তুতন্ত্র ইত্যাদি। প্রতিটি বাস্তুতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হল এর উপাদানগুলির মধ্যে ছন্দোময় একটি ভারসাম্য বিরাজমান-কোনও একটি উপাদান পরিবর্তিত বা অপসারিত হলেই বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বিনষ্ট হয় – ছন্দ যায় হারিয়ে। পরিবেশে বিপর্যয়ের মূল কারণটি বাস্তুতন্ত্রের এই ছন্দোময় ভারসাম্য হারিয়ে যাওয়ার মধ্যেই নিহিত!

জনসংখ্যা ও পরিবেশ ঃ

প্রকৃতিতে মানব আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে জীবকূলের সঙ্গে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে একটি মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হল। কারন, পরিবেশের সঙ্গে মানুষের ঘাত প্রতিঘাতের এই ধরনটি মানবসভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে অতি দ্রুত ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়েছে। মানবসভ্যতার ঊষালগ্নে এই ধরনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হয়েছে স্বল্পসংখ্যক দুর্বল অসহায় মানুষের সঙ্গে বিশাল অকল্পনীয় প্রকৃতির সঙ্গে। সৃষ্টির সেই আদিলগ্নে বিষ্ময় বিপন্ন মানুষ তার পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে ছিল ভয়-সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে। এই পর্বে প্রকৃতি যেন প্রভু এবং মানুষ যেন তার দাস। ধীরে ধীরে প্রাথমিক জড়তা কাটিয়ে উঠে মানুষ তার অস্তিত্ব রক্ষার উপাদানও খুঁজে পেয়েছে ঐ প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকেই. বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি ও ঘটনা সম্পর্কে ভীতসন্ত্রস্ত ধারনা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের কিছুটা সভ্যতাও গড়ে উঠেছে। কঠোর জীবনসংগ্রামে যে নিরলস শ্রম তাকে দিতে হয়েছে তার মধ্যেদিয়েই মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি জাগ্রত

হয়েছে এবং ধীরে ধীরে একক শক্তি থেকে সংঘশক্তিকে কাজে লাগিয়ে প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে আত্মরক্ষা করতে এবং ক্রমশ ঐ পরিবেশের সঙ্গে যুঝবার ক্ষমতা অর্জন করেছে।

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অরণ্যচারী গুহামানব থেকে জনপদবাসী মানবগোষ্ঠী গড়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি থেকে মানুষ ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করেছে। পরবর্তীকালে নগর বন্দর গড়ে তুলে মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। প্রকৃতি থেকে মানুষ যখনই বিচ্ছিন্ন হয়েছে তখনই প্রকৃতির সঙ্গে তার ঘাত-প্রতিঘাত তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে।

শিল্পবিপ্লবের পর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপক প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষ প্রকৃতিকে নিরন্তর শোষন করে চলেছে – বিশেষ করে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় প্রকৃতির এই শোষন তীব্র মাত্রায় চলেছে। এখন মানুষ যেন প্রভু এবং প্রকৃতি যেন তার দাস। **মানুষের এই বিজয়ী এবং লুণ্ঠন কারীর মনোভাব পরিবেশ সংকটের মূলে বর্তমান।**

মানবসভ্যতার আদিলগ্নে স্বল্পসংখ্যক মানুষের স্বল্পচাহিদার তুলনায় প্রাকৃতিক সম্পদভাণ্ডার ছিলো সুবিশাল, অফুরন্ত। ধীরে ধীরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে – প্রথমদিকে খুবই নিম্নহারে, ক্রমশ এই হার উচ্চথেকে উচ্চতর হয়েছে – প্রাকৃতিক সম্পদভাণ্ডারেও ক্রমাগত চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কিভাবে বিভিন্ন সময়ে বেড়েছে সে সম্পর্কে কিছুটা ধারনা **সারনী-১** থেকে পাওয়া যাবে।

✪ সারনী ১ বিভিন্ন সময়কালে পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রকৃতি

সময়কাল		জনসংখ্যাবৃদ্ধি (কোটিতে)		জনসংখ্যা দ্বিগুনিত (মোটামুটি ভাবে) হবার সময়কাল (বৎসর)
খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ	7000-4500	1 কোটি থেকে	2 কোটি	2500
	4500-2500	2 কোটি থেকে	4 কোটি	2000
	2500-1000	4 কোটি থেকে	8 কোটি	1500
	1000-0	8 কোটি থেকে	16 কোটি	1000
খ্রীষ্টাব্দ	0-900	16 কোটি থেকে	32 কোটি	900
খ্রীষ্টাব্দ	900-1700	32 কোটি থেকে	60 কোটি	800
খ্রীষ্টাব্দ	1700-1850	60 কোটি থেকে	120 কোটি	150
খ্রীষ্টাব্দ	1850-1950	120 কোটি থেকে	250 কোটি	100
খ্রীষ্টাব্দ	1950-1990	250 কোটি থেকে	500 কোটি	40

সারনী-১ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রামাগত বেড়ে চলায় পার্থিব সম্পদভাণ্ডারে ক্রমাগত চাপ বেড়ে চলেছে। বর্তমানে প্রতিদিন পৃথিবীতে প্রায় ৩ লক্ষ হিসাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ মুহূর্তে পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রায় 640 কাটিতে গিয়ে দাঁড়াবে বলে অনুমান করা হচ্ছে এবং 2025 সাল নাগাদ এই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে প্রায় 909 কোটিতে। ক্রমবর্ধমান বিপুল সংখ্যক জনতার বাসস্থান, খাদ্য, বস্ত্র প্রভৃতি মৌলিক চাহিদার যোগান দিতে একদিকে যেমন প্রাকৃতিক সম্পদ ভাণ্ডারে প্রচণ্ড চাপ পড়ে এই সম্পদভণ্ডারকে রিক্ত করে তুলবার সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে অন্যদিকে তেমনি বিপুল জনতার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে পরিবেশ দুষনের সমস্যা সৃষ্টি করেছে।

প্রশ্ন হল পরিবেশে এই সংকটের জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধিই কি একমাত্র কারন?

এই প্রশ্নের কিছুটা উত্তর মিলতে পারে রাষ্ট্রসংঘের প্রাক্তন মহাসচিব উ থান্টের বক্তব্যের মধ্যে

দিয়ে। পরিবেশ সমস্যার প্রতি বিশেষ মনোযোগী উ থান্টের মতে মনুষ্য অধ্যুষিত পরিবেশের (human environment) অবস্থার অবনতি ঘটেছে মূলতঃ তিনটি কারণে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি, ক্রমবর্দ্ধমান নগরায়ন এবং নয়া প্রযুক্তির প্রয়োগ যার জন্য বাসস্থান, খাদ্য এবং প্রাকৃতিক সম্পদের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসবের জন্যও পরিবেশ মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হত না যদি সবকিছুই সঠিক পরিকল্পনা মাফিক করা যেত। কিন্তু, মানুষের বাসস্থান সমস্যা মেটাবার প্রয়াস। শিল্পায়ন ও নগরায়ন, প্রযুক্তির প্রয়োগ, ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার এসব পরিকল্পনা মাফিক করা উচিত ছিলো কিন্তু তার ধারকাছ দিয়েও হয়নি এবং তার ফলেই পরিবেশ-সমস্যা এত প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে।

অতি-মুনাফার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রযুক্তির ব্যাপক প্রয়োগ এবং শিল্পোন্নত দেশগুলিতে প্রাকৃতিক সম্পদের অপরিমেয় ব্যবহার পরিবেশ সমস্যার জন্য সর্বাপেক্ষা বেশী দায়ী । ব্যক্তি-মালিকানার ব্যবস্থাপনায় প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারে অপচয় অনিবার্য এবং পরিবেশ দূষনের সম্ভাবনাও বেশী। কারণ দূষন-নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা এবং বর্জ্য পদার্থের পুনর্ব্যবহারের ব্যবস্থা সমন্বিত পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তির প্রয়াস অধিকাংশ ব্যক্তি-মালিকের অনীহার কারণ। যেহেতু এই ধরনের ব্যবস্থার জন্য অতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োগের ঝুঁকি আছে।

শিল্পোন্নত দেশগুলিতে ভোগবাদ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির জনসংখ্যা বৃদ্ধি অপেক্ষা পরিবেশ সমস্যা সৃষ্টির জন্য যে অধিকতর দায়ী একটি মাত্র উদাহরণেই তা স্বচ্ছ ভাবেই বোধগম্য হবে।

বিশ্বের মাত্র পাঁচ শতাংশ মানুষের দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সারা পৃথিবীর মোট জ্বালানীর ২৫ শতাংশ ভোগ করে একা, তুলনায় বিশ্বের 17 শতাংশ জনসংখ্যা বিশিষ্ট ভারত ভোগ করে মাত্র ৩ শতাংশ জ্বালানী। অপরদিকে সারা পৃথিবীতে যত কার্বনডাই অক্সাইড গ্যাস বায়ুমণ্ডলে পরিত্যক্ত হয় তার 23 শতাংশই ছাড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তুলনায় ভারত ছাড়ে মাত্র ৩ শতাংশ।

তাহলে পরিবেশ সমস্যার জন্য কোনটি অধিকতর দায়ী? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধনী বিলাসী জনগণের অপরিমেয় সম্পদ ভোগ লিপ্সা না কি ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি।

প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের মাত্র শতকরা 23 ভাগ মানুষ — মূলতঃ ধনী দেশগুলির নাগরিক সারা বিশ্বের প্রাকৃতিক সম্পদের শতকরা প্রায় 75 থেকে 80 ভাগ ভোগ করছে। তুলনায় বাকী 77 শতাংশ মানুষ (মূলতঃ অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের মানুষ) পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদের মাত্র 20-25 শতাংশ ভোগ করছে। অপরপক্ষে শিল্পোন্নত দেশগুলি পৃথিবীর 40 শতাংশ পরিবেশ দূষনের জন্য দায়ী। অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের দায়ী মাত্র 20 শতাংশ পরিবেশ দূষনের জন্য।

সুতরাং জনসংখ্যা-বৃদ্ধি পরিবেশ সংকটের অন্যতম কারণ হলেও মূল কারন নয়। অবশ্য বিশেষ কোনও দেশ-কালের পরিস্থিতিতে জন-বিস্ফোরণ সেই দেশের পরিবেশ সংকটের মূল কারন হলেও হতে পারে, সামগ্রিক পার্থিব পরিবেশের প্রেক্ষিতে এ উক্তি প্রযোজ্য নয়।

পরিবেশ সংকটের প্রকৃতি ঃ

পরিবেশে যে সংকটের সৃষ্টি হয়েছে তার শতকরা 50 ভাগই সৃষ্ট হয়েছে গত পাঁচ দশকে অর্থাৎ প্রযুক্তির ব্যাপক, অনেকক্ষেত্রে অপরিকল্পিত প্রয়োগের ফলে এবং এই প্রয়োগ পদ্ধতির বেঠিক ধরনের জন্য। দিকে দিকে জল, বাতাস, মৃত্তিকা দুষিত হয়ে পড়ছে, তেজস্ক্রিয়তা দূষনের কিছু ঘটনাও (যেমন প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের—চেরনোবিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের-থ্রিমাইল আইল্যাণ্ডের দুর্ঘটনা) আমাদের শঙ্কিত করে তুলছে। বাতাসে কার্বনডাইঅক্সাইড এবং অন্যান্য কিছু গ্যাসের পরিমান বৃদ্ধির ফলে ভু-তাপমাত্রা বৃদ্ধির আশংকা এবং পরিনামে মেরু অঞ্চলের সঞ্চিত

বরফ গলে সমুদ্র জলতল স্ফীত হয়ে পৃথিবীর বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, বায়ুমণ্ডলের ওজন স্তর ধীরে ধীরে পাতলা হয়ে আসায় সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি বায়ুস্তর ভেদ করে পৃথিবী পৃষ্ঠে আসার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, যার ফলে বহু অঞ্চলে ব্যাপক ভাবে চামড়ার ক্যান্সারে অনেকে আক্রান্ত হতে পারেন বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে। অপরদিকে পৃথিবীর খনিজ সম্পদ দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে আসছে। মৃত্তিকার উর্বরতা অনেক স্থানেই কমে আসছে, বনভূমি দ্রুত ধ্বংসস্তুপ হতে থাকায় মরুবিস্তারের সম্ভাবনা বাড়ছে। ভূমিক্ষয় দ্রুততর হচ্ছে, বৃষ্টিপাত কমে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে। পৃথিবীর জীবাষ্ম জ্বালানী ভাণ্ডার দ্রুত নিঃশেষের পথে, ফলে জ্বালানী সংকট তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে, উদ্ভিদ ও প্রানি জগতের অজস্র প্রজাতি বিলুপ্ত বা বিলুপ্তির সম্ভাবনার ফলে পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য নিদারুন ভাবে বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে।

পরিবেশের এই সমস্যাগুলিকে প্রধানত তিনটি শ্রেনীতে বির্ন্যস্ত করা যেতে পারে, যথা প্রাকৃতিক সম্পদ- সংরক্ষন, সম্পদরাজির বিলুপ্তির সমস্যা এবং পরিবেশ-দূষন। এই সমস্যাগুলির প্রকৃত কারন এবং সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে কিছুটা বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন।

পরিবেশ দূষণ ঃ

একসময়ে পরিবেশ-দূষণ বলতে প্রাকৃতিক পরিবেশের স্বাভাবিক উপাদানগুলির অনুপাতিক পরিমানের হ্রাস না বৃদ্ধিকেই বোঝানো হত। বর্তমানে কিন্তু এই সংখ্যা সীমিত হয়ে পড়েছে কারন পরিবেশের স্বাভাবিক উপাদানের সঙ্গে অনেক কৃত্রিম বস্তু যুক্ত হয়ে পড়েছে এবং অনেক সময় এসব বস্তুর আনুপাতিক পরিমান একেবারে নগন্য নয়। তাই পরিবেশ-দূষণ বলতে এখন সাধারণত বোঝানো হয় পরিবেশে এমন কিছু যুক্ত হওয়া যার ফলাফল ক্ষতিকারক এবং সুদুর প্রসারী হতে পারে।

বিভিন্ন প্রকার পরিবেশ-দূষণের প্রধান কারণ কয়েকটি হলঃ

বায়ুদূষণ, জলদূষণ, মৃত্তিকাদূষণ, শব্দ দূষণ অন্য ধরনের দূষণেরও কারণ হয়ে উঠতে পারে যেমন কোনও স্থানে বায়ুদূষণ সেখানের জলদূষণেরও কারন হয়ে দেখা দিতে পারে।

বিভিন্ন প্রকারের পরিবেশ-দূষণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে উপস্থাপিত করা হল।

বায়ু-দূষণ ঃ

বিভিন্ন কারনে পৃথিবীর অনেক স্থানেই বাতাস আজ দূষিত হয়ে পড়ছে। ওই দূষণের মাত্রা কেমন সে সম্পর্কে কিছুটা ধারনা নীচের তথ্য থেকে পাওয়া যেতে পারে; "বর্তমানে প্রতিবছর বাতাসে গড়ে 20 কোটি টনের উপর কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস, প্রায় 14.6 কোটি টন সালফার ডাইঅক্সাইড, 5 কোটি টনের মতো বিভিন্ন হাইড্রোকার্বন, 5.3 কোটি টন নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড, 200-250 টন ধূলিকনা এবং 12 কোটি টনের মতো ছাই পরিত্যক্ত হচ্ছে। গত 40 বছরে বাতাসে কার্বনডাইঅক্সাইডের আয়তনিক পরিমান প্রায় 10-12 ভাগ বেড়ে গেছে এবং গত দশ বছরেই বাতাসে ভাসমান কঠিন কনার পরিমান বেড়ে গেছে শতকরা প্রায় 12 ভাগ।"

এর ফলাফল মারাত্মক এবং সুদূরপ্রসারী হয়ে উঠতে পারে। বাতাস যেহেতু একস্থানে আবদ্ধ থাকে না, নিয়তই একস্থান থেকে স্থানান্তরে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, তাই কোনও স্থানের বাতাস দূষিত হয়ে পড়লে অন্যস্থানের বাতাসও বিশুদ্ধ থাকবে না, বায়ুদূষণের বিষয়টি তাই আজ সমগ্র পৃথিবীর সমস্যা (global problem) হয়ে দেখা দিচ্ছে।

বাতাসে কার্বন মনোক্সাইডের উপস্থিতি আমাদের অসুস্থ করে তুলতে পারে। কারণ কার্বনমনোক্সাইড অক্সিজেন সংবহন ক্ষমতা কমিয়ে দেয় — পরিণামে মৃত্যু ঘটতেও পারে।

সালফার ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেনের অক্সাইড এসব বায়ুতে উপস্থিত থাকলে সেই বায়ুতে প্রশ্বাস গ্রহনে আমরা ফুসফুসের বিভিন্ন ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে পারি, এসব গ্যাসের বায়ুতে উপস্থিতি অ্যাসিড বৃষ্টির কারনও হয়ে উঠতে পারে। বায়ুতে ভাসমান কঠিন কনাও ফুসফুস সংক্রান্ত ব্যাধির সৃষ্টি করতে পারে। বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমান বৃদ্ধিতে গ্রীন-হাউস-এফেক্টের মাধ্যমে ভূ-তাপমাত্রা বৃদ্ধিপেতে পারে, পরিনামে পৃথিবীর মেরু অঞ্চলে সঞ্চিত বরফ গলে গিয়ে দ্রুত সমুদ্র জলতল স্ফীত করে তুলতে পারে যার ফলে পৃথিবীর বহু অঞ্চল প্লাবিত হতে পারে। এসব ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে বাতাসে অন্যান্য কিছু বিষাক্ত গ্যাস যেমন অ্যামোনিয়া, ক্লোরিন ইত্যাদি মিশেও বাতাসকে বিষিয়ে দিতে পারে-অ্যামোনিয়া গ্যাস চোখের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকারক, ক্লোরিন গ্যাসও গলা বুক আক্রান্ত করে।

দূষক পদার্থের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে বায়ু দূষণকে দুটি প্রকারে ভাগ করা যায়— গ্যাসীয় দূষক পদার্থ জনিত বায়ুদূষণ এবং বায়ুতে ভাসমান কঠিন কনা জনিত বায়ুদূষণ।

পশ্চিম ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা 50 ভাগ বায়ুদূষণের উৎস হল মোটরগাড়ি, বাকী 50 ভাগ দূষণের উৎস বিভিন্ন শিল্প থেকে এবং তাপ উৎপাদক সিস্টেম থেকে পরিত্যক্ত বর্জ্যপদার্থ সমূহ।

ভারতের অবস্থাটা এই পরিপ্রেক্ষিতে একটু যাচাই করা যেতে পারে। আমাদের দেশের বড় বড় শহর গুলির প্রতিটিতে প্রতিদিন গড়ে প্রায় 400 থেকে 1000 টন দূষক পদার্থ বাতাসে পরিত্যক্ত হয় বলে অনুমিত হয়। এইসব দূষক পদার্থের শতকরা 50 ভাগ মোটর গাড়ি থেকে পরিত্যক্ত ধোঁয়া থেকে আসে, 15 থেকে 20 ভাগ আসে গৃহস্থালীর বর্জ্য পদার্থ থেকে আর বাকিটা আসে বিভিন্ন শিল্প থেকে বিশেষতঃ তাপবিদ্যুৎ-কেন্দ্র, ধাতু নিষ্কাষনে প্ল্যানট এবং অন্যান্য রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরন কারখানা থেকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির তুলনায় ভারতে গ্যাসীয় দূষকের পরিমান কম হলেও ভাসমান কঠিন কনা দূষকের পরিমান সাধারনত বেশী। সারনী-৪ এ ভারতের প্রধান কয়েকটি শহরের বাতাসে একটি প্রধান বায়ুদূষক গ্যাস সালফার ডাইঅক্সাইডের পরিমান এবং ভাসমান কঠিন কনার পরিমান দেখানো হলঃ

শহর	বাতাসে সালফার ডাইঅক্সাইডের গড় পরিমান মাইক্রোগ্রাম প্রতি ঘনমিটার	ভাসমান কঠিন কনা পরিনাম মাইক্রোগ্রাম প্রতি ঘনমিটার
বোম্বাই	47.11	240.8
কলকাতা	32.88	340.7
নয়াদিল্লি	41.43	601.1
কানপুর	15.97	543.5
জয়পুর	4.15	446.1

কলকাতা, দিল্লী, বোম্বাই তিনটি শহরেই বাতাসে সালফারডাই অক্সাইডের পরিমান বেশীই। এর ফলে বিশেষ করে শীতকালে ধোঁয়াশার (ধোঁয়া + কুয়াশা) সৃষ্টি হলে জনস্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। কয়েক বছর পূর্বে বোম্বাইতে এই ধরনের ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছিলো এবং সেখানকার বিশেষতঃ বস্তি অঞ্চলে বহুলোক নাক-কান-গলা এবং ফুসফুসের ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। কলকাতাতেও বেশী শীতের সময় বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে ঐ রূপ ধোঁয়াশা আমরাও দেখে থাকি। 1984 সালের 1লা ডিসেম্বর ভূ-পালের গ্যাস-ট্র্যাজেডীর কথা ভারতবাসী কোনও দিন ভুলতে পারবে না। বহুজাতিক সংস্থা ইউনিয়ন কার্বাইডের ভূপালস্থ কীটনাশক তৈরীর

কারখানা থেকে বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হওয়ার ফলে ভূপালের দু হাজারেরও বেশী মানুষ সঙ্গে সঙ্গেই প্রান হারান, অসংখ্য মানুষ অন্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনায় থেকে যান। পরবর্তীকালে জানা গেছে গ্যাসে আক্রান্ত অনেকে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছেন। বায়ুদূষনের ফল কতটা মারাত্মক হতে পারে পৃথিবীর পরিবেশ দূষনের শোচনীয়তম ঘটনাগুলির অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত ভূপালের গ্যাস দুর্ঘটনা ছাড়াও ভারতের বড়ো বড়ো শহর ও শিল্পাঞ্চল এলাকায় মাঝে মাঝেই দু-একটি গ্যাস দুর্ঘটনার খবর আমাদের সতর্কবানী শুনিয়ে চলেছে।

কয়েক বছর আগে দুর্গাপুরের একটি কারখানা থেকে ক্লোরিন গ্যাস লিকেজের ফলে অনেক মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েন। সৌভাগ্যবসতঃ ঠিক ঐ সময়ে প্রবল বৃষ্টি হওয়ায় ক্ষয়ক্ষতি তেমন মারাত্মক হতে পারেনি। 1989 সালে কলকাতার কালিঘাটে একটি কারখানা থেকে ক্লোরিন গ্যাস লিকেজের ফলে 4 জন ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ হারান। এছাড়াও মাঝে মাঝেই অনেক কারখানা থেকে অ্যামোনিয়া লিকেজের খবর পাওয়া যায়। ভারতের বড়ো বড়ো শহরে বা শিল্পাঞ্চলে এ ধরনের গ্যাস-দূর্ঘটনা যে কোনও মুহূর্তেই ঘটে যেতে পারে।

সাধারনভাবে ভারতের শহর ও শিল্পাঞ্চলে গ্যাসীয় দূষক পদার্থগুলির মধ্যে প্রধান হল সালফারডাইঅক্সাইড যেটির মূলউৎস হল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি, তৈল শোধনাগার সমূহ এবং ধাতু নিষ্কাশন শিল্প-সমূহ। 1964 সালে সারা দেশে বিভিন্ন উৎস থেকে পরিত্যক্ত সালফারডাইক্সাইডের পরিমান যেখানে ছিলো 1.4 মেট্রিক টন, 1979 সালে সেটির পরিমান দাঁড়ায় গিয়ে 3.2 মেট্রিক টন, বর্তমানে এই পরিমান যে আরও অনেক বেশী তা বলবার অপেক্ষা রাখে না। সালফারডাইঅক্সাইড অ্যাসিড বৃষ্টির সম্ভাবনা সৃষ্টিকারী গ্যাস, কাজেই এ গ্যাসের পরিমান বাতাসে বৃদ্ধি পেতে থাকলে আশঙ্কার কথা।

তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি থেকে পরিত্যক্ত ছাই (fly-ash) মোটরগাড়ির ধোঁয়ায় বর্তমান সীসা যৌগ (টেট্রাইফাইল লেড) এসব হল বাতাসে ভাসমান কার্বন-কণা-দূষক গুলির মধ্যে প্রধান (মোটর গাড়ির জ্বালানী পেট্রলে টেট্রাইফাইল লেড যৌগ অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়)। দিল্লীতে পরিচালিত এক সমীক্ষায় প্রকাশ সেখানে যানবাহনগামী পথের ধারে বাতাসে এই যৌগটির মাত্রা প্রতি ঘনমিটারে প্রায় 90 থেকে 324 ন্যানোগ্রামের মত যা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক সীমার উর্ধ্বে। কলকাতার বাতাসে গড়ে প্রায় 6.66 মাইক্রোগ্রাস সীসার উপস্থিতি প্রমাণিত হয়েছে (ন্যানোগ্রাম $=10^{-9}$ গ্রাম, মাইক্রোগ্রা $=10^{-6}$ গ্রাম)।

যাই হোক, বায়ুদূষণ- সম্পর্কিত আলোচনায় অ্যাসিড বৃষ্টি, গ্রীনহাউস এফেক্ট এবং ধোঁয়াশা সম্পর্কে একটু বিশদ ভাবে জানা প্রয়োজন। সে আলোচনায় এবারে যাওয়া যেতে পারে।

অ্যাসিড বৃষ্টি ঃ

বাতাসে বিভিন্ন আম্লিক গ্যাস ক্রমাগত মিশতে থাকলে বাতাসের জলীয় বাষ্পের (এবং অনেকক্ষেত্রে এর সঙ্গে অক্সিজেনের এবং সূর্যালোকের সঙ্গে এদের বিক্রিয়ায় অ্যাসিড উৎপন্ন হতে পারে বিশেষ করে বৃষ্টি হলে বৃষ্টির জলের সঙ্গে এই সব অ্যাসিড মিশে গিয়ে ভূ-পৃষ্টে নেমে এসে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতি সাধন করতে পারে। একেই অ্যাসিড বৃষ্টি বলে। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে অ্যাসিডবৃষ্টির বিপদ মারাত্মক হয়ে দেখা দিচ্ছে। আমাদের এখানে এখনই তেমন মারাত্মক ভাবে দেখা না দিলেও যে হারে বাতাসে আম্লিক গ্যাসের (বিশেষতঃ সালফার ডাইঅক্সাইডের) পরিমান বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে যে কোনও সময়ে এই বিপদ নেমে আসতে পারে। প্রকৃত পক্ষে ভারতের কয়েকটি শহর যথা বোম্বাই, দিল্লী, নাগপুর, পুনে থেকে বিক্ষিপ্ত ভাবে বিভিন্ন সময়ে কিছুটা অ্যাসিড বৃষ্টির খবর মিলেছে। কলকাতাও এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে অ্যাসিড বৃষ্টির জন্য দায়ী মূলতঃ সালফার-ডাই-অক্সাইড গ্যাস এবং নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড যে গুলির উৎস আবার তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ধাতু শিল্প কেন্দ্র, মোটর গাড়ির ধোঁয়া ইত্যাদি। কয়লা, খনিজ তৈল ইত্যাদিতে বর্তমান সালফার বা নাইট্রোজেন ঘটিত যৌগের দহনের ফলে এই সব গ্যাস বাতাসে মেশে এবং পরিনামে সূর্যালোকের উপস্থিতিতে জলীয় বাষ্প এবং অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়ায় অ্যাসিড (যথা সালফিউরিক অ্যাসিড নাইট্রিক অ্যাসিড ইত্যাদি) উৎপন্ন করে। বাতাসে এই ধরনের অ্যাসিড উৎপন্ন হলে সেই বাতাসের বিভিন্ন ক্ষতিকারক প্রভাব অনুভূত হতে পারে। কয়েক বছর আগে ভারত তথা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য কীর্তি তাজমহলের দেওয়ালের গায়ে যে ক্ষয় দেখা দিয়েছিলো তার কারন হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিলো তাজমহল সংলগ্ন এলাকার বাতাসে সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাসের পরিমান বৃদ্ধিতে যমুনা নদীর অপর পারে অবস্থিত মথুরা তৈল শোধনাগার এবং সন্নিহিত এলাকার রেলের একটি লোকোশেড,এই সালফার-ডাই-অক্সাইড বাতাসে মেশার জন্য দায়ী, প্রধান দুটি উৎস বলে চিহ্নিত করা হয়। তাজমহলের মার্বেল পাথর সালফার ডাই-অক্সাইড জাত সালফিউরিক অ্যাসিড দ্বারা এই স্টোন-ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়। লোকোশেডটিকে স্থানান্তরিত করে তৈলশোধনাগারে কিছু নিবারন মূলক ব্যবস্থা নিয়ে এবং তাজমহল সংলগ্ন এলাকায় বনভূমি সংরক্ষন ও সৃজন করে তাজমহলের এই ক্ষয় আপাততঃ প্রতিহত করা সম্ভব হয়েছ। অ্যাসিড বৃষ্টির জন্য পৃথিবীর বিভিন্নস্থানে বহু শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য বা শিল্পকীর্তি বিপদের সম্মুখীন যেমন ওয়াশিংটনের লিঙ্কন স্মৃতি-সৌধ ও ক্লিওপেট্রার নীড্‌ল, গ্রীসের অক্সাপেলিন প্রভৃতি। দিল্লীর বাতাসে সালফারডাই অক্সাইডের পরিমান বৃদ্ধিতে লালকেল্লার ক্ষতিসাধনের সম্ভাবনা রয়েছে। ভবিষ্যতে কলকাতার ভিক্টোরিয়া স্মৃতি সৌধও এই ধরণের বিপদের সম্মুখীন হতে পারে।

অ্যাসিড বৃষ্টির ফলে ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন উৎসের জল তীব্রভাবে অম্লায়িত হয়ে যেতে পারে ফলে জলজ জীবনের ক্ষতি হতে পারে। মৃত্তিকাও এভাবে আম্লিক হয়ে উঠতে পারে ফলে অনেক ধরনের ফসলের ক্ষতি হতে পারে।

মানব শরীরে অ্যাসিড বৃষ্টির ফলাফল নিয়ে ব্যাপক গবেষণা তেমন হয়নি। তবে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে যে বিভিন্ন ধরনের চর্মরোগ এবং ফুসফুসের ব্যাধিতে এর ফলে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা প্রবল। অ্যাসিডবৃষ্টিজাত সালফিউরিক এবং নাইট্রিক এই দুটি অ্যাসিডই ফুসফুসের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক এবং ফুসফুসের ক্যান্সার সৃষ্টির কারন হয়ে উঠতে পারে। সুতরাং অ্যাসিডবৃষ্টি প্রতিরোধে সতর্কতা অবলম্বন এখনই জরুরী।

গ্রীণ হাউস এফেক্ট ঃ

অনেক শীতপ্রধান দেশে অতিনিম্ন তাপমাত্রায় যে সব উদ্ভিদ জন্মাতে পারে না এমন উদ্ভিদ উৎপন্ন এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় সূর্যালোক উদ্ভাসিত স্থানে কাঁচের ঘরে, কাঁচের মধ্য দিয়ে সূর্যালোক ঘরে প্রবেশ করে যে উত্তাপ যোগায় তার অনেকখানিই ঘরের অভ্যন্তরে ধরে রাখা সম্ভব হয় কারণ কাঁচ অবলোহিত রশ্মি শোষণ করে ঘরের ভিতরের তাপ বাইরে নির্গত হতে বাধা দেয়। ঐ ধরণের কাঁচের বাড়িকে বলা হয় গ্রীণ-হাউস এবং গ্রীণ হাউসে তাপ সংরক্ষণের বিষয়টিকে বলা হয়ে থাকে **গ্রীণ-হাউস-এফেক্ট**। কার্বন-ডাই-অক্সাইডের তাপ সম্পর্কিত ধর্ম অনেকটা এই কাঁচের মতই। বাতাসের কার্বন-ডাই-অক্সাইড সূর্যালোকের ভূপৃষ্ট আপতনের পথে বাধা স্বরূপ নয়। কিন্তু ভূতাপকে মহাশুন্যে বিকিরিত হতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাধা দেয় কারণ গ্যাসটি অবলোহিত রশ্মি শোষণ করতে সক্ষম(গ্রীণ হাউজ এফেক্ট)। বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ যথাযথ থাকলে ভূতাপমাত্রাও যথাযথ থাকবে। অন্যথায় কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি হলে ভূতাপমাত্রারও যথাক্রমে হ্রাস বা বৃদ্ধি হতে পারে। আগেই

উল্লেখ করা হয়েছে যে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে, এভাবে চলতে থাকলে 2030 সাল নাগাদ ভূতাপমাত্রা 1.5°C থেকে 4.5°C বৃদ্ধি পেতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা প্রকাশ করছেন। এভাবে ভূ-তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে পৃথিবীর মেরু অঞ্চলের বরফ অন্তত আংশিকভাবে গলে গিয়ে সমুদ্র জলতলকে স্ফীত করে তুলতে পারে। হিসেব কষে বলা হয়েছে সমুদ্র-জলতল 60 মিটার স্ফীত হলেই পৃথিবীর বহু জনাকীর্ন অঞ্চলই প্লাবিত হবে এবং পৃথিবীপৃষ্ঠের ঠিক ওপরের বায়ুমণ্ডল সর্বত্র যদি মাত্র 2°C বেশী উত্তপ্ত হয় তবে গ্রীণল্যাণ্ড ও দক্ষিণ মেরুর হিমবাহগুলো আংশিকভাবে গলে যাবে। ইতিমধ্যে উপযুক্ত নিবারণমূলক ব্যবস্থাদি না নিলে এই শতকের শেষেই সমুদ্রের জলতল 1.4—2.2 মিটার পর্যন্ত স্ফীত হতে পারে।

কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছাড়াও বাতাসে মিশছে এমন অন্যান্য কয়েকটি গ্যাসেরও এই ধরণের তাপীয় প্রভাব বর্তমান। এই ধরণের সব গ্যাসকেই তাই গ্রীণ-হাউস গ্যাস বলা হয়ে থাকে। কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছাড়া অন্যান্য কয়েকটি গ্রীণ-হাউস গ্যাস হল মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, ওজোন, বিভিন্ন ক্লোরোফ্লুওরো কার্বন যৌগ ইত্যাদি।

বনসম্পদের ব্যাপকভাবে ধ্বংসসাধন, বিভিন্ন শিল্প (তাপ-বিদ্যুৎ, ধাতু নিষ্কাশনে ইত্যাদি) যানবাহনে ও অন্যত্র জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যাপক দহনের ফলে এবং প্রসাধনদ্রব্য, হিমায়ক, অগ্নিনির্বাপক রাসায়নিক পদার্থের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে এই সব গ্রীণ হাউস গ্যাসের বাতাসে আধিক্য ঘটছে। এর পরিমাণ ভয়াবহ হতে পারে।

অবশ্য বাতাসে বিভিন্ন ধরণের কঠিন কণা জমতে থাকায় গ্রীণ-হাউস এফেক্টের বিপরীতমুখী কিছু ফলাফলও অপ্রত্যাশিত নয় কারণ বাতাসে দীর্ঘদিন ধরে পুঞ্জীভূত কঠিন কণা সূর্যরশ্মির পৃথিবীতে প্রাপ্ত আপাতনের পথে খানিকটা বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এর ফলে সৌরতাপ এবং পৃথিবী থেকে বিকিরিত তাপের পরিমাণের অনুপাত কমে যেতে পারে -পরিণামে পৃথিবীর ঠিক উপরিভাগের বায়ুমণ্ডল অপেক্ষাকৃত শীতল হয়ে উঠতে পারে আবার তুষারযুগের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে)।

আসলে কী ঘটবে সে সম্পর্কে সঠিক ভবিষ্যৎবাণী করা যদিও দুরুহ। তবে ফলাফল যে খুব ভালো হবে না একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। বিশেষ করে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ক্রমাগত বেড়ে যেতে থাকলে প্রাণীজগতের ক্ষতির সম্ভাবনা যে মারাত্মক হবে এবং আবহাওয়ার পরিবর্তনে কৃষিক্ষেত্রে। খাদ্যশৃঙ্খলেও যে বিপুল পরিবর্তন ঘটবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। 1992 এর 3-14 জুন রিও-ডি-জেনেইরোতে রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তাই অন্যতম প্রধান আলোচ্য ছিলো গ্রীণ-হাউজ এফেক্ট এবং এর সম্ভাব্য মোকাবিলা-পন্থা।

ধোঁয়াশা ঃ

শীতকালে অনেক শহরে বা শিল্পাঞ্চলে কুয়াশার সঙ্গে শিল্প, কলকারখানা, মোটরগাড়ি এসব থেকে নিঃসৃত ধোঁয়া মিশে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই ধোঁয়াশা জনস্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। 1952 সালে লণ্ডনে প্রায় পাঁচদিন ব্যাপী ঘন ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছিলো এবং এই পাঁচদিনে লণ্ডন নগরীর প্রায় 4000 মানুষ এই ধোঁয়াশার বিষবাষ্পে মারা যান এবং অসংখ্য মানুষ বিশেষ করে—বৃদ্ধ এবং নারীরা অসুস্থ হয়ে পড়েন। বিশ্বের শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চলের অনেক শহরেই ধোঁয়াশার বিষ ঘণীভূত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লস্ এঞ্জেলেস্ শহরে বছরে প্রায়270 বার ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়। এখানে ধোঁয়াশার ধোঁয়ায় মূলতঃ ওজোন এবং নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড থাকে এবং এই গ্যাসগুলির দ্বারা মানবদেহের চোখ, নাক এবং শ্বাসনালী আক্রান্ত হয়। (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য লণ্ডন শহরে ধোঁয়াশার জন্য মূলতঃ সালফার ডাই অক্সাইড গ্যাসকে দায়ী করা হয়)। লস্ এঞ্জেলেস্ শহরে চলাচলকারী বিপুলসংখ্যক মোটরগাড়ি থেকে নির্গত ধোঁয়ার

সঙ্গে বাতাসের অক্সিজেনের বিক্রিয়াতেই নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড এবং ওজনের সৃষ্টি হয়। কেবল ইংল্যাণ্ড বা আমেরিকা নয় বিশ্বের অন্যত্রও বহু শহরে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়ে থাকে। ইটালি ও জাপানের বহু শহরেই ধোঁয়াশার সমস্যা রয়েছে।

আমাদের এখানে কয়েকবছর আগে বোম্বাই শহরে কয়েকদিন ধোঁয়াশার ফলে বহু লোক বিশেষ করে বস্তি অঞ্চলের বহু মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েন – সেখানে ফুসফুস সংক্রান্ত রোগ ব্যাধি হঠাৎ করে অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে যায়। শীতকালে সন্ধ্যার দিকে কলকাতার কিছু এলাকায় ধোঁয়াশা জমতে দেখা যায় এবং এর মধ্যে থাকলে চোখ জ্বালা করতে থাকে। অনেক সময় বমি বমি ভাব হয়।

ধোঁয়াশার উৎপত্তি সম্পর্কে আবহাওয়া-বিদ্‌গনের যা অভিমত সরলীকৃত ভাবে তা হল এইরকম ঃ

সাধারণত শীতকালে কোনও স্থানে ভূ-পৃষ্ঠের ঠিক উপরের বাতাস অত্যাধিক ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বেঁধে নীচেই আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারে (সাধারণ অবস্থায় কিন্তু ঐ নীচের বাতাস উপরে উঠে যাবার কথা এবং উপরের বাতাস নীচে আসবার কথা)। এই বাতাসে যদি শিল্পে ও মোটরগাড়ি থেকে জাত বিষাক্ত গ্যাস বা কঠিন কণা মিশ্রিত থাকে তবে ধোঁয়াশার বিপর্যয় ঘনিয়ে আসতে পারে। উপরের বাতাসের তাপমাত্রা এক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বেশী হওয়াতে উপরের সতেজ, বিশুদ্ধ বাতাস নীচে নেমে আসতে পারে না। কাজেই ধোঁয়াশা সৃষ্টির জন্য দায়ী হল বায়ুস্তরের তাপমাত্রা উল্টে যাওয়ার এই ব্যাপারটা এবং কিছু বিষাক্ত গ্যাস বা কঠিন কনা বাতাসে মেশে।

জনস্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতিকরা ছাড়াও ধোঁয়াশা উদ্ভিদ কোষের ক্ষতি করতে পারে, রবার এবং নাইলনের জিনিষপত্রের ক্ষতি করতে পারে। ঐতিহাসিক সৌধ প্রাসাদ এসবেরও ক্ষতি করতে পারে।

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়াবিদ মোরিস নিউয়ারবার্জারের মতে সারা পৃথিবীই একদিন কালো ধোঁয়াশায় ঢেকে যাবে এবং সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠবে। এই ধরনের সতর্কবানীতে এখুনই আতঙ্কিত হবার প্রয়োজন না থাকলেও এ বিষয়ের প্রতিকারে আশু পরিকল্পনা গ্রহন করা যে জরুরী সে বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই।

ওজোন-স্তরের হ্রাসপ্রাপ্তি ঃ

ভূ-পৃষ্ঠের উপরে 25 থেকে 40 কিলোমিটার পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলের ওজোনস্তর বিস্তৃত। ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন বাতাসে ওজনের উপস্থিতি স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক হলেও পৃথিবীতে জীবকুলের মঙ্গলার্থে বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরের একটি বিশেষ ভূমিকা বর্তমান, কারন সূর্যরশ্মির ভূ-পৃষ্ঠে আপতন কালে সূর্যরশ্মির মধ্যেকার জীবকুলের ক্ষতি কারক অতিবেগুনী রশ্মির শতকরা প্রায় 99 ভাগই এই ওজোনস্তর দ্বারা শোষিত হয়। উর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলের এই ওজোনস্তরতাই ছাতার মতো আবরন সৃষ্টি করে সূর্যের অতি বেগুনী রশ্মি থেকে আমাদের রক্ষা করছে। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে এই ওজোনস্তর পৃথিবীর কোনও কোনও অঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। কোথাও কোথাও নীল ওজোনস্তর বাদামী বর্ণ ধারন করেছে। বিজ্ঞানীদের মতে বিশেষ কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থের সঙ্গে ওজোনস্তরের ওজোনের বিক্রিয়ার ফলে ওজোন ভেঙ্গে অক্সিজেনে পরিবর্তন হওয়ার ফলেই ওজোনস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। ওজোনস্তর এভাবে ভেঙ্গে যেতে থাকলে এই স্তর ক্রমশ পাতলা হয়ে আসতে থাকবে এবং সেক্ষেত্রে সূর্যরশ্মির মধ্যস্থ অতিবেগুনী রশ্মি বেশী মাত্রায় ভূ-পৃষ্ঠে পৌছতে পারে তার ফলে আমরা বিভিন্ন চর্ম রোগ, অ্যালার্জি এমনকি চামড়ার ক্যান্সারে আক্রান্ত হতে পারি। সমগ্রজীবকূলেরই মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। ওজোনস্তরের এই ক্ষতির মূলে

কয়েকটি বিষয়কে বিজ্ঞানীরা বিশেষভাবে দায়ী করেছেন। উর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলে শব্দের চেয়ে দ্রুতগামী বিমান (যেমন কনকর্ড) যাবার কালে জেট ইঞ্জিনের সুউচ্চ তাপমাত্রায় বাতাসের নাইট্রাজেন এবং অক্সিজেন পরস্পর যুক্ত হয়ে নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড গঠিত হয়। ওজোনের সঙ্গে নাইট্রোজেনের অক্সাইডগুলির (বিশেষ করে নাইট্রিক অক্সাইডের) বিক্রিয়ার ফলে ওজোন ভেঙ্গে অক্সিজেনে পরিবর্তিত হয়। ইদানীং বিভিন্ন প্রসাধন দ্রব্যে, হিমায়ক পদার্থে, এয়ারকণ্ডিশনারে, এয়ারোসলে বর্তমান্ ক্লোরোফ্লুওরো কার্বন যৌগসমূহই ওজোনস্তরের বিভাজনের জন্য মূলতঃ দায়ী বলে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস। উর্ধ্ব আবহাওয়ামণ্ডলে এই সব যৌগ উচ্চ তাপমাত্রায় ভেঙ্গে গিয়ে যে ক্লোরিন উৎপন্ন করে সেটি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অক্সাইড পরিবর্তিত হয়ে ওজোনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ওজোনকে ভেঙ্গে দেয়। তাছাড়া ক্লোরোফ্লুওরো কার্বন যৌগ সমূহ গ্রীন হাউস গ্যাস হিসেবে কার্বনডাই অক্সাইড থেকেও বিপজ্জনক বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। **এই ধরনের বিপজ্জনক রাসায়নিক ব্যবহার যাতে কমিয়ে আনা যায় সে বিষয়ে সারা পৃথিবী জুড়েই তাই ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছে।**

সম্ভাব্য সমাধান পন্থা ঃ

একথা খুবই সহজবোধ্য যে বায়ুদূষনের বিষয়টি যেহেতু সমগ্র পৃথিবীরই সমস্যা তাই এই সমস্যা সমাধানে আন্তর্জাতিকস্তরে ব্যবস্থাদি গ্রহন জরুরী। সত্তর এবং আশির দশকে এবং অতি সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কয়েকটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মাধ্যমে বেশ কিছু সুপারিশ এ প্রসঙ্গে বিশ্বের দেশগুলির কাছে রাখা হয়েছে। এই সম্মেলনের কয়েকটি হল পরিবেশ সম্পর্কিত সুইডেনের স্টক হোমে 1972 এর জুনে অনুষ্ঠিত সম্মেলন, জনসংখ্যা সম্পর্কিত 1974 এর বুখারেষ্ট সম্মেলন এবং 1984 এর মেক্সিকো সম্মেলন। মরুবিস্তার সম্পর্কিত 1977 এর নাইরোবি সম্মেলন, উন্নয়নের জন্য 1981 এর নাইরোবি সম্মেলন ইত্যাদি এবং সম্প্রতি ব্রাজিলের রিও ডি জেনেইরোতে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সম্মেলন (1992 এর 3-4 জুন)। এসব সম্মেলন থেকে কিছু মূল্যবান প্রস্তাব এবং সুপরিশ বিশ্বের দেশগুলির কাছে রাখা হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন সংস্থার উদ্যোগে বিভিন্ন দেশে কিছু কর্মসূচী রূপায়িত হয়েছে বা হচ্ছে। আমাদের দেশেও পরিবেশ সুরক্ষার বিভিন্ন কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। 1978 সালে লোকসভায় বায়ুদূষন নিয়ন্ত্রন এবং প্রতিরোধ সম্পর্কিত একটি বিল পাশ হয়। ভূপাল গ্যাস-ট্র্যাজেডির পর 1986 সালে পরিবেশ সুরক্ষা আইন চালু করা হয়। এসবের মাধ্যমে পরিবেশ সুরক্ষায় সরকারী সদিচ্ছার পরিচয় মেলে। তবে কেবলমাত্র সরকারী আইন কানুন প্রণয়নই এ বিষয়ে যথেষ্ঠ নয়। বায়ুদূষণের একটি প্রধান কারন বনসম্পদের নির্বিচারে ধ্বংসসাধন। এ বিষয়ে সম্ভাব্য সমাধান হল বনভূমি সংরক্ষণ এবং নয়া বনভূমি সৃজন-সামাজিক বনসৃজন সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনায় এ বিষয়ে পৃথকভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। পরিকল্পিত নগরায়ন, শিল্পোয়ন এবং আবাসন বনভূমি গাছপালার অবাধ উৎপাদন বন্ধের সহায়ক হতে পারে।

বায়ুদূষনের সমস্যাটি অত্যন্ত জটিল বিশেষতঃ এই কারনে যে বায়ু একবার দূষিত হয়ে পড়লে সেই বায়ুকে তো আর সংগ্রহ করে পরিশুদ্ধ করে পুনরায় পরিবেশে ছেড়ে দেওয়া সম্ভব নয়। কাজেই বায়ুদূষনের সম্ভাব্য উৎসগুলিতেই দূষন-নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

মোটরগাড়ির ধোঁয়া থেকে যে বায়ুদূষন হয় সাধারনত জ্বালানীর অসম্পূর্ণ দহনের ফলেই তা হয়ে থাকে, মোটরগাড়ির ইঞ্জিনে কিছু নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা যেমন ব্লোটচ বা মাফলার (Muffler) নামক যন্ত্রের সাহায্যে মোটরগাড়ির জ্বালানীর প্রায় সম্পূর্নদহন সম্পন্ন করন এবং দূষন নিয়ন্ত্রন অনেকাংশে সম্ভব। গাড়ি চালাবার অনুমতিপত্র দেবার সময়ে বা পুর্ন-নবীকরন কালে গাড়িতে দূষন নিয়ন্ত্রক বা মন্দীভূতকারক ন্যূনতম ব্যবস্থাদি নেওয়া হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত থাকা উচিত

এবং সরকারী আইনের কঠোর প্রয়োগ এ বিষয়ে হওয়া উচিত।

তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র জাত ছাই যাতে বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে জনস্বাস্থ্য এবং উদ্ভিদ জীবনের ক্ষতির কারন না হয়ে দাঁড়াতে পারে তার জন্য বিদ্যুৎকেন্দ্রের ধারেই অধঃক্ষেপক যন্ত্রে ঐ ছাই অধঃক্ষিপ্ত করবার ব্যবস্থা থাকে, কিন্তু সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার যাতে ঐ অধঃক্ষেপক যন্ত্র সর্বদা চালু থাকে এবং এটি বিকল হলে সাথে সাথেই ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের কাছে জমা হওয়া ছাই থেকে বর্তমানে কোথাও কোথাও বেশ ভালো মানের ইট তৈরী হচ্ছে – সর্বত্রই এই ভাবে পরিত্যক্ত ছাই এর সদ্ব্যবহারের সুযোগ নিতে হবে।

শিল্প কলকারখানাজাত বায়ুদুষন নিয়ন্ত্রনে উপযুক্ত নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা গ্রহনে মালিক বা কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করা প্রয়োজন। এর জন্য উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে দুষক পদার্থসমূহ থেকে অন্যভাবে প্রয়োজনীয় এমন দ্রব্য উৎপাদনে সচেষ্ট হওয়া যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ কেবল তামানিষ্কাশন শিল্প থেকে যে পরিমান সালফার-ডাই-অক্সাইড বাতাসে পরিত্যক্ত হয়ে বাতাসকে দূষিত করে তোলে ঐ সালফারডাইঅক্সাইড থেকে প্রতি বছর কয়েক লক্ষ টন সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপাদন সম্ভব।

প্রকৃতপক্ষে আধুনিক প্রযুক্তিতে **বর্জ্য পদার্থ** কথাটি অর্থহীন হয়ে উঠছে। প্রযুক্তির ব্যাপক এবং অপরিকল্পিত প্রয়োগে একদিকে যেমন পরিবেশ-সমস্যার সৃষ্টির সম্ভাবনা, তেমনি উন্নত প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটিয়েই ঐ সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট হতে হবে-যাকে বলা হয়ে থাকে **পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তির প্রয়োগ**। শিল্প কলকারখানা স্থাপনের স্থান নির্বাচন সম্পর্কে অবশ্য প্রথমেই সতর্ক হওয়া জরুরী। ঘনজনবসতিপূর্ণ এলাকায় পরিবেশ দূষিত করতে পারে এমন শিল্পস্থাপনে অনুমতি দান অনুচিত। গ্রামাঞ্চলেও বসতি এলাকার কাছে ইটভাঁটা হতে দেওয়া ঠিক নয়। কারণ ইটভাঁটা থেকে বিষাক্ত কার্বনমনোকসাইড বাতাসে মেশে।

বিশেষ করে শহরাঞ্চলে আবর্জনাজাত যে বায়ুদুষণ সেটিও কম ক্ষতিকারক নয়। গার্হস্থালির, প্রতিষ্ঠানিক, পৌরসভার প্রতিদিনের জমানো জঞ্জাল জমে এবং আংশিকভাবে পচে গিয়ে বিশেষ বিশেষ এলাকায় বাতাসকে দূষিত করে তোলে এবং দুর্গন্ধের সৃষ্টি করে, এই ধরণের দুষণকে তাই গন্ধ-দূষণ বলা যায়। দুর্গন্ধ সৃষ্টি ছাড়াও রোগজীবাণু ছড়াতেও এই ধরণের জমা জঞ্জালের ভূমিকা রয়েছে। কলকাতাতে এভাবে প্রতিদিন প্রায় 2600 টন জঞ্জাল জমা হয়। এই পরিমাণ অবশ্য লণ্ডন বা নিউইয়র্কের প্রতিদিনের জঞ্জালের পরিমাণের (যথাক্রমে 8500 টন এবং 16000 টন) তুলনায় কম কিন্তু লণ্ডন বা নিউইয়র্কের জঞ্জাল যেমন কখনও জমতে দেওয়া হয় না। কলকাতায় জমা জঞ্জালের অন্তত শতকরা 10 দেখে 20 ভাগ কখনোই পরিষ্কার করা হয় না। ফলে দিনের পর দিন জঞ্জাল জমা হয়ে দূষণের সমস্যা সৃষ্টি করছে। এই জঞ্জালের একটা বড় অংশ জৈবগ্যাস প্রস্তুতিতে কাজে লাগানো যেতে পারে, এক্ষেত্রেও উপযুক্ত প্রযুক্তির প্রয়োগ সমস্যাকে সম্পদে পরিণত করার সহায়ক হতে পারে।

সবশেষে আমাদের বড় বড় শহরগুলিতে পরিকল্পিতভবে জনবসতির ঘনত্ব নিয়ন্ত্রনে না রাখতে পারলে কলুষমুক্ত রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। লণ্ডন বা মস্কো নগরীতে যেখানে প্রতি মুক্ত স্থানের পরিমাণ যথাক্রমে 250 এবং 450 বর্গফুট, কলকাতাতে সেখানে এই পরিমাণ মাত্র 20 বর্গফুটের মতো। পশ্চিমের উন্নত শহরগুলিতে রাস্তার এলাকা যেক্ষেত্রে মোট আয়তনের শতকরা 25 থেকে 30 ভাগের মতো। কলকাতায় সেক্ষেত্রে এই পরিমাণ মাত্র শতকরা 6 ভাগের বেশী নয়। জনবসতির ঘনত্ব সুউচ্চ হওয়ায় ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার যানবাহন চাহিদার প্রেক্ষিতে যানবাহনের সংখ্যাবৃদ্ধি অথচ রাস্তা এলাকার সম্প্রসারণের তেমন সুযোগ না থাকা এসবের ফলে দূষনের মাত্রা বাড়তে বাধ্য।

জলদূষণ ঃ

বাতাসের মতোই জল ছাড়াও জীবনের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। পৃথিবীতে যে বিপুল জলরাশি বর্তমান তার কিন্তু মাত্র শতকরা 2 ভাগের বেশী আমরা ব্যবহার করতে পারছি না এবং এই জলও যদি বিভিন্ন কারণে দূষিত হয়ে পড়ে তবে জীবনও বিপর্যস্ত হবে। আমাদের দেশে জনসাধারণের প্রায় 66 শতাংশ নিরাপদ পাণীয় জল পান না এবং যে পরিমাণ জল আমরা ব্যবহার করি তার প্রায় 70 শতাংশই দূষিত জল। ভারতে জনসাধারণ যে সকল রোগব্যাধিতে ভোগেন সেগুলির 65 শতাংশই জলবাহিত এবং ভারতে প্রতি বছর প্রায় 15 লক্ষ শিশু জলবাহিত রোগে মারা যায়। সুতরাং ভারতে জলসংকট এবং জলদূষণের সংকট দুটিই বেশ প্রকট। জনসংখ্যার দ্রুতবৃদ্ধিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য জলের চাহিদাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। নীচের সারনি—থেকে ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদার একটা ধারণা পাওয়া যাবে।

ব্যবহারের ক্ষেত্র	1974 সালে (মিনিয়ন হেক্টারমিটার)	2000 সালে (M. ha. m)	2025 সালে
সেচ	350	630	770
গার্হস্থ্য ও পশুপালন	13	34	50
শিল্প	5	30	120
জলবিদ্যুৎ উৎপাদন	10	60	160

জলদূষণ-নিয়ন্ত্রণ এবং জলের চাহিদা মেটানো দুটি বিষয়ই নিবিড় সম্পর্কযুক্ত।

ভারতের প্রধান প্রধান নদ-নদী অনেকগুলির জলই বিভিন্ন কারণে দূষিত হয়ে পড়ছে। দেশের সবচাইতে দূষিত নদী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে সবরমতি। এছাড়া মাহি, নর্মদা, তাপ্তী, কৃষ্ণা, কাবেরী, গোদাবরী, সুবর্ণরেখা এসব নদীগুলোর জলও বেশ দূষিত। আর ভারতের সর্বপ্রধান নদী গঙ্গা বিভিন্নস্থানে এমনভাবে দূষিত হয়ে পড়েছে যে গঙ্গাকে অনেকে পৃথিবীর দীর্ঘতম নর্দমারূপে বর্ণনা করছেন। যে সব স্থানে গঙ্গার জল বেশি দূষিত হয়ে পড়েছে সেগুলি হল বার্ণপুর, বারাণসী এবং হাওড়া-হুগলী। কয়েকবছর পূর্বে বারাণসীতে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে গঙ্গার জল নিয়ে আলোচনা সূত্রে প্রকাশ পেয়েছিল যে বারাণসীতে তীর থেকে বেশ খানিকটা দূর পর্যন্ত স্থানে গঙ্গার পারদের পরিমাণ বিপজ্জনক সীমার উর্ধ্বে এবং গঙ্গাজল যে এখানে বেশ দূষিত হয়ে পড়ছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ওখানে গঙ্গাতীরবর্তী একটি কারখানা থেকে পারদযৌগ সমন্বিত বর্জ্যপদার্থ গঙ্গার জলে এসে মেশাতেই গঙ্গার জল এভাবে দূষিত হচ্ছে বলে প্রকাশ। বিষয়টিতে শঙ্কিত হবার কারণ রয়েছে। কারণ ভারতের বিভিন্নস্থানে. থেকে অজস্র নরনারী পুন্য লাভের আশায় বারাণসীর গঙ্গাজলে স্নান করতে আসেন। কিন্তু এই জলে স্নান করলে বিভিন্ন চর্মরোগ তো হতেই পারে-এমনকি চামড়ার ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়াও অসম্ভব নয়। হুগলি নদীতে বর্ষাকালে ইলিশমাছের ঝাঁক আসা কমে যাওয়ার কারণ হিসাবে এখানে নদীর জলের দূষিত হয়ে পড়ার বিষয়টিকেই দায়ী বলে মনে করা হচ্ছে। নদ-নদীর জল ছাড়াও অন্যান্য উৎসের জলও অনেকস্থানেই দূষিত হয়ে পড়ছে-পুকুর, দীঘি, বিল এসবের জল ছাড়াও ভূগর্ভস্থ উৎসের জলও কোনও কোনও স্থানে দূষিত হচ্ছে। ইদানীং কোথাও কোথাও নলকূপের জলে বিষাক্ত আরসেনিক পাওয়াযাচ্ছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। দূষিত জল ব্যবহারে জনস্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। জল বাহিত রোগ যথা কলেরা, টাইফায়েড, আমাশা, উদরাময়, ম্যালেরিয়া, জণ্ডিস এবং বিভিন্ন আন্ত্রিক রোগ দূষিত পাণীয় জল ব্যবহারে মহামারি রূপে দেখা দিতে পারে এবং প্রকৃত পক্ষে এই ধরণের সংবাদ ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই মাঝে মাঝে আমরা পেয়ে থাকি। বিশেষ করে যে সব জায়গায় পাণীয় জলের সমস্যা প্রকট সে সব জায়গাতেই এবং বিশেষত ঃ গ্রীষ্মকালে এই সব রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে।

জলদূষণের বিভিন্ন কারণগুলি হল : (1) শিল্প কলকারখানার বিযাক্ত রাসায়নিক সমন্বিত বর্জ্যপদার্থের জলে মেশা (2) গার্হস্থালীর, প্রাতিষ্ঠানিক এবং পৌর আর্বজনা সমন্বিত নোংরা জল কোনওরকম প্রাকবিধি ব্যবস্থা ছাড়া নদ-নদীর জলে পরিত্যক্ত হওয়া (3) চাষের ক্ষেতে ব্যবহৃত বিভিন্ন সার, কীট নাশক, আগাছা নাশক ইত্যাদির বৃষ্টি বা সেচের জলে ধৌত হয়ে নদনদী খালবিল পুকুরের জলে এসে মেশা (4) জলের উৎসর কাছে জমা বিভিন্ন আবর্জনা, মলমূত্র ইত্যাদি ধৌত হয়ে নিকটস্থ জলের উৎস এসে মেশা। (5) পারমাণবিক চুল্লী ইত্যাদি থেকে তেজস্ক্রিয় পদার্থ সমন্বিত বর্জ্য বস্তুর জলে মেশা ইত্যাদি। এসব ছাড়াও কোথাও বিষাক্ত গ্যাস মিশে বায়ু দূষিত হলে সেই দূষিত বায়ু জলে মিশে জলকেও দূষিত করে দিতে পারে। ভূগর্ভস্থ জলও যে অনেকস্থানে দূষিত হয়ে পড়ছে তার কারণ সম্ভবতঃ মাটির স্তরের মধ্য দিয়ে চুঁইয়ে কীটনাশক বা বিযাক্ত রাসায়নিক থেকে বিশেষ দূষক পদার্থের ভূগর্ভস্থ জলে এসে মেশা। যেমন নলকূপের কাছেই আরসেনিক সমন্বিত কীটনাশক মাটিতে প্রয়োগ করলে, সেই আরসেনিকের ঐ নলকূপের জলে মেশার সম্ভাবনা বর্তমান।

আমাদের বিখ্যাত হ্রদগুলির জলের অবস্থাও খুব একটা সন্তোষজনক নয়। কাশ্মীরে শ্রীনগরের ডালহ্রদ এবং নাগিন হ্রদ আগাছায় ছেয়ে হ্রদের জল দূষিত হয়ে পড়ছে। শিকারে ভ্রমনরত পর্যটকদের পরিত্যক্ত খাবার জলে ব্যাপকহারে মেশাতেই এইভাবে আগাছার সৃষ্টি হচ্ছে। মনিপুরের লোকটাক হ্রদের অবস্থাও একই রূপ।

জলদূষণের বিষয়টি ধীরে ধীরে প্রায় সমগ্র পৃথিবীর সমস্যা হিসেবে দেখা দিচ্ছে বিশেষ করে প্রায় সবগুলি সমুদ্রের জলই কম-বেশী দূষিত হয়ে পড়তে থাকার পরিপ্রেক্ষিতে। সমুদ্রজল দূষিত হবার একটা বড় কারণ হল তেলবাহী জাহাজ থেকে বিপুল পরিমাণে জ্বালানীতেল সমুদ্রজলে পড়া কেবলমাত্র ভারতকে বেষ্টন করে আছে যে সমুদ্রগুলি তাদের জলেই প্রতিবছর প্রায় 10 লক্ষ টন তেল এভাবে মিশে যাচ্ছে। এর ফলে একদিকে যেমন সামুদ্রিক প্রাণী ও উদ্ভিদের ক্ষতির সম্ভাবনা, অপরদিকে সমুদ্রজলের বাতাসের অতিরিক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রা যথাযথ পরিমাণে না থেকে বেড়ে যেতে পারে। সামুদ্রিক শৈবাল যারা সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন বাতাসে ত্যাগ করে বাতাসকে বিশুদ্ধ রাখতে সাহায্য করে সমুদ্র-জল দূষিত হয়ে পড়লে এ সব সামুদ্রিক উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ ক্ষমতা কমে যেতে পারে, পরিণামে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়া বিচিত্র নয়। বিভিন্ন নদ-নদীর জল দূষিত হয়ে পড়লে সেই নদ-নদীর জল যেহেতু শেষপর্যন্ত সাগরে গিয়ে মেশে সুতরাং নদ-নদীর জল দূষিত হয়ে পড়লেও সমুদ্রের জলও দূষিত হতে বাধ্য। পৃথিবীর ফুসফুস সমুদ্রের জল এভাবে দূষিত হয়ে পড়া গভীর আশঙ্কার কথা।

বিভিন্ন উৎসের জল-দূষণের উল্লেখিত কারণগুলি ছাড়াও জনসংখ্যা বা জনবসতির ঘনত্বেরও জলদূষণে একটা ভূমিকা রয়েছে। ব্যাপক জনসংখ্যার চাপে সীমিতস্থান সম্বলিত আবাসন অঞ্চলের বিশেষত ঃ শহরাঞ্চলের পরিকল্পিত ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার দরুণ যেখানে সেখানে ঘনবসতিপূর্ণ ঘিঞ্জি এলাকা, বস্তি এলাকা গড়ে ওঠা এবং ঐসব এলাকায় ন্যূনতম স্বাস্থ্য বিধি ব্যবস্থার অভাব, ফলে নিকটবর্তী নদীনালার জলে যথেচ্ছভাবে নোংরা, মল মূত্র ত্যাগ, শৌচক্রিয়াসম্পাদন এসবের জন্যও জল দূষিত হয়ে পড়ে। এই ধরণের দূষণের কারণটি আসলে আর্থ-সামাজিক। বর্দ্ধিত জনসংখ্যার চাপ এক্ষেত্রে একটি কারণ হলেও সেটি হল গৌণ বা পরোক্ষ কারণ, আসল কারণটি হল দারিদ্র্য, নিরুপায় অবস্থা, কিছুটা সামাজিক বোধের অভাব এবং উপযুক্ত পরিকল্পনার অভাব।

জলদূষণের ফলাফল জনস্বাস্থ্যের কিভাবে ক্ষতি করতে পারে সে সম্পর্কে সামান্য উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। জলদূষণের অন্যতর বহু কুপ্রভাব বিভিন্ন ক্ষেত্রেই পড়তে পারে। নদীনালা সমুদ্রের জল দূষিত হয়ে পড়লে জলজ জীবনের বিশেষ করে মাছেদের মারাত্মক ক্ষতি এমনকি অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে। (দেখা গেল যে প্রতি লিটার জলে যদি 1 মিলিলিটারের 100 ভাগের 1 ভাগ পরিমাণ তেল বর্তমান থাকে তাহলেই বহু ধরণের মাছই ঐ জলে মারা যেতে পারে)। এই

বিষয়টির দুটি দিক রয়েছে। প্রথমত ঃ বর্দ্ধিত জনসংখ্যার বর্দ্ধিত চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে মাছের অভাব ঘটার অর্থ একটি প্রধান খাদ্যের অভাব দেখা দেওয়া। দ্বিতীয় বিষয়টি দূষিত জলের দূষিত মাছ খাদ্য হিসেবে গৃহীত হলে জনস্বাস্থ্যের যে ক্ষতি হতে পারে সেই বিষয়টি। আবার, এই জলদূষণের মাশুল নির্দোষ জেলেদেরও দিতে হতে পারে - দূষিত জলের দূষিত মাছ বিক্রির অপরাধে (যে অপরাধের কথা তাদের না জানবার সম্ভাবনাই বেশী) তাদের শাস্তিও হতে পারে। (প্রসঙ্গত ঃ উল্লেখ্য যে পঞ্চাশের দশকে জাপানের মিনামাটা উপসাগরের তীরে জেলেদের একটি গ্রামের প্রায় 100 মানুষ উপসাগরের দূষিত জলের মাছ খেয়ে প্রাণ হারান। উপসাগরের তীরবর্তী একটি কারখানা থেকে পারদ গঠিত যৌগ উপসাগরের জলে মিশে জলকে দূষিত করেছিলো)।

বিভিন্ন উৎসের জলই যদি কোনও কারণে খুব আম্লিক হয়ে যায় (যেমন অ্যাসিড-বৃষ্টির ফলে বা সরাসরি অ্যাসিড জলে মেশায়) তবে ঐ আম্লিক জল বহুতর ক্ষতিসাধান করতে পারে। জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের ক্ষতি যেমন হতে পারে তেমনি ঐ জলের সংস্পর্শে দীর্ঘকালব্যাপী থাকবার ফলে নদীবাঁধ, সেতু ইত্যাদির ক্ষয়সাধন হতে পারে। ভরতপুর পক্ষীনিবাসের হ্রদের জল সালফিউরিক-অ্যাসিড (বাতাসে মিশ্রিত সালফার-ডাই-অক্সাইড থেকে উদ্ভূত) দ্বারা অম্লায়িত হবার ফলেই সেখানে যাযাবর পাখীদের আগমন হ্রাস পাচ্ছে বলে প্রয়াত পক্ষীবিশারদ এবং প্রকৃতিপ্রেমী সালিম আলি অভিমত দিয়েছিলেন।

কী করণীয় ঃ

জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় স্তরে কিছু কিছু পরিকল্পনা রূপায়িত হয়েছে বা হতে চলেছে। আন্তর্জাতিক সংস্থা Global Environmental Monitoring System (GEMS) এবং জাতীয় সংস্থা Monitoring of Indian national Aquative Resource, (MINARS) জলদূষণ নিয়ন্ত্রণে উল্লেখ্য ভূমিকা নিয়েছেন। 1974 সালেই ভারত সরকার "জলদূষণ প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ আইন 1974" এ পাস করান। এর পর পশ্চিমবঙ্গ সহ কয়েকটি রাজ্যে দূষণ-নিয়ন্ত্রণ পর্ষদও গঠিত হয়েছে। রাজ্যস্তরের পর্ষদগুলির সহযোগিতায় কেন্দ্রীয় পর্ষদ —Central Board for the Prevention & Control of water Population (CBPCWP) সারাদেশব্যাপী জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে কিছু ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেছেন। গঙ্গানদীর জলদূষণ নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় সরকারওগঙ্গাতীরবর্তী রাজ্যগুলির সহযোগিতায় গঙ্গা পরিকল্পনা (Ganga Action Plan) করছেন। এইসব কর্মসূচী জনসাধারণের মনে খানিকটা আশার সঞ্চার করেছে। কিন্তু কাঙ্খিত ফললাভ এখনও দূর অস্ত। ব্যাপক জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা ব্যতিরেকে কেবলমাত্র সরকারী প্রয়াসে উল্লেখযোগ্য উন্নতির আশা এক্ষেত্রে ফলবতী হতে পারে না।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে জলদূষণ নিয়ন্ত্রণের সম্ভাব্য কিছু পন্থা সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাতের প্রচেষ্টা করা যেতে পারে।

শিল্প, কলকারখানা থেকে যে জলদূষণ তার নিয়ন্ত্রণ বা প্রতিকার সম্ভব কেবল তখনই যদি কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত দূষণ-নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা গ্রহণ করেণ। সুপরিকল্পিত এবং পরিচ্ছন্ন শিল্প বা কলকারখানা কখনও দূষণের কারণ হতে পারে না। কিন্তু দূষণ নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা নিতে অতিরিক্ত অর্থ বিনিয়োগে আমাদের দেশে অধিকাংশ শিল্প-মালিকেরই অনীহা। এ ব্যাপারে দূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনে কঠোরতর আইন প্রণয়ণ এবং তার যথাযথ কঠোর প্রয়োগের ব্যবস্থা করা দরকার। শিল্প, কলকারখানায় সরকারী পরিদর্শন জোরদার এবং নিয়মিত করা জরুরী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কয়েকবছর পূর্বে নয়াদিল্লীতে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রযুক্তিবিদগণকে নিয়ে অনুষ্ঠিত আবহাওয়া ও পরিবেশ সম্পর্কিত একটি কর্মশালায় আলোচনা সূত্রে অনেকেই স্বীকার করেছিলেন যে তাঁদের প্রতিষ্ঠানে দূষণ-নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা থাকলেও কেবলমাত্র সরকারী পরিদর্শন কালেই সেগুলি চালু রাখা

হয়। অন্য সময় এগুলি চালু থাকে না। নতুন শিল্প স্থাপনের প্রারম্ভিক শর্ত হিসেবে দূষণ-নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা আবশ্যিক করতেই হবে। বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে বর্জ্যপদার্থ সদ্ব্যবহার কিভাবে করা যায় সে সম্পর্কিত উন্নত প্রযুক্তি সংগ্রহে এবং প্রয়োগে শিল্প কর্তৃপক্ষকে সরকারী তরফে যথাযথ সহায়তা প্রদান করা উচিত (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতর এ বিষয়ে উল্লেখ্য ভূমিকা নিতে পারেন)। আধুনিক উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার কল্যাণে অনেক শিল্পোন্নত দেশে আজকাল বহু শিল্প কলকারখানাতেই সত্যিকারের বর্জ্যপদার্থ থেকেও অনেক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে। কাজেই যে সব কলকারখানা জলে বর্জ্যপদার্থ নিক্ষেপ করে জল বিষিয়ে দিচ্ছে সে সব প্রতিষ্ঠানে যদি বর্জ্যপদার্থ থেকে মোটামুটি লাভজনক এমন কিছু জিনিস উদ্ধার করা সম্ভব হয় সে গুলি হয় তো জলদূষণের কারণ হতে পারে কিন্তু অন্যভাবে বেশ প্রয়োজনীয় তাহলে হয়তো কারখানা কর্তৃপক্ষ দূষণ-নিয়ন্ত্রক এমন ব্যবস্থা নিতে অরাজী হবেন না। উদাহরণস্বরূপ কৃত্রিম রেশম প্রস্তুতির কারখানা থেকে পরিত্যক্ত তরল বর্জ্যপদার্থে-প্রচুর পরিমাণে দস্তা - বা তামা - যৌগ বর্তমান থাকে। এই দস্তা - বা তামা - যৌগ জলে মিশলে জলকে দূষিত তো করবেই উপরন্তু যে পরিমাণ দস্তা বা তামা শিল্প প্রতিষ্ঠানকে যেভাবে হারাতে হয় তার পরিমাণও কম নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং জাপানে এই দস্তা বা তামাকে বিশেষ রেজিনের সাহায্যে এবং প্ল্যান্টেই ব্যবহৃত অ্যাসিডের সাহায্যে পুনরুদ্ধার করে একদিকে দূষণ-নিয়ন্ত্রণ অপরদিকে অপচয় নিবারণে প্রচেষ্টা চলেছে। আমাদের এখানে হুগলির ত্রিবেণী রেয়ন থেকে যে জলদূষণ হচ্ছে তা প্রতিরোধে এই ধরণের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

আর্থ-সামাজিক কারণ সম্ভূত স্থানীয় যে জলদূষণ তার নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন হল সামগ্রিকভাবে স্থানীয় জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, সুশিক্ষা, সামাজিক চেতনার উন্মেষ এবং সুষ্ঠু সার্বিক পরিকল্পনা। এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—তা হল সাধারণ জনগণ দূষণ নিয়ন্ত্রণে কেবলমাত্র তখনই আগ্রহী হবেন যখন তাঁদের যে সব কার্যকলাপ দূষণের কারণ হয়ে উঠছে সেগুলি সম্পাদনের বিকল্প পথের সন্ধান দেওয়া যায়। যেমন, নদীতীরবর্তী শহরের বস্তি অঞ্চলের যে সব জনগণ নদীতীরে প্রাকৃতিক ক্রিয়া সম্পাদন করেন তাঁদের ঐ ব্যাপারে নিষেধ করলে কোনই কাজ হবে না যদি না তাঁদের নিত্যক্রিয়া সম্পাদনের উপযুক্ত বিকল্প ব্যবস্থা করা যায়। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে প্রথম প্রয়োজন হল প্রতিটি বস্তিতে জনসংখ্যার অনুপাত অনুযায়ী পর্যাপ্ত সংখ্যক পাকা পায়খানা, স্নানাগার ইত্যাদির ব্যবস্থা করা—এককথায় বস্তি-উন্নয়ন।

শহরের হরেক আবর্জনাবাহী নর্দমার জল সরাসরি নদীর জলে না ফেলে পরিকল্পিত প্রাকবিধি ব্যবস্থার পরই কেবল এভাবে নদীতে মিশতে দেওয়া যেতে পারে। জমা আবর্জনা থেকে জৈব গ্যাস ইত্যাদি উৎপাদনের সম্ভাবণাও খতিয়ে দেখা যেতে পারে—আপদ সেক্ষেত্রে সম্পদে পরিণত হতে পারে।

গ্রামাঞ্চলে জলদূষণ প্রতিরোধে সর্বাগ্রে প্রয়োজন হল প্রতিটি গ্রামে যাতে নিরাপদ পাণীয় জল মেলে সেই ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা. পুরানো মজা পুকুর, বিল, ইদাঁরা এগুলির সংস্কার সাধন তাই সর্বাগ্রে জরুরী। জলের উৎসগুলি নতুন করে আর যাতে ধ্বংস না করা হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। জনসংখ্যার অনুপাত অনুযায়ী প্রতিটি গ্রামেই নলকূপ ইদাঁরা এগুলির ব্যবস্থা করতে হবে। পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা না করতে পারলে জলদূষণ-সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলেও কোনও লাভ হবে না।

চাষের ক্ষেতে কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের ব্যাপক প্রয়োগ এবং এগুলি সেচের জলে বা বৃষ্টির জলে ধৌত হয়ে সংলগ্ন নদীনালার জল কে দূষিত করলে তার নিয়ন্ত্রণে যা করণীয় তা হল সংশ্লিষ্ট কৃষকদের এ বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত করা এবং সার বা কীটনাশক যাতে যথাযথ পরিমাণে ব্যবহার করা হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে বলা। ঐসব কীটনাশক বা সার যাতে নিকটস্থ

জলের উৎসতে না মিশতে পারে সেদিকে যথাসম্ভব সচেষ্ট থাকতে পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে। বর্দ্ধিত জনসংখ্যার বর্দ্ধিত চাহিদা পূরণে কৃষিক্ষেত্রে সার এবং কীটনাশকের ব্যবহারের যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না। কাজেই ঐসব ব্যবস্থা নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। পঞ্চায়েত এবং কৃষক সংগঠনের সঙ্গে ব্যাপক আলোচনার মাধ্যমে এসব বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

জল সম্পর্কে দুটি কথা একেবারে শৈশব থেকে আমরা শুনে এসেছি। কথা দুটি হল : পৃথিবীর প্রায় তিনভাগ জল আর জলের অপর নাম জীবন।

পৃথিবীর এই যে প্রায় তিনভাগ জল তার মোট পরিমাণ প্রায় 140 কোটি ঘনকিলোমিটারের মতো হলেও এর শতকরা মাত্র 2 ভাগের মতো আমরা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করতে পারছি। অর্থাৎ এই পরিমাণ হল 2,8 কোটি ঘনকিলোমিটারের মতো! এই পরিমাণ জলও তো আর পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে সমভাবে বন্টিত নয়। কাজেই পৃথিবীর সমগ্র জনসংখ্যার বিভিন্নতর চাহিদার প্রেক্ষিতে এই পরিমাণ জল খুব বেশী নয়। এই পরিমাণ জলও যদি আমাদের অবিবেচনাপ্রসূত কাজকর্মের ফলে দূষিত হয়ে পড়ে তাহলে তার মাশুল দিতে হবে আমাদেরই।

প্রতিবছর গড়ে প্রায় 470 কিলোমিটারের মতো হরেক রকম দূষক সমন্বিত বর্জ্যপদার্থ নদী, নালা, হ্রদ ও সমুদ্রের জলে আমরা মিশিয়ে দিচ্ছি। এইসব দূষিত পদার্থ বিভিন্নরূপে শেষপর্যন্ত আবার ব্যুমেরাং হয়ে আমাদের কাছেই ফিরে আসছে। আমরা যদি এখনই সাবধান না হই তাহলে এমন একদিন আসতে পারে যখন আমাদেরও সেই Ancient Marines এর নাবিকদের মতো আক্ষেপ করতে হতে পারে "Water, water everywhere, not a drop to drink".

শব্দ দূষণ :

শব্দের দুটি রূপ আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ। মৃদু সুন্দর শব্দ যেমন সঙ্গীতের আওয়াজ। সুরেলা কণ্ঠের আবৃত্তি এসব আমাদের শ্রবণ-মনকে যেমন তৃপ্তি দেয়। তেমনি শব্দের তীক্ষ্ণতা খুব বেশী হলে, যেমন মোটরগাড়ির এয়ার-হর্ণ খুব জোরে কাছে বাজলে, আমরা যন্ত্রনা বোধ করি। শব্দদূষণ হল শব্দের এই তীক্ষ্ণতার মাত্রা একটা নির্দিষ্ট সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারটাই।

শব্দের তীক্ষ্ণতার পরিমাপ করা হয় ডেসিবেল (dB)। এককে। ন্যূনতম তীক্ষ্ণতার শব্দ যা শ্রবণযোগ্য তার মাত্রা হল 1 বেল বা 10 ডেসিবেল। দুজন ব্যক্তি ফিসফিস করে কথা বললে সেই শব্দের তীক্ষ্ণতামাত্রা মোটামুটি 30dB, আর স্বাভাবিকভাবে কথোপকথনে শব্দের মাত্রা 60 ডেসিবেলের মতো।বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) নির্দ্ধারিত শব্দের নিরাপদ তীক্ষ্ণতার মাত্রা হল 45 ডেসিবেল। 85 ডেসিবেলের চেয়ে বেশী আওয়াজের শব্দ আমাদের শারীরিক-মানসিক সুস্থতার পরিপন্থী। 130 ডেসিবেলের শব্দমাত্রা আমাদের কানে যন্ত্রণার সৃষ্টি করে এবং 130 থেকে 140 ডেসিবেলের শব্দমাত্রা আমাদের একেবারে বধির করে দিতে পারে।

আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক সভ্যতার বিশেষ করে নগর-সভ্যতার অনুষঙ্গ কয়েকটি শব্দ উৎসের তীক্ষ্ণতামাত্রা লক্ষ্য করা যেতে পারে –

উৎস	শব্দ-তীক্ষ্ণতা (ডেসিবেল এককে)
ভারী যানবাহন	100
জলের পাম্পের মোটর	90
ছোটখাটো কারখানা	90
রক-মিউজিক পপ-সঙ্গীত	100–120
অনুষ্ঠান প্যাণ্ডেলের উচ্চগ্রামে মাইক-বাজানো	100
এয়ারোপ্লেন	120
জেট-ইঞ্জিন	140

কলকাতার কয়েকটি শব্দবহুল এলাকায় ব্যস্ততার সময়ে শব্দ-তীক্ষ্মতা মাত্রা নিম্নরূপ ঃ

এলাকা	শব্দ-তীক্ষ্মতা (ডেসিবেল এককে)
বি. বা. দী বাগ	80–85
এস্‌প্ল্যানেড	75–84
পার্কস্ট্রীট	78–81
গড়িয়াহাটমোড়	80–82

কলকাতা শহরের জনসংখ্যার শতকরা প্রায় 50 ভাগই সপ্তাহে গড়ে প্রায় 40 ঘন্টা 95 ডেসিবেল শব্দ-তীক্ষ্মতার মধ্যে থাকেন বলে পরিসংখ্যাণ প্রকাশ।

উচ্চ তীক্ষ্মতার শব্দের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ থাকলে আমাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিপর্যস্ত হয়ে পড়তে পারে, আমাদের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটতে পারে। অসল ক্লান্ত, বিষন্ন বা বিরক্ত বোধ করতে পারি, মাথার যন্ত্রনা হতে পারে। আমরা সাময়িকভাবে বা চিরতরেই বধির হয়ে যেতে পারি। আমাদের কর্মদক্ষতা কমে যেতে পারে। স্নায়ুরোগে আক্রান্ত হতে পারি। হৃদয়ঘটিত ব্যাধিতেও আমরা আক্রান্ত হতে পারি। কলকাতার বিমানবন্দর সংলগ্ন অঞ্চলে পরিচালিত সমীক্ষায় প্রকাশ ঐ অঞ্চলের জনসাধারণের শতকরা প্রায় 16 জনই কানে কম শোনেন – এর জন্য বিমানের উচ্চগ্রামের শব্দের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ থাকার বিষয়টিকে অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তুলনামূলক সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে যে নিরালা গ্রামের মানুষের তুলনায় কলকোলাহল মুখরিত শহরের লোকেরা হৃদরোগ এবং মানসিকরোগে অধিকতর আক্রান্ত হন - শব্দ দূষণকে এর জন্য অন্যতম কারণ হিসাবে দায়ী করা হয়। কলকারখানায় মেসিনের কর্কশ আওয়াজের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ কর্মরতশ্রমিকদের মধ্যে শব্দদূষণের কুপ্রভাব তুলনামূলক ভাবে স্বভাবতই বেশী।

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে বিশেষ কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন জরুরী ঃ

প্রথমত ঃ এ বিষয়ে প্রচলিত আইনের কঠোর প্রয়োগ সুনিশ্চিত করা দরকার। মোটরগাড়ি, ট্রাক ইত্যাদিতে কর্কশ আওয়াজের এয়ারহর্ণ ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা জরুরী। শব্দপ্রবণ এলাকায় বিজ্ঞানসম্মতভাবে বৃক্ষ-লতা ইত্যাদি সৃজন করা দরকার যাতে শব্দ শোষণে এইসব উদ্ভিদ ভূমিকা নিতে পারে। জেনারেটার সেট ইত্যাদির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। পূজা উৎসবে বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উচ্চগ্রামে মাইক যাতে বাজানো না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, উৎসবে জোরালো আওয়াজ সৃষ্টি কারী বাজি ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে হবে। কারখানায় তীক্ষ্মআওয়াজের মধ্যে কর্মরত শ্রমিকদের অ্যাসিটোনে তেজী তুলো কানে দিয়ে কাজ করবার পরামর্শ দেওয়া যেতে প্যারে। সর্বোপরি সর্বস্তরের জনসাধারণের মধ্যে শব্দদূষণের বিপদ এবং এ বিষয়ে প্রতিকার পন্থা সম্পর্কে একটা ব্যাপক সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। অন্যথায় শব্দদূষণের বিপদ যেভাবে ঘনীভূত হচ্ছে এভাবে চলতে থাকলে প্রখ্যাত চিকিৎসক ডঃ আবীরলাল মুখোপাধ্যায়ের মতে আমাদের কলাকাতার নাম হয়তো পালটে রাখতে হবে কালাকাতা।

প্রাকৃতিক সম্পদ সমূহের অবলুপ্তির সমস্যা এবং এসবের সংরক্ষণ ঃ

প্রাকৃতিক সম্পদরাজিকে প্রধানতঃ দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথাঃ পূরনযোগ্য সম্পদ এবং অপূরনযোগ্য সম্পদ (Renewable and Irrenewable resources) জল, বাতাসের অক্সিজেন, বনসম্পদ, জৈবপদার্থ সমূহ ইত্যাদি পূরনযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ। অপরদিকে খনিজসম্পদ সমূহ হল অপূরন যোগ্য সম্পদ।

মানব-সম্পদের সুষ্ঠ বিকাশের জন্য উভয়প্রকার সম্পদেরই যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার জরুরী, বিশেষকরে গত পাঁচ দশকে প্রাকৃতিক সম্পদ ভাণ্ডারে অত্যধিক চাপ পড়ায় সম্পদ বিলুপ্তিতার সংকট বেশ ঘনীভূত। বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা মূলক অবস্থার প্রেক্ষিতে উৎপাদন ব্যবস্থার অকল্পনীয় দ্রুত প্রসার, অনেক ক্ষেত্রে সুষ্ঠ পরিকল্পনার অভাব, প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের অভাব ইত্যাদি এই সংকটকে জটিল করে তুলেছে।

বর্তমানে পৃথিবীতে যত চাষ-যোগ্য জমি আছে তারা শতকরা 70 ভাগেরও বেশি আধুনিক পদ্ধতিতে কর্ষিত হচ্ছে, পৃথিবীর নদনদীতে যে জল প্রবাহিত তার শতকরা প্রায় 10 ভাগ, বনসম্পদের শতকরা প্রায় 50 ভাগ এবং পৃথিবীর জলাশয় গুলি লভ্য মাছের শতকরা প্রায় 70 ভাগই আমরা ব্যবহার করছি। অর্থাৎ, পূরনযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের উর্ধ্বতম সীমা আমরা প্রায় স্পর্শ করতে চলেছি। পৃথিবীর সর্বত্রই ব্যবহারের চিত্রটি একরূপ নয়। কোথাও হয়তো লভ্য সম্পদের প্রায় সবটাই ব্যবহৃত হয়ে গেছে কোথাও আবার অনেক সম্পদই হয়তো বা প্রায় সম্পূর্নভাবেই অব্যবহৃত রয়ে গেছে।

অপূরনযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ সমূহের বিলুপ্তির সমস্যা নিয়েই অবশ্য বিশেষজ্ঞরা অধিকতর চিন্তিত। যে সম্পদ সম্পূর্ণ ব্যবহৃত হয়ে গেলে আর ফিরে আসবে না বা তার ফিরে আসতে কোটি কোটি বছর লেগে যাবে সেই অমূল্য সম্পদের বিলুপ্তির সমস্যা স্বভাবতই গভীর চিন্তার বিষয়। কাজেই প্রথমেই খনিজ সম্পদের সামগ্রিক অবস্থাটা একটু খতিয়ে দেখা যেতে পারে।

খনিজ সম্পদ ভাণ্ডারের অবস্থা ঃ

বর্তমানে প্রতি বছর সারা পৃথিবীতে 1 লক্ষ মিলিয়ন টনেরও বেশী বিভিন্ন ধরনের আকরিক ভূগর্ভ থেকে উত্তোলিত হচ্ছে। অনুমান করা হচ্ছে যে একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই পরিমান গিয়ে দাঁড়াবে প্রায় 6 লক্ষ মিলিয়ন টনে। এভাবে বিপুলহারে আকরিক উত্তোলনের ফলে সম্পদ ভাণ্ডারের ভবিষ্যৎ চিত্রটি ঠিক কেমন হবে বিজ্ঞানীরা হিসেব কষে সে সম্পর্কে একটা ধারনা পেতে চেষ্টা করেছেন। বর্তমানে লভ্য সম্পদের পরিমানের ভিত্তিতে কয়েকটি ধাতব সম্পদের ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের ধারনা এই রকম—

অ্যালুমিনিয়াম পৃথিবী থেকে নিঃশেষিত হয়ে যাবে আগামী 560 বছরে, লোহা আগামী 240 বছরে, টিন 25 বছরে, তামা 20 বছরে, দস্তা 15 বছরে এবং সীসা 10 বছরে।

অনেক বিশেষজ্ঞের মতে সীসা, দস্তা, টিন, সোনা, রূপা এবং প্ল্যাটিনাম এইসব ধাতুগুলির খনিজ উত্তোলন এই দশকেই বন্ধ হয়ে যাবে। নিকেল, তামা, মলিবেডেনাম 2000-2100 সাল নাগাদ এবং ম্যাঙ্গানিজ, কোবালট, অ্যালুমিনিয়াম 2100-2200 সাল নাগাদ নিঃশেষিত হয়ে যাবে। 2500 সাল নাগাদ কোনও ধাতুই আর অবশিষ্ট থাকবে না।

ভারতের খনিজ ভাণ্ডারের অবস্থাটা এই প্রেক্ষিতে একটু খতিয়ে দেখা যাক। লৌহ এবং লৌহ প্রতিম ধাতুসমূহের আকরিকে (Ferous ores) ভারত যথেষ্ট সমৃদ্ধ প্রকৃত পক্ষে লৌহ আকরিকে মোট মজুতের পরিমানের দিক থেকে ভারতের স্থান পৃথিবীতে তৃতীয়, সোভিয়েত রাশিয়া (প্রাক্তন) এবং ব্রাজিলের পরেই ভারতের স্থান। সমগ্র পৃথিবীতে লভ্য লৌহ আকরিকের প্রায় এক ষষ্ঠাংশ ভারতে বর্তমান এবং এখানকার হেমাটাইট আকরিক অত্যন্ত উন্নত মানের। তবে ননফেরাস আকরিকের ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নয় অনেক ধাতুই তাই ভারতকে বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। ভারতে কয়েকটি আকরিকের আনুমানিক মোট মজুতের পরিমান সারনীতে প্রদত্ত হলঃ

✪ সারণী

আকরিক	কোটি টন হিসেবে পরিমান
লৌহ আকরিক	19757.00
তামা আকরিক	57.60
বক্সাইট	265.37
সোনা	1.49
ক্রোমাইট	13.53
সীসা এবং দস্তা	35.85
ডলোমাইট	395.00
জিপসাম	124.86
নিকেল আকরিক	23.13

খনিজ সম্পদের চিত্রে ভারতের অবস্থা সামগ্রিকভাবে এখনই হতাশব্যঞ্জক না হলেও সমগ্র পৃথিবীর প্রেক্ষাপটেই বলা যায় খনিজ সম্পদ যে দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে আসছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই।

তবে কিছু আশার কথা এই যে বিশেষজ্ঞদের এই ধরনের পূর্ববর্তী ভবিষ্যৎবানী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সঠিক হয়নি। যেমন, 1955 সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুজন বিজ্ঞানী (W. and E. Woytinsky) তখন পর্যন্ত মজুতের পরিমান এবং মাথাপিছু ব্যবহারের হারের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎবানী করেছিলেন যে 1972 সাল নাগাদ পৃথিবীর জ্বালানী তেল ভাণ্ডার নিঃশেষিত হয়ে যাবে, সীসা এবং তামা যথাক্রমে 1983 এবং 1995 সালে নিঃশেষিত হবে। এই আশঙ্কা অমূলক বলেই পরিগনিত হয়েছে। এর কারন হল পরবর্তীকালে এসব সম্পদের নতুনতর মজুত ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও যে নতুন নতুন সম্পদ ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হবে না সেকথাও নিশ্চিত ভাবে বলা চলে না। তবুও পৃথিবীর আকার যেহেতু সীমিত এই ধরনের সম্পদ ভাণ্ডারও তাই অসীম বা অফুরন্ত নয়। কাজেই এই ধরনের সম্পদ লুপ্ত হবার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

পৃথিবীর শক্তিভাণ্ডারের দিকে এবারে একটু দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে।

আধুনিক সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শক্তির ব্যবহার ক্রমশঃ ব্যাপক থেকে ব্যপকতর হওয়ায় সমগ্র পৃথিবীতেই শক্তিসংকটের আশঙ্কা ঘনীভূত।

বর্তমানে যে পরিমানে শক্তি আমরা ব্যবহার করি তার শতকরা প্রায় 90 ভাগই লভ্য হয় জীবাশ্ম জ্বালানী, যথা কয়লা, খনিজ তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে। বাকিটা অংশত লভ্য হয় পারমানবিক জ্বালানী থেকে এবং অংশত বনজ সম্পদ থেকে। এই সব ধরনের জ্বালানীরই মূল উৎস হল সৌরশক্তি।

কঠিন জ্বালানীর তুলনায় তরল এবং গ্যাসীয় জ্বালানী ব্যবহারের দিকে ক্রমবর্ধমান প্রবনতার প্রেক্ষিতে বিশেষজ্ঞদের ধারনা 2035 সাল নাগাদ পৃথিবীর তরল এবং গ্যাসীয় জ্বালানী ভাণ্ডারের শতকরা 90 ভাগই নিঃশেষিত হয়ে যাবে। কয়লা অবশ্য এর পরও খুব বেশী হলে 150 বছর পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে। 2000 সাল নাগাদ সমগ্র পৃথিবীর জনসংখ্যা 600 কোটি ছাড়িয়ে যাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে এবং মাথাপিছু শক্তি চাহিদা যদি বর্তমান হারেও থেকে যায় তাহলেও সামগ্রিক শক্তি চাহিদা যে বিপুল পরিমান হবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

ভারতের শক্তি ভাণ্ডার এবং শক্তি চাহিদার চিত্রটির দিকে চোখ ফেরানো যাক। ভারতে কয়লার মজুতের আনুমানিক পরিমান 15600 কোটি টন। 1988-89 সালে প্রায় 5.6 কোটি টন

কয়লা উৎপাদিত হয়েছে। 2004-5 সালে বাৎসরিক কয়লা উৎপাদন প্রায় 45 কোটি টনে গিয়ে দাঁড়াবে বলে অনুমিত হয়। এই হিসেবে 3150 সাল নাগাদ বর্তমান মজুত ভাণ্ডার শেষ হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

ভারতে খনিজতেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের আনুমানিক পরিমান যথাক্রমে 58.1 কোটি টন এবং 541 বিলিয়ন ঘনমিটারের মতো (বিলিয়ন = 10^9)। 1987 সালে অশোধিত তেলের বাৎসরিক উৎপাদন ছিলো 3.20 কোটি টন এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন ছিলো 981.2 কোটি ঘনমিটার বর্তমানেই আমাদের দেশে পেট্রোলিয়াম জাত পন্যের ঘাটতি রয়ে গেছে প্রায় 1.7 কোটি টন পেট্রোলিয়াম জাত পন্য তাই বর্তমানে বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। 2004-5 সাল নাগাদ পেট্রোলিয়াম জাত পন্যের চাহিদা এখানে গিয়ে দাঁড়াবে আনুমানিক প্রায় 11.1 কোটি টনে, যেখানে অভ্যন্তরীন উৎপাদন 5.8 কোটি টনের বেশি হবে না। প্রাকৃতিক গ্যাসের ক্ষেত্রে অবশ্য অবস্থাটা এতটা হতাশব্যঞ্জক নয়, আগামী বছরগুলিতে প্রাকৃতিক গ্যাসের নতুনতর ভাণ্ডার আবিষ্কারের সম্ভাবনাও যথেষ্ট তবুও সামগ্রিক ভাবে ভবিষ্যৎ শক্তি সংকট থেকে আমরা মুক্ত নই।

প্রশ্ন হল প্রাকৃতিক সম্পদ বিলুপ্তির সংকট এর জন্য কি জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধিই একমাত্র এবং মূল কারন?

একথা অনস্বীকার্য যে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেলে বর্দ্ধিত জনসংখ্যার বর্দ্ধিত চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রাকৃতিক সম্পদ ভাণ্ডারে টান পড়তে বাধ্য কিন্তু একটু খতিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে জনসংখ্যা যদি আর নাও বৃদ্ধি পায় তবুও এই ধরনের সংকট অনিবার্য, কারন এই সম্পদ ভাণ্ডার আপাত দৃষ্টিতে বিশাল মনে হলেও অফুরন্ত নয়। একদিন এই বিশাল সম্পদ ভাণ্ডারও শেষ হয়ে যাবেই, জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি সম্পদ নিঃশেষিত হওয়ার বিষয়টিকে ত্বরান্বিত করবে এই মাত্র। সুতরাং নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমস্যাটিকে বিচার না করে কিভাবে এই সংকট কাটিয়ে ওঠা যেতে পারে সেদিকেই চিন্তা ভাবনা করাই যুক্তিযুক্ত।

সম্ভাব্য সমাধান কোন পথে ঃ

আশঙ্কা প্রকাশের সাথে সাথে কিছু আশার বানীও অবশ্য বিশেষজ্ঞরা আমাদের শুনিয়েছেন। এঁদের অনেকেরই বক্তব্য হল যেহেতু এখনও পর্যন্ত একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে ভূ-সমীক্ষা সর্বত্র করা সম্ভব হয়নি, বিশেষ করে সমুদ্র-সম্পদের বিশাল ভাণ্ডারের সামান্য অংশমাত্র বর্তমানে আমরা আবিষ্কার এবং ব্যবহার করতে সমর্থ হয়েছি। তাই এখনই নিশ্চিত ভাবে বলাচলে না যে কোন বিশেষ সম্পদ নির্দিষ্ট সময়ে নিঃশেষ হয়ে যাবেই। সম্পদের নিত্যনতুন ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয়েই চলেছে,ভবিষ্যতে উন্নততর প্রযুক্তির সুবাদে সম্পদ আহরনের ক্ষেত্রে মানুষ পৃথিবীতেই আবদ্ধ না থেকেগ্রহান্তরেও যে পাড়ি দেবে না একথাও এখনই জোর দিয়ে বলা সম্ভব নয়।

তবে কেবল অনুমানের ভিত্তিতেই বিজ্ঞানীরা বসে নেই। সংকট সমাধানে সমগ্র পৃথিবী জুড়েই বিজ্ঞানীরা ভাবনাচিন্তা করছেন। ধাতুর বিকল্প খোঁজার চেষ্টা নিরন্তর চলেছে। বর্তমানেই অনেক ক্ষেত্রে প্লাষ্টিক দ্রব্য ধাতুর বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ভবিষ্যতে উন্নততর বিকল্প উদ্ভাবিত হবে এই আশা অমূলক নয়। বর্তমান খনিজ ভাণ্ডারের দ্রুতবিলুপ্তি রোধ করতে সাধারন ভাবে কিছু সুপারিশও করা হচ্ছে।

প্রথমতঃ খনিজসম্পদের যথাযথ এবং যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। এই ধরনের সম্পদের অপচয় রোধ করা জরুরী। উপযুক্ত প্রযুক্তির সাহায্যে এই সম্পদ যথাসম্ভব বারে বারে ব্যবহার্য (recycle) করবার চেষ্টা করা দরকার। উদাহরন স্বরূপ সাধারনতন্ত্রী চীনে টুথপেস্টের টিউব শূন্য হলে ঐ টিউব ফেলে না দিয়ে এতে পুনরায় পেস্ট ভর্তি করা হয়ে থাকে। পুরানো বাতিল

মোটর গাড়ির ধাতব পদার্থ উচ্চ তাপাংকে গলিয়ে ফেলে না দিয়ে অন্য কোনও ব্যবহার উপযোগী জিনিস তৈরী করে নেওয়া যেতে পারে। আমরা জানি ফেলে দেওয়া ব্যবহৃত শিশি, বোতল, কাগজ ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ কারখানায় আবার যথাক্রমে নতুন কাঁচের জিনিস বা নতুন কাগজে রূপান্তরিত করা যায়। এভাবে অপচয় নিবারনে যথাসম্ভব সচেষ্ট হতে হবে।

শক্তি সংকটের মোকাবিলাতেও সারা পৃথিবী জুড়েই বিজ্ঞানীরা সচেষ্ট। নিউক্লীয় সংযোজন বিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে, সৌরশক্তিকে যথোপযুক্ত ভাবে ব্যবহার করে জীবরাসয়নিক প্রক্রিয়ায় জলকে বিশ্লেষন করে, হাইড্রোজেন উৎপাদন করে শক্তি সংকটের সমাধান প্রয়াস চলেছে। বিশেষজ্ঞরা আশা প্রকাশ করছেন যে আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই হয়তো শক্তির বিকল্প উৎসের সন্ধান মিলবে এবং শক্তি সংকটের সমাধান সম্ভব হবে।

তবে ইতিমধ্যেই শক্তি সংকটের আংশিক সমাধানে কিছু কিছু ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে এবং কোনও কোনও দেশে এই সব ব্যবস্থা নেওয়াও হচ্ছে। ভারতেও খানিকটা বিক্ষিপ্তভাবে এসব ব্যবস্থাদি নেওয়া হচ্ছে বা নেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে।

এসব ব্যবস্থাদির মধ্যে রয়েছে প্রথমতঃ শক্তির অযথা অপচয় রোধ, যথাযথ পরিমানে শক্তির ব্যবহার এবং অপ্রচলিত শক্তি উৎসসমূহের বেশি বেশি ব্যবহার।

পেট্রল, ডিজেল সাশ্রয় করবার জন্য কোনও কোনও দেশে (যেমন চীনে) শহরাঞ্চলে বাড়ি থেকে কর্মস্থানে যাতায়াতে বাস বা মোটরগাড়িতে না গিয়ে যথাসম্ভব হেঁটে বা সাইকেলে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। আমাদের দেশেও বিভিন্ন শহরে এই ধরনের ব্যবস্থার কথা ভাবা যেতে পারে। একটি মোটরগাড়িতে মাত্র একজন ব্যক্তি না গিয়ে অনেকে মিলে যাওয়া যায়। বৈদ্যুতিক আলো বা পাখা অপ্রয়োজনে চালু রাখা বন্ধ করতে হবে।

অপ্রচলিত শক্তির উৎস সমূহ যথাসম্ভব বেশী করে ব্যবহারে সচেষ্ট হতে হবে। এই সব উৎসগুলির মধ্যে রয়েছে জৈবগ্যাস, সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, জলশক্তি ইত্যাদি।

জৈব গ্যাস ঃ

গবাদি পশুর মল এবং মানুষেরও মল একত্রে পচিয়ে তা থেকে যে জৈব গ্যাস উৎপন্ন হয় (মূলতঃ মিথেন গ্যাস) তা জ্বালানী হিসেবে, জলের পাম্প চালাতে বা আলো জ্বালবার কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। গ্যাস ব্যবহারের পর যে অবশিষ্ট পড়ে থাকে তা উৎকৃষ্ট সার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। বিশেষতঃ গ্রামে গঞ্জে সমবায়ের মাধ্যমে এ ধরণের জৈব গ্যাস প্ল্যান্ট গড়ে তোলা যেতে পারে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে জৈবগ্যাস তৈরীর জন্য মনুষ্যমল কিন্তু বেশি পরিমাণে লভ্য হতে পারে। জ্বালানী কাঠ আবদ্ধপাত্রে পুড়িয়ে উড-গ্যাস উৎপাদিত হতে পারে এবং একই রূপে ব্যবহৃত হতে পারে। আমাদের এখানে শহরের জমা আবর্জনা, যার মধ্যে ডাবের খোলা, আনাজপাতির অংশ ইত্যাদি জৈব পদার্থ থাকে, তা থেকেও জৈব গ্যাস উৎপাদনের সুযোগ রয়েছে। 1987 সালে ভারতে মোট 8.4 লাখ পরিবারের শক্তি চাহিদা জৈব গ্যাস প্ল্যান্ট মিটিয়েছে। আরও ব্যাপকভাবে এই গ্যাস-প্লান্ট চালু করা উচিত।

সৌর—শক্তি ঃ

সমগ্র পৃথিবীতে মোট যে পরিমাণ সৌর-শক্তি লভ্য সব রকমের ব্যবস্থা সমন্বিত করেও তা শতকরা মাত্র 0.01 – 0.09 ভাগ বর্তমানে আমরা কাজে লাগাতে পারছি। ভারতে সামান্য কিছুদিন বাদ দিয়ে প্রায় সারা বছর ধরেই অকৃপণ সূর্য-কিরণ লভ্য, প্রতিবছর গড়-লভ্য সৌরশক্তির এই পরিমাণ প্রতি বর্গমিটারে প্রায় 16 কোটি কিলোওয়াট ঘণ্টা।

প্রাকৃতিক উপায়ে যে সৌরশক্তি লভ্য হয় তা ছাড়াও বিভিন্নভাবে পূরণযোগ্য এই অফুরন্ত শক্তি

ভাণ্ডারটিকে ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। সৌর-চুলা, সৌর-হিটার ইত্যাদি সরাসরি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। রাজস্থানের অনেক গ্রামে সরকারী ভর্তুকির সুবিধা দিয়ে ব্যাপকভাবে সৌরচুলা ব্যবহৃত হচ্ছে। অন্যত্রও বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভাবে এই চুলা ব্যবহারের সুযোগ নেওয়া দরকার।

আলোক-তড়িৎ কোষের (যেমন সিলিকন-কোষের) মাধ্যমে সৌরশক্তিকে তড়িৎশক্তিতে রূপান্তরিত করে জলের পাম্প চালাতে, রেডিও, টেলিভিশন চালাতে, রাস্তার আলো জ্বালাতে ব্যবহার করা যায়। এখানে সুন্দরবন অঞ্চলে এবং পুরুলিয়ার অযোধ্যাপাহাড় অঞ্চলে সোলার স্ট্রীট লাইট ব্যবহারের প্রচেষ্টা চলছে। তবে সৌরশক্তির তড়িৎশক্তিতে রূপান্তরে বিষয়টি এখনও পর্যন্ত বেশ ব্যয় সাধ্য। উন্নত গবেষণার মাধ্যমে উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে আনতে পারলেই কেবল শক্তি সমস্যা সমাধানে সৌর-শক্তি আশা জাগাতে পারে।

বায়ু—শক্তি ঃ

পূরণযোগ্য শক্তির অফুরন্ত উৎস বায়ুশক্তিকে বহু প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবহার করা হচ্ছে। দেশের যেসব অঞ্চলে বায়ুপ্রবাহের গড় গতিবেগ ঘণ্টায় প্রায় 8-10 কিলোমিটার সেসবস্থানে বায়ুশক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য বায়ুকল (windmill) স্থাপন করা যেতে পারে। সমুদ্র-তীরবর্তী অঞ্চল, পর্বতের শৃঙ্গদেশ, মুক্ত প্রান্তর, দ্বীপের অংশ – যেসবস্থানে বায়ুপ্রবাহ দুর্বার সেসব স্থানেই বায়ুশক্তি কার্যকরীভাবে ব্যবহারের সুযোগ নেওয়া যেতে পারে।

ভারতে 1987 সাল নাগাদ প্রায় 1750টি বায়ুকল পরীক্ষামূলক প্রকল্প হিসেবে স্থাপিত হয়। জাতীয়স্তরে প্রায় 40 লক্ষ একক বিদ্যুৎশক্তি সমগ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে স্থাপিত বায়ুকল থেকে ঐ সময়ে উৎপাদিত হয়েছে। বায়ুপ্রবাহ সমৃদ্ধ অঞ্চলে বায়ুশক্তির ব্যাপক ব্যবহারের যথেষ্ট সুযোগ বর্তমান। ভারত সরকারের অপ্রচলিত শক্তি-উৎস বিভাগ সারা দেশের কোথায় কোথায় এই শক্তিকে কাজে লাগানো যায় সে সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা পরিচালিত করছেন।

সমুদ্র জল—শক্তি ঃ

বিভিন্নরূপে সমুদ্র-জল-শক্তিকে ব্যবহারের সুযোগ আছে – সমুদ্রজলের তাপীয় শক্তিরূপান্তর, তরঙ্গশক্তি, জোয়ার-শক্তি।

গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে সমুদ্রের উপরিতলে জলস্তরে তাপমাত্রা 24°C থেকে 30°C এর মধ্যে থাকে, অপরপক্ষে 1-2 কিলোমিটার নীচের জলস্তরের তাপমাত্রা 4°C থেকে 10°C এর মধ্যে থাকে। জলস্তরে তাপমাত্রার এই পার্থক্যকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন সম্ভব এবং পৃথিবীর কোথাও কোথাও এভাবে শক্তি উৎপাদিত হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত অবশ্য এভাবে শক্তি উৎপাদন বেশ ব্যয়সাধ্য, তবে ভবিষ্যৎ সম্ভবনা যথেষ্ট।

সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটাকে কাজে লাগিয়েও পরীক্ষামূলকভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রাক্তন এবং ফ্রান্সে বেশ কিছুকাল ধরেই বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। সমুদ্রতরঙ্গ-শক্তিকেও এভাবে কাজে লাগানো যায়।

আমাদের দেশে সমুদ্রজল শক্তি থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন সম্ভাবনা বেশ কয়েকটি অঞ্চলে বর্তমান। এগুলি হল কাম্বে এবং কচ্ছ উপসাগরীয় অঞ্চল, সুন্দরবন অঞ্চল প্রভৃতি।

পারমানবিক—শক্তি ঃ

বিভিন্ন অপ্রচলিত শক্তি-উৎস ব্যবহারে উদ্যোগী হওয়া ছাড়াও যতদিন পর্যন্ত শক্তি-সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হচ্ছে ততদিন পারমানবিক শক্তি থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনেও আমাদের

অধিকতর গুরুত্ব দিতে হবে, কারণ ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম ইত্যাদির খনিজ যেগুলি পারমানবিক জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হয় – সেগুলি যথেষ্ট পরিমাণে আমাদের দেশে বর্তমান। অবশ্য অর্থ এবং দুর্ঘটনা সম্পর্কিত বিষয়টি বিতর্কিত বিষয়। ভাবা পরমাণু-কেন্দ্রের প্রাক্তণ অধিকর্তা **বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী ডঃ রাজা রামান্নার মতে অবশ্য পরমাণু-বিদ্যুৎ কেন্দ্র দুর্ঘটনার সম্ভবনা অন্যান্য শিল্প-কেন্দ্রের তুলনায় বেশি নয়।**

পূরণযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ বন-সম্পদ ঃ

বিশেষজ্ঞগণের মতে পরিবেশকে দুষণমুক্ত রাখা ছাড়াও বনসম্পদের সামগ্রিক ভূমিকার প্রেক্ষিতে কোনও দেশের বা অঞ্চলের মোট স্থলভাগের শতকরা প্রায় 33 ভাগ আয়তনে গাছপালা, বনভূমি থাকা প্রয়োজন। এ বিষয় আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থাটা কিরুপ?

ভারতের বনজরিপ সংস্থার (Forest Survey of India) পরিসংখ্যান অনুযায়ী সমগ্র ভারতের বনাঞ্চলের আয়তন মোট স্থলভাগের শতকরা 20-23 ভাগের মতো এবং পশ্চিমবঙ্গে এই পরিমাণ (সুন্দরবনের বনাঞ্চলকে ধরে) 13.5 ভাগের কাছাকাছি। কিন্তু কয়েকবছর আগে নভোশ্চারীদের দেওয়া তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে আসলে এই পরিমাণ যথাক্রমে শতকরা 10 এবং 8 ভাগের বেশী নয়।

প্রশ্ন হল – একদা অরণ্যশোভিত, শ্যামলিমায় ঘেরা আমাদের এদেশে বনভূমি এত দ্রুত হ্রাসপ্রাপ্ত হল কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনটি বিষয়কে মূল কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

(1) জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে বর্দ্ধিত জনসংখ্যার খাদ্যসংস্থানের জন্য কৃষিজমির আয়তন বৃদ্ধির স্বার্থে বনজঙ্গলের ব্যাপক ধ্বংসসাধন।

(2) দ্রুত শিল্পায়ন, বিপুল সংখ্যক মানুষের বাসস্থান সমস্যা মেটাবার জন্য দ্রুত নগরায়ন – এসবের জন্য নির্বিচারে বনভূমি উৎপাটন। বিশেষভাবে অনেক ক্ষেত্রেই কিছুটা অপরিকল্পিতভাবে এসব কর্মসূচী রূপায়নের দরুণ গাছপালা, বনভূমি দ্রুত উৎপাটিত হয়েছে।

(3) গাছপালা, বনভূমি সম্পর্কে জনসাধারণের সচেতনতা অভাব এবং আর্থ-সামাজিক কারণজনিত অসহায়তা এবং কিছু ব্যবসায়ীর অতি মুনাফা লোভ।

জনসংখ্যার দ্রুতবৃদ্ধির ফলে বর্দ্ধিত জনসাধারণের খাদ্য চাহিদা মেটাতে স্বভাবত:ই কৃষিজমির আয়তন বাড়াতে হয়েছে। 1951 সালে জনসংখ্যা যেখানে 38.11 কোটির মতো ছিলো সেখানে 1981 তে গিয়ে এই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় প্রায় 68.40 কোটিতে (1991 তে প্রায় 85 কোটিতে)। এর পাশাপাশি মোট কৃষিজমির পরিমাণ লক্ষণীয়। 1950তে কৃষিজমির পরিমাণ যেখানে 11.8 কোটি হেক্টারের (1 হেক্টার = 10,000 বর্গমিটার) মতো ছিল। 1980 তে সেই পরিমাণ গিয়ে দাঁড়ায় প্রায় 14.5 কোটি হেক্টারে। এই বাড়তি প্রায় 3 কোটি হেক্টার কৃষিজমির বেশী ভাগটাই মূলতঃ গ্রামীন বনভূমি, বাগিচা এবং পশুচারণভূমির ধ্বংসসাধনের মাধ্যমে লভ্য হয়েছে।

আমাদের রাজ্যে বিশেষ করে সীমান্তবর্তী জেলাগুলির বহু গ্রামেই পূর্ববঙ্গ থেকে আগত অগণিত উদ্বাস্তুর বাসস্থান এবং কৃষিজমির প্রয়োজনে বহু গ্রামীন বনভূমি পুড়িয়ে নির্মুল করে ফেলা হয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন পরিবেশ দূষিত হয়েছে. অন্যদিকে বনসম্পদ হ্রাস পেয়েছে। উত্তরবঙ্গের পার্বত্য বনভূমিরও বেশ কিছুটা ধ্বংস হয়েছে নেপাল, ভুটান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের বাসস্থান বা কৃষিজমিতে পরিবর্তিত হওয়ায়।

দ্রুত-বর্দ্ধমান বিপুলসংখ্যক মানুষের বাসস্থান সমস্যা সুরাহার সূত্রে বহু গ্রামেই বনভূমি, জলাভূমি উৎপাটিত হয়েছে। বহু গ্রামই আধাশহরে রূপান্তরিত হয়েছে, অনেক শহর কার্যতঃ প্রায় তরুহীন হয়ে পড়েছে। দ্রুত শিল্পোন্নয়নের ফলেও বনভূমি উৎপাটিত হয়েছে বহুস্থানেই। আজকের

দুর্গাপুর একসময়ে শালবনে ঘেরা গ্রামসমষ্টি ছিলো – সেখানে এখন শালবন নিঃশেষিত প্রায়। কলকাতায় এবং সন্নিহিত শিল্পাঞ্চলে এমনিতেই রাজ্যের গ্রাম-শহরের অজস্র লোক এসে এই অঞ্চলের জনঘনত্ব বাড়িয়ে তুলছেন তার উপর সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে প্রতিদিনই হাজার হাজার নরনারী এসে এখানে ভিড় করছেন – ফলে কলকাতা ও শহরতলীতে এবং সংলগ্ন শিল্পাঞ্চলে ফাঁকা জমি এবং সেই সাথে গাছপালা উধাও হয়ে চলেছে। অজস্র কৃষিজমি বাস্তুজমিতে পরিণত হয়েছে এবং হচ্ছে। বনভূমি এবং জলাভূমি নির্বিচারে এবং অবাধে উৎপাটিত হয়ে চলেছে। লবণহ্রদ-লেকটাউন এলাকায় জলাভূমির উদ্ভিদরাজি থেকে একসময়ে প্রতি মিনিটে প্রায় 77000 লিটার অক্সিজেন উৎপাদিত হয়ে এলাকার বাতাসকে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রাখত, বর্তমানে এ ধরণের অনেক জলাভূমি ভরাট করে বাড়িঘর তুলবার ফলে ঐ অক্সিজেন উৎপাদনের হার নেমে এসেছে প্রতি মিনিটে মাত্র 12000 লিটারে।

বর্দ্ধিত জনসংখ্যার বর্দ্ধিত চাহিদা মেটাতে এবং সভ্যতার দ্রুত প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে উন্নয়নের স্বার্থে প্রযুক্তির ব্যাপক প্রয়োগ অনিবার্যভাবেই ঘটে চলেছে। বিভিন্নস্থানে নতুন নতুন শিল্প, কলকারখানা গড়ে তুলতে একদিকে যেমন গাছপালা, বনভূমি উৎপাটিত হয়েছে এবং হয়ে চলেছে – অপরদিকে কোনও কোনও শিল্পে যেমন কাগজ শিল্পে, আসবাবপত্র নির্মাণ কারখানায়, বাড়িঘর নির্মাণ, কাঠের সরাসরি বিপুল ও ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে নির্বিচারে বনভূমি ধ্বংস করা হচ্ছে।

শিল্প প্রতিষ্ঠানে পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেবার কথা অধুনা বিশেষভাবে বলা হচ্ছে, অথচ ট্রাজেডী হল অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানই গড়ে তুলতে হয়েছে এবং হচ্ছে বনভূমির ধ্বংস সাধন করে। যেমন, পন্থনগর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে তরাই বনাঞ্চলের প্রায় 16000 হেক্টার বনভূমি ধ্বংস করতে হয়েছে। দুর্গাপুরের সরকারি মহাবিদ্যালয়টি স্থাপনের জন্য বিরাট শালবন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

যথেষ্ট সচেতনতার অভাব এবং আর্থ-সামাজিক কারণ-সম্পর্কিত অসহায়তার জন্য বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে অনেক দরিদ্র মানুষ গাছপালা কেটে ফেলছেন। যেমন, সুন্দরবন বা পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড় অঞ্চল জ্বালানীর প্রয়োজনে বা রুজির জন্য অনেক গরীব মানুষ বনভূমির গাছপালা কেটে ফেলছেন। তবে অনেকক্ষেত্রেই এভাবে বন ধ্বংসের পেছনে কিছু অসাধু ব্যবসায়ীর হাত বর্তমান। দরিদ্র গ্রাম্য মানুষেরা এদের ফাঁদে পা দিয়ে এই ধরণের অসামাজিক কাজে প্রবৃত্ত হচ্ছেন। এসবক্ষেত্রে আসলে মুনাফা লোটে ঐসব অসাধু ব্যসায়ীরাই, গরীব মানুষেরা গাছবিক্রির মুনাফার সামান্য অংশমাত্র পেয়ে থাকেন।

প্রকৃতপক্ষে বনভূমি উৎপাদনে পরিবেশের ভারসাম্য বা বাস্তুতন্ত্র বিনষ্ট হতে পারে, ফলে বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস পেতে পারে এবং কার্বনডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে যেতে পারে, বন্যার প্রকোপ বাড়তে পারে, ভূমিক্ষয় বৃদ্ধি পেতে পারে, মরুবিস্তার ঘটতে পারে। প্রাণী ও উদ্ভিদের অসংখ্য প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে – ফলে অনেক রোগের সৃষ্টি বা বিস্তার হতে পারে, দেশের উন্নয়ন ও অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়তে পারে। মোটের উপর ফলাফল যে সুদূরপ্রসারী হতে পারে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

প্রতিকারার্থে ব্যবস্থাদি ঃ

বনভূমির ধ্বংসসাধন রুখতে কী কর্মসূচী নেওয়া হচ্ছে এবং আরও কী কী করনীয় সে সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন।

সৌভাগ্যের বিষয় পরিবেশ সমস্যার এই বিশেষ দিকটি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার এবং অধিকাংশ রাজ্য সরকার সজাগ এবং ইতিমধ্যেই সরকারী পর্যায়ে বেশ কিছু ব্যবস্থাদি নেওয়া হয়েছে।

1972 সালে ভারত সরকারকে পরিবেশ সম্পর্কিত বিষয়ে উপদেশ দেবার জন্য National Committee on Environmental Planning and Coordination (NCPEC) গঠিত হয়। 1976 সালে সংবিধানের 42 তম সংশোধনীতে পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং বন-সম্পদ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের বিষয়টি একটি অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ঐ অধ্যায়ে একস্থানে (48A ধারায়) বলা হয় "পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে এবং দেশের অরণ্য সম্পদ ও অরণ্যপ্রাণী সংরক্ষণে রাষ্ট্র নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে"।

1985 সালে গণমন্ত্রক গঠনের মাধ্যমে পরিবেশ সম্পর্কিত সরকারী ভাবনাচিন্তার বিষয়টি বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়। পশ্চিমবঙ্গেও (অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যসহ) এই ধরণের পৃথক মন্ত্রক গঠিত হয়েছে। এছাড়া কেন্দ্রে এবং বিভিন্নরাজ্যে দুষণ-নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ গঠিত হয়েছে। পরিবেশের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় এই পর্ষদগুলি উল্লেখ্য ভূমিকা পালন করছে। পরিবেশ-সংরক্ষণ সম্পর্কিত প্রায় 30টি আইন বর্তমানে এখানে চালু আছে।

সামাজিক বনসৃজন ঃ

অরণ্য এবং অরণ্যপ্রাণী সংরক্ষণে সরকারী প্রচেষ্টায় বিশেষ করে সামাজিক বনসৃজন কর্মসূচী রূপায়নের ফলে ইতিমধ্যেই কিছু সুফল পাওয়া গেছে। 1986 সাল থেকেই সরকার সামাজিক বনসৃজন কর্মসূচীর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বনদফতরও এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন।

সামাজিক বনসৃজন এমন একটি কার্যক্রম যার উদ্দেশ্য হল সুপরিকল্পিত এবং সমষ্টিগতভাবে বৃক্ষরোপণ বনসৃজনের মাধ্যমে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশিক নিরাপত্তা বিধানে প্রয়াস বিশেষ করে গ্রামীণ দরিদ্র জনসাধারণকে এই কার্যক্রমে সর্বস্তরে জড়িয়ে নিয়ে দারিদ্রসীমার নীচে অবস্থানরত জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার কিছুটা উন্নয়ন প্রচেষ্টা।

নির্দিষ্ট গ্রামাঞ্চল বা শহ্রাঞ্চলের সামাজিক বা পরিবেশিক (বা উভয়প্রকার) প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী স্থানীয় সমাজের জনসাধারণকে জড়িত করে বিশেষ কিছু নির্দিষ্ট স্থানে গাছপালা, বনভূমি সৃজন, সেগুলির যথাযথ রক্ষনাবেক্ষণ এবং আর্থিক লাভজনকভাবে এসবের সুষ্ঠু পরিচালনা সামাজিক বনসৃজন কর্মসূচীর মধ্যে বর্তমান।

সামাজিক বনসৃজন প্রকল্পের আওতায় যেসব কর্মসূচী নেওয়া হয়ে থাকে তার কয়েকটি হল ঃ

(1) রাস্তার দুধারে, মাঠ বা ক্ষেতের চারধারে, রেললাইনের ধার বরাবর, নদী বা খালের তীর ধরে, জলাশয়ের চারধারে গাছপালা লাগানো এবং সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ।

(2) জনবসতির কাছেই অবস্থিত আংশিক ধ্বংসপ্রাপ্ত বনভূমিকে রক্ষা করে নতুনভাবে গড়ে তোলা।

(3) সরকারি খাসজমি এবং সর্বসাধারণের জন্য সংরক্ষিত জমিতে গ্রামের লোকের ব্যবহার্য জ্বালানী এবং অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য নির্দিষ্ট গাছপালার বন তৈরী করা।

(4) পশুচারণ উপযোগী তৃণভূমি গড়ে তোলা।

(5) ভূমিক্ষয় নিবারণ এবং মরুবিস্তার রোধে বিশেষ বিশেষ স্থানে (যেমন ঝড়বৃষ্টি, প্লাবন এসবে ভূমিক্ষয়ের সম্ভাবনা বেশী এবং মরুপ্রবণ এলাকায়) গাছপালা লাগানো এবং সবুজ আবেষ্টনী গড়ে তোলা।

(6) শহ্রাঞ্চলে এবং শিল্পাঞ্চলে নান্দনিক প্রয়োজনে, বায়ুদূষণ ও শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে, বৃষ্টিপাত জনিত পথক্ষয় নিবারণে বা মন্দীভূতকরণে – এসব বিভিন্ন প্রয়োজনে গাছপালা লাগানো ও সংরক্ষণ ইত্যাদি ইত্যাদি....।

সামাজিক বনসৃজন প্রকল্প সঠিকভাবে রূপায়িত করতে পারলে বিশেষতঃ গ্রামীন দরিদ্র মানুষের আর্থিক দুর্গতির কিছুটা সুরাহা হতে পারে। জ্বালানীর জন্য গ্রামের দরিদ্র মানুষকে তখন আর সংরক্ষিত বন থেকে কাঠ চুরি করতে হবে না। পালিত পশুর তৃণ-খাদ্য, গৃহ-নির্মাণের বা সাধারণ আসবাবের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠ – এসব সামাজিক বনসৃজন প্রকল্প রূপায়নের মাধ্যমেই লভ্য হতে পারে এমনকি অর্থকরীভাবে লাভজনক এমন গাছপালাও সামাজিক বনসৃজনের মাধ্যমে গড়ে তুলে গ্রামের লোকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটানো যেতে পারে। অপরদিকে ভূমিক্ষয় রোধ, নদীবাঁধ রক্ষণ, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ এসবও সামাজিক বনসৃজনের মাধ্যমে কিছুটা হলেও সম্ভব হবে। বিশেষজ্ঞগণের মতে সামাজিক বনসৃজন প্রকল্পের মাধ্যমে 2000 সাল নাগাদ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রায় 50 লক্ষ গ্রামীন লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা সম্ভব হবে।

1988 এর ডিসেম্বরে ভারত সরকার একটি সার্বিক জাতীয় অরণ্যনীতি ঘোষণা করেছেন। সরকারী প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তোলার নিরবিচ্ছিন্ন আন্দোলন যুক্ত হওয়াতে ইতিমধ্যেই কিছু সুফল মিলেছে।

1973 সালে উত্তরখণ্ডের বনভূমি বাঁচাতে চণ্ডীপ্রসাদ ভাটের নেতৃত্বে স্থানীয় "চিপকো" আন্দোলন গড়ে তুলছে সেই ধরণের আন্দোলন দিকে দিকে গড়ে তোলা দরকার। চিপকো আন্দোলনে ঠিকাদারেরা গাছ কাটতে এলে নারীপুরুষ নির্বিশেষে স্থানীয় মানুষেরা দুহাত দিয়ে গাছকে জড়িয়ে ধরে (চিপকো) ঠিকাদারের লোকদের কাট কাটতে বাধা দিয়েছিলেন।

সাম্প্রতিকতম উপগ্রহ মারফৎ সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে যে গত পাঁচ বছরে ভারতে বনাঞ্চলের সীমা অবশ্য পাঁচ শতাংশের বেশী বেড়েছে – এই তথ্য আশাব্যঞ্জক। তাহলেও আদর্শ অবস্থার ধারে কাছেও এখনও পৌঁছানো যায়নি। কাজেই নিরবিচ্ছিন্ন প্রয়াস – সরকারী বেসরকারী উভয় তরফেই – এটিকে চালিয়ে যেতে হবে।

বন্য-উদ্ভিদ এবং প্রাণী সংরক্ষণ ঃ

বন্য-প্রাণী এবং উদ্ভিদ সম্পদে আমাদের দেশ বরাবরই অত্যন্ত সমৃদ্ধ। প্রায় 1200 প্রজাতির পাখী এবং 500 প্রজাতির স্তন্যপায়ী ভারতে বর্তমান। এছাড়া অসংখ্য প্রজাতির উদ্ভিদ ভারতে রয়েছে।

বিভিন্ন কারণে বনসম্পদের ধ্বংসপ্রাপ্তির ফলে, চোরাশিকারীদের আক্রমণের দরুণ, পরিবেশ-দূষণের ফলে অনেক প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীই বিলুপ্তির সম্ভাবনায়। হাতির দাঁতের জন্য হাতি শিকার, ঘড়গের জন্য গণ্ডার শিকার, সুদৃশ্য পালকের জন্য পাখী শিকার এইসব বন্যপ্রাণীর অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলছে। ভারতীয় চিতা, একশৃঙ্গী গণ্ডার, সিকিম হরিণ – এসব প্রাণী সাম্প্রতিককালে প্রায় বিলুপ্তির পথে। 100 প্রজাতিরও বেশী বন্যপ্রাণীর আশু সংরক্ষণ জরুরী কারণ এদের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। বহু প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ-প্রজাতিও বিলুপ্তির সংকট-আবর্তে।

ওয়ার্ল্ড ওয়াচ ইনস্টিটিউটের গবেষক জন. সি. রায়ন সম্প্রতি বলেছেন ভারতে ব্যাঙের প্রজনন কমে যাওয়ার ফলে ভারত ও বাংলাদেশে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়ছে। একই কারণে মহারাষ্ট্রে ফসলের ক্ষতিকারক এক ধরণের পতঙ্গের আক্রমণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের দেশ থেকে নির্বিচারে ব্যাঙ রপ্তানির ফলে মশার উৎপাৎ যে ভয়ানক বেড়ে গেছে সে তো আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য।

উদ্ভিদ এবং প্রাণীকূলের অজস্র প্রজাতি ইতিমধ্যেই পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে গিয়েছে। বাস্তুতন্ত্রে এদের অনেকেরই ভূমিকা কী ছিলো তা অজানা থাকতেই এরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। প্রাণী এবং উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে যে ধরণের ক্ষতির সম্ভবনা সেগুলির মধ্যে রয়েছে –

(1) নান্দনিক দিক : বৈচিত্র্যপূর্ণ বিভিন্নপ্রজাতি (ফুল, পাখী, পশু) লুপ্ত হলে পৃথিবীর সৌন্দর্য্যের অনেকখানিই হারিয়ে যাবে। আমাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর কথায় "For if our beautiful animals and birds cease to exist, life will at once become dull and colourless".

(2) বাস্তুতন্ত্র (eco-system) বিপর্যস্ত হয়ে পড়তে পারে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন প্রজাতির লুপ্ত হওয়ার ফলে হয়তো এ বিষয়ে অনেকখানি ক্ষতি হয়ে গেছে। এর ফলে বিভিন্ন ধরণের বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। যেমন, আফ্রিকায় ব্যাপকভাবে বন ধ্বংস হওয়ায় সেখানকার বিষাক্ত বুনো সে--সে (Tse-Tse) মাছি জঙ্গল থেকে লোকালয়ে এসে গৃহপালিত গবাদিপশুর রোগসৃষ্টির কারণ হয়ে উঠছে। অনেক রোগ প্রতিষেধক ব্যাকটেরিয়া বিলুপ্ত হওয়ার ফলে নতুন নতুন অজানা রোগের প্রাদুর্ভাব পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা দিচ্ছে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। উদ্ভিদের বেশ কিছু প্রজাতি ধ্বংস হয়েছে বা হচ্ছে যেগুলির ঔষধি গুণ আছে।

(3) পশুপাখী নির্বিচারে হত্যা করলে অল্পদিনে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে মানুষের প্রোটিন খাদ্যসমস্যা প্রকট হয়ে উঠতে পারে।

(4) অনেক বন্য উদ্ভিদ এবং প্রাণী বহু শিল্পেরই কাঁচামালরূপে ব্যবহৃত হয়। (যেমন : বোনিসিলিয়াম-বোনিসিলিন প্রস্তুতির কাঁচামাল, সিঙ্কোনা - কুইনিন প্রস্তুতির কাঁচামাল ইত্যাদি)। কাজেই এগুলি বিলুপ্ত হলে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা।

প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের আন্তর্জাতিক সংস্থা একটি রক্তিম তথ্য পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন যাতে সেসব প্রাণীর সংখ্যা 200 এ পৌচেছে তাদের প্রায় পূর্ণ তালিকা প্রদত্ত হয়েছে। পুস্তিকার রক্তিম বর্ণের মাধ্যমে সারা বিশ্বকে সাবধানবাণী শোনানো হয়েছে "এখনই কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করুন, স্তন্যপায়ী প্রাণীসমূহের 200 প্রজাতি এবং 300 প্রজাতির পাখীর অস্তিত্ব এই মুহূর্তে বিপন্ন!" জীববিজ্ঞানীদের মতে প্রতিবছর খাদ্যের জন্য 20000 পশু হত্যা করা যেতে পারে এদের অস্তিত্ব বিপন্ন না করেই। যা থেকে প্রায় 2000 টন মাংস পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু চোরাশিকারীরা বিভিন্ন দেশে অনেক বিরল প্রজাতির প্রাণী হত্যা করেই চলেছে। আফ্রিকার কেবলমাত্র সেরেঙ্গেটি জাতীয় উদ্যানেই চোরাশিকারীরা প্রতিবছর প্রায় 15 থেকে 20 লক্ষ পশু নির্মমভাবে হত্যা করে।

এসবের প্রতিকারের জন্য বিশ্বের সর্বত্রই কিছু কিছু ব্যবস্থাদি নেওয়া হচ্ছে। ভারতেও কয়েকটি প্রাকৃতিক এলাকা নির্বাচিত করে অস্তিত্ব বিপন্ন এমন বন্য উদ্ভিদ ও প্রাণীসমূহ সংরক্ষণে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ভারতের ভৌগলিক সীমানার শতকরা প্রায় 4 ভাগ এলাকা জুড়ে বর্তমানে 67টি জাতীয় উদ্যান এবং 394 টি পাখী আলয় ছড়িয়ে আছে। এগুলির মধ্যে অরন্য, তৃণভূমি, হ্রদ, জলাভূমি, ম্যানগ্রোভ এবং সামুদ্রিক এলাকা বর্তমান। আমাদের জাতীয় প্রানী বাঘ সংরক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে ব্যঘ্রপ্রকল্পের আওতায় সারা দেশের 13 টি রাজ্যে মোট 17 টি সংরক্ষিত অরন্য গড়ে তোলা হয়েছে।

এসব অভয়ারণ্যের পরিকল্পনায় অবশ্য বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন অন্যথায় অন্যতর বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। একটি উদাহরন দেওয়া যাক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনা রাজ্যের কাইবাব মালভূমি এলাকায় হরিণ সংরক্ষণের জন্য বেশ কিছু হিংস্র পশু যেমন, নেকড়ে, পুমা (চিতাজাতীয় পশু) এগুলিকে হত্যা করে নিশ্চিহ্ন করা হল। হরিণেরা সংরক্ষিত বলে দ্রুত বাড়তে লাগলো। কিন্তু কয়েকবছরের মধ্যেই তাদের মধ্যে মড়ক লেগে হরিণের দল প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। আসলে বাস্তুতন্ত্রে উপাদানসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত জটিল। হিংস্র নেকড়ে, পুমা ইত্যাদি একটিকে হরিণদের অনিয়ন্ত্রিত সংখ্যাবৃদ্ধি রুখতে সাহায্য করেছিলো। তাদের অবর্তমানে হরিণদের সংখ্যা বিস্ফোরণে অচিরেই তাদের খাদ্যাভাব দেখা দেয়। শুধু তাই নয় হিংস্র পশুরা রোগগ্রস্ত

অসুস্থ হরিণদের খেয়ে ফেলে মড়কের হাত থেকে রক্ষা পেতে সাহায্য করতে পারত – ঐ হিংস্র পশুদের নিশ্চিহ্ন করায় হরিণদের রক্ষা করার ব্যবস্থার পরিবর্তে সর্বনাশ সাধনই করা হল।

আমাদের এখানে সুন্দরবন অঞ্চলে মাঝে মাঝেই বনের বাঘ লোকালয়ে এসে হানা দিয়ে গবাদিপশু, মানুষও হত্যা করে। অনেক বিশেষজ্ঞই মনে করেন সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা এদের লভ্য বিচরণভূমির তুলনায় অনেক বেশী হয়ে গেছে। সুতরাং অন্য অভয়ারণ্যে কিছু বাঘকে অবিলম্বে স্থানান্তরিত করা প্রয়োজন।

বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদ সংরক্ষণে নিয়মিতভাবে তাদের সংখ্যা গণনার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা থাকা দরকার। অন্যথায় তাদের সংখ্যা এবং সংরক্ষিত এলাকার অনুপাতে যথাযথ না থাকলেই বিপত্তির সম্ভবনা।

কৃষিজমিতে ব্যাপকহারে কীটনাশক ব্যবহারে উদ্ভিদ ও প্রাণীর কত প্রজাতিই যে বিলুপ্ত হয়েছে এবং হয়ে চলেছে তার হিসাব পাওয়া মুশকিল। অন্যতর পরিবেশ-দূষণ, জলদূষণ, বায়ুদূষণ, তেজস্ক্রিয়তার দূষণও উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের অনেক প্রজাতি-ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

সরকারী প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে এসব বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতা গড়ে তোলাও জরুরী। পারিবেশিক সাম্যরহস্য বুঝতে এবং পরিবেশের সঙ্গে যথাযথভাবে ক্রিয়া প্রক্রিয়া করতে জনসাধারণকে সাহায্য করা জরুরী। বিরল প্রাণী ও উদ্ভিদ সম্পর্কে মানুষের একটা দরদী সম্পর্ক গড়ে তুলতেও সচেষ্ট হতে হবে। কারণ, " The Sympathy which man feels for all living creatures is what makes him truly human".

CHAPTER- 5

Methods, Approaches and Techniques

Barnali Das

Dr. S. P. Bhattacharya

SUMMARY

There are different methods of teaching. They are lecturing, laboratory method, project method etc. Now-a-days instruction is after individualised but traditionally teaching is largely classroom instruction or a mixed method. There are three elements is teaching—teacher, students and content. In ancient time, the personality of the teacher was the chief concern in education, in mediaval time it was skill of the master that the apprentices practised and now in modern education teacher, students and curriculum are all essential, and therefore, inter-related. There are mental and intellectual differences among students. So the teaching methods/ approaches should take into consideration the mind-set of students as well as structure of the subject.

Teaching Learning Process is characterised by—

a) Curricular area Characteristics : Curricular area is not merely to gather some information, but to cultivate in the learner's mind a blue-print of action for a brighter future.

b) Instructional objectives : Instructional objectives are divided into three — (i) cognitive, (2) Affective (3) Psycho-Motor.

Bloom has categorized the cognitive objectives into knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis and evaluation.

c) Learner Characteristics : Teaching process is also dependent on learner's characteristics. Learners are lively and active, so these qualities should be utilised.

d) Learning Psychology: Learning psychology and transfer of learning should inform all teaching-learning process.

e) Instructional Resources and Organisational Support : We have to think objectives of teaching before selecting the way of teaching. Instructional environment is also a criterion of selecting a particular teaching-learning process.

Educational Psychologists have given some universal rules regarding teaching. Some are—proceed from concrete to abstract, whole Vs part method, distributed Vs massed practice and recitation during learning—

Eight approaches to instruction are presentation, demonstration, drill & practice, tutorial, game, simulation, discovery and problem-solving.

Teaching aids are arranged in a continum from concrete to econic and lastly to symbolic. Best teaching aids are both auditory and visual. Examples of A-V aids are—charts, maps, pictures, models, specimens, Over Head Projector, slide projector, tape recorder, video tape etc.

পঞ্চম অধ্যায়

শিক্ষাদানের পদ্ধতি, প্রকরণ এবং প্রযুক্তি

বর্ণালী দাস

ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

৫.০০ প্রস্তাবণা : (Introduction)

শিক্ষাপদ্ধতি মূলত : শিক্ষাদানের প্রনালী। শিক্ষাদেবার কাজ সফল করবার জন্য বহু প্রকার শিক্ষাপ্রনালী রয়েছে—যেমন বক্তৃতা পদ্ধতি, কার্যাগার (Laboratory) পদ্ধতি, প্রজেক্ট পদ্ধতি আবিষ্কার পদ্ধতি, কর্মভিত্তিক পদ্ধতি ইত্যাদি। ব্যক্তিভিত্তিক শিক্ষণ (Individualised Instruction) ও শ্রেণীভিত্তিক শিক্ষণ (Classroom Instruction) উভয় ক্ষেত্রেই এর কোন একটি বা মিশ্র পদ্ধতি অনুসৃত হয়। কোন্ পদ্ধতি কিভাবে প্রয়োগ করলে-সর্বাপেক্ষা ভাল ফল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান সেই পথই নির্দেশ করে।

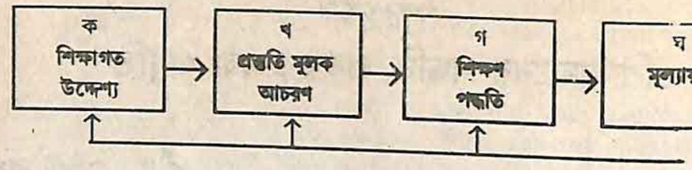
শিক্ষাকার্যের তিনটি অঙ্গ—শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও বিষয়বস্তু : প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় দেখা গিয়েছে শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষার্থী অপ্রধান অঙ্গ। প্রাচীনকালে শিক্ষকই ছিলেন শিক্ষাজগতের মধ্যমনি বা কেন্দ্রবিন্দু। ছাত্রের ব্যক্তিত্ব গঠনের গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক। শিক্ষকের আর্দশ ব্যক্তিত্ব ছিল শিষ্যের প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়। তার পরেই মধ্যযুগে এল বৃত্তিগত দক্ষতার উপর ঝোঁক। শিক্ষার আয়োজন যাকে নিয়ে সেই শিক্ষার্থী ছিল গৌন। শিক্ষক যা শেখাবেন, যতটুকু শেখাবেন, তাই শিক্ষার্থীকে শিখতে হত। এই ব্যাপারে ছাত্রের ভাল লাগা, গ্রহণ করার ক্ষমতা, তার ইচ্ছা এসব বিষয় বিবেচনার মধ্যেই আনা হত না। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক শিক্ষার্থী ও বিষয়বস্তু ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত। সকল পড়ুয়াদের মানসিক ও বৌদ্ধিক গঠন এক প্রকার নয়। তাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন পড়ুয়ার মনের প্রকৃতিকে জানা। শিক্ষার্থীকে তার শক্তি অনুসারে ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষা দিতে হবে।

৫.০১ শিক্ষণ পদ্ধতি : (Teaching-learning Process)

শিক্ষণ বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে গেলে বলা যায় যে এটি একটি জটিল প্রক্রিয়া যা কিছু জটিল মানব দ্বারা সম্পাদিত, কিছু জটিল মানুষের উদ্দেশ্যে এবং একটি জটিল পরিস্থিতিতে। ইংলিশ এণ্ড ইংলিশ (১৯৫৮) লিখেছেন "Teaching : The art of assisting another to learn. It includes the provision of information (Instruction) and of appropriate situations, conditions or activities designed to facilitate learning."

শিক্ষাদানের নক্‌শা বলতে বুঝি একটি পরিকল্পনা বা ছক যা পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রে, শিক্ষণের উপাদান তৈরীতে, শ্রেণীকক্ষে বা অন্য পরিস্থিতিতে শিক্ষণে সহায়তা করে। শিক্ষাদান পরিকল্পনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বৈজ্ঞানিকনীতি সমূহের প্রয়োগ।

গ্লেসার : প্রাথমিক শিক্ষণ নক্‌শা. (Glaser : Basic Teaching Model) রবার্ট গ্লেসার (১৯৬২) প্রাথমিক শিক্ষাদানের মনস্তত্ত্বসম্মত একটি নকশায় শিক্ষাদানের পদ্ধতিকে চারটি অংশে ভাগ করেছেন। অংশ চারটি শিক্ষাপদ্ধতির চারটি প্রধান সংঘটনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। প্রাথমিক শিক্ষাদানের নক্‌শাটিকে চিত্রের সাহায্যে নিচে ব্যাখ্যা করা হল :



ক. বাক্সে রাখা হয়েছে শিক্ষাগত সেই উদ্দেশ্য যা শিক্ষার্থী নির্ধারিত শিক্ষার শেষে উপার্জন করবে।

খ. বাক্স নির্ধারিত হয়ে প্রস্তুতি মূলক আচরণগুলির জন্য। শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞানের মান, বৌদ্ধিক বিকাশ ও ক্ষমতার স্তর, তার প্রেরনার এবং তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত হচ্ছে এই পর্যায়ে।

গ. বাক্স শিক্ষাদান পদ্ধতির স্তর। এই পর্যায় শিক্ষাদান পদ্ধতিকেই ব্যাখ্যা করে। একজন শিক্ষককে সম্পূর্ণভাবে এই বিষয়টির উপর চিন্তা ভাবনা করতে হয়। এই অংশটি যথাযোগ্য পরিচালনের ফলে শিক্ষার্থীর আচরণগত পরিবর্তন আসবে।

ঘ. বাক্স নির্ধারিত হয়েছে সম্পাদিত কার্যের মূল্যায়ণের জন্য। শিক্ষার্থী শিক্ষাগত লক্ষ্যে কতটা পৌছতে পেরেছে তা দেখা হয় পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে। সম্পাদিত কার্যের মূল্যায়ণের পরাগতি (feedback) যাবে গ, খ, এবং ক বাক্সে।

যদি দেখা যায় শিক্ষার্থীর মূল্যায়ণভিত্তিক ফল (Result) আশানুরূপ নয়, তাহলে প্রতিটি পূর্বগামী অংশে (অর্থাৎ গ, খ বা ক বাক্সে) কিছুটা অভিযোজন জরুরী হয়ে পড়ে।

এই নক্‌শাটিতে শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে না। ক্রমবর্ধমান প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগের অনুকূলে শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের তুলনায় শিক্ষকের শিক্ষণ কৌশলগত যোগ্যতাকেই বড় করে দেখা হয়।

শিক্ষামনোবিদগণ শিক্ষণের যে সর্বগ্রাহ্য নীতিগুলি নির্দেশ করেছেন সেগুলি মাথায় রেখে শিক্ষক শিক্ষাদান করবেন। ঐ নীতিগুলি হল —

(ক) মূর্ত থেকে বিমূর্ত বিষয়ের দিকে যাওয়া (Proceed from concrete to abstract)

যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, চোখে দেখে, হাতে ধরে যাকে বোঝা যায় পড়ুয়ারা প্রথমে তাকেই চিনে নেয়। তাদের চিন্তায় প্রথমে আসে মূর্ত জিনিসটি, ধীরে ধীরে তারা বিমূর্ত জিনিসের ধারণা করতে পারে। সাধারণ নিয়ম শেখানোই আমাদের লক্ষ্য। নীতিটিকে স্মরণ রেখে শিক্ষক পাঠদান করবেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় জ্যামিতির উপপাদ্য ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোন প্রমান করতে শিক্ষক প্রথমে একটি ত্রিভুজের আলাদা আলাদা তিনটি কোণ কেটে এনে পাশাপাশি বিষয়টি রেখে বোঝাবেন। পরে ইউক্লিডের ব্যাখ্যা অনুসারে বিষয়টি শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপিত করবেন।

(খ) সমগ্র বা অংশ পদ্ধতি (Whole vs Part method)

বিষয়বস্তুর অর্থ ও গুরুত্ব অনুসারে অনেক সময় শিক্ষণকে দুটি পদ্ধতিতে ভাগ করে নেওয়া হয়। পূর্ণ ও অংশ শিক্ষণ। যদি বিষয়বস্তুটি একে অপরের সন্নিবদ্ধ (Properly related) হয় তাহলে পূর্ণ শিক্ষণ বেশী কার্যকরী। বিষয়বস্তু খুব বড় হলে বা একাধিক তথ্যের সন্নিবেশ সম্পন্ন হলে অংশ শিক্ষণ অধিক কার্যকরী। শিক্ষকের এই নীতির কথা মাথায় রেখে শিক্ষাদান করতে হবে।

(গ) বন্টিত বা সমন্বিত শিক্ষণ (**Distributed vs Massed Practice**)

বন্টিত শিক্ষণ, সমন্বিত শিক্ষণ অপেক্ষা অধিক কার্যকরী। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় একটি বিষয় আয়ত্ব করার জন্য যদি ১০ ঘন্টা নির্দিষ্ট থাকে, তাহলে একেবারেই পূর্ণসময় দিলে শিক্ষার্থীদের ক্লান্তি ও বিরক্তি উৎপাদন হতে পারে। তাই বিষয়টিকে পাঁচ, তিন, দুই এই ভাবে যদি ১০ ঘন্টা হিসাবে শিক্ষক ভাগ করে নেন, তাহলে শিক্ষণ ফলপ্রসূ হবে।

(ঘ) আবৃত্তির মাধ্যমে শিক্ষণ (Recitation during learning)

আবৃত্তির মাধ্যমে শিক্ষণ অত্যন্ত কার্যকরী। আবৃত্তির মাধ্যমে বানান, গাণিতিক বিষয় ও অন্যান্য দক্ষতার উন্নতি ঘটানো যায়। আবৃত্তির মাধ্যমে উৎকর্ষতার দুটি কারণ আছে —

—একটি বিষয় শেখার সঙ্গে সঙ্গে তার পুনরাবত্তির মাধ্যমে দক্ষতা, মনোসংযোগ প্রভৃতির উন্নতি হয়।

—পড়ুয়া সেই বিষয়টিই অভ্যাস করে, যা সে শিখতে চায়।

৫.০২ শিক্ষনের উদ্দেশ্যাবলী (Instructional Objective)

শিক্ষনের উদ্দেশ্যাবলী হল শিক্ষার সামগ্রিক লক্ষ্য, যা আমরা বিভিন্ন পাঠক্রমের মাধ্যমে অর্জন করতে চাই। শিক্ষনের উদ্দেশ্যাবলীকে মূলতঃ তিনপ্রকারে ভাগ করা যায়। যথা বৌদ্ধিক (Cognitive) ভাবমূলক (affective) এবং কর্মমূলক (Psycho-motor) বৌদ্ধিক উদ্দেশ্যগুলিকে বেঞ্জামিন ব্লুম (Bloom) ছয়টি স্তরে বিভক্ত করেছেন।

সেগুলি হল ঃ

মূল্যায়ন (Evaluation)
↑
সংশ্লেষন (Synthesis)
↑
বিশ্লেষণ (Analysis)
↑
প্রয়োগ (Application)
↑
উপলব্ধি (Comprehension)
↑
জ্ঞান (Knowledge)

ভাবমূলক উদ্দেশ্যগুলি মনোভাব (attitudo) ও মূল্যবোধ (value) সম্পর্কিত।

কর্মমূলক উদ্দেশ্যগুলি হল নিপুনতা (Skill) এবং সামর্থ্য (ability) বিষয়ক।

শিক্ষণের কার্যকারিতা নির্ভর করে উদ্দেশ্য এবং পদ্ধতির মধ্যে অনুবন্ধ রচনার সামর্থ্যের উপর। এই ক্ষেত্রে বলা চলে জনসংখ্যা সংক্রান্ত পাঠদানের উদ্দেশ্য যদি বিষয়মূলক (issue) হয়, তবে আলোচনা (disscussion) প্রকৃষ্ট পদ্ধতি। জনসংখ্যাগত কোন ঘটনার সঙ্গে শিক্ষার্থীকে পরিচিত করানো যদি পাঠদানের উদ্দেশ্য হয় তবে পর্যবেক্ষণ (observation) একটি উপযুক্ত পদ্ধতি। যদি আমরা কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জনসংখ্যাগত বস্তু বা বিষয়ের অভ্যন্তরে ক্রিয়াশীল সত্তাগুলির অনুধাবন করতে চাই, তাহলে শিক্ষণের সঠিক পদ্ধতি হবে নমুনাসমীক্ষা (Survey)

৫.০৩ শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য (Learner Characteristics)

পাঠদানের পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের বৈশিষ্ট্যের উপর যথেষ্ট পরিমানে নির্ভর করে। প্রাথমিক স্তরের শিশুরা প্রাণোচ্ছল এবং কর্মচঞ্চল। ফলে তাদের পাঠদানের পদ্ধতিগুলি হবে কর্মভিত্তিক খেলা এবং চলতে চলতে আবিষ্কার করা। তাঁদের মনোযোগের ব্যাপ্তি (attention span) এবং অধ্যাবসায়ের ক্ষমতা যথেষ্ট কম। এইজন্য তাদের শিক্ষণ পদ্ধতি বৈচিত্র্যপূর্ণ হবে। মনের দিক থেকে তারা সততঃ প্রশ্নকারী, তাদের অনুসন্ধিৎসা প্রবল। ফলে অনুসন্ধানের সুযোগ দিলে তারা সহজেই শিখতে পারে। শিক্ষার্থীর আর্থ-সামাজিক অবস্থাও পাঠদানের পদ্ধতিকে অংশত প্রভাবিত করে। নিম্নবিত্ত পরিবারের শিক্ষার্থী বির্মূত চিন্তন (abstract thinking) থেকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা (direct experience) পছন্দ করে। শিক্ষার্থীর আত্মবোধ (Self esteem) যথেষ্ট না হলে, তাকে স্বয়ংসাধক (Self instructional) শিক্ষণ পদ্ধতিতে শেখানো যায় না। এই প্রসঙ্গে বেঞ্জামিন ব্লুম (Human Characteristics and School learning,1976) বইতে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

৫.০৪ শিক্ষণের প্রকরণ (Instructional Strategies)

শিক্ষণের আটটি প্রকরণের কথা শিক্ষাবিজ্ঞানে উল্লেখিত হয় ; সেগুলি সব বয়সের শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সেগুলি হল ঃ

(ক) উপস্থাপন (Presentation)
(খ) প্রতিপাদন (Demonstration)
(গ) অনুশীলন ও অভ্যাস (Drill and Practice)
(ঘ) শিক্ষক সংলগ্ন শিক্ষণ (Tutorial)
(ঙ) শিক্ষণ ক্রীড়া (Gaming)
(চ) কল্পিত অবস্থা (Simulation)
(ছ) আবিষ্কার (Discovery)
(জ) সমস্যা সমাধান (Problem Solving)

ক) উপস্থাপন (Presentation)

উপস্থাপন পদ্ধতি একটি একমুখী উৎস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। নাটক অথবা অন্যভাবে শিক্ষার্থীকে তথ্য প্রদান করা যায়। শিক্ষার্থীর তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জানা যায় না। উৎস বলতে বোঝায় পাঠ্য বই, দৃষ্টি শ্রাব্য প্রদীপন (Audio-visual Aids), চলচ্চিত্র। প্রত্যেক উৎসই এক একটি নির্দেশক। বই পড়া, গান শোনা, চলচ্চিত্র অথবা ভিডিও দেখা অথবা বক্তৃতা শোনা-এইগুলি হল উপস্থাপনের এক একটি দিক। উদাহরণ স্বরূপ একটি মিউজিয়াম ভ্রমনকালে বিভিন্ন প্রদীপন ব্যবহার করে বিষয়টি থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

খ) প্রতিপাদন (Demonstration)

শিক্ষার্থী শিক্ষণীয় বিষয়ের বাস্তব ও জীবন্ত উদাহরণ প্রত্যক্ষ করে। শিক্ষাণীয় বিষয়টি প্রযুক্তিযন্ত্রের সাহায্যে লিপিবদ্ধ করা হয়, যদি দ্বিমুখী নির্দেশক মাধ্যম হয় তাহলে শিক্ষার্থীর শিখন এবং পরাগতি (Feedback) জানা যায়। তবে সে ক্ষেত্রে একজন নির্দেশকের প্রয়োজন। শিক্ষার্থীর কাজ হল একজন নির্দেশকের মনোভাব ও মূল্যবোধকে অনুকরণ করা। প্রতিপাদনের সাহায্যে শিক্ষণীয় বিষয়কে অনেক সরলীকরণ করা হয়। যেমন তামার তারে তাপের প্রভাব।

গ) অনুশীলন এবং অভ্যাস (Drill and Practice)

এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে নতুন দক্ষতা ও পূর্ব শিক্ষণীয় বিষয় নতুন করে জানতে হয়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর পূর্বশিক্ষিত জ্ঞানের অনুশীলন হয়। শিক্ষণের ভুল ভ্রান্তি এড়ানোর জন্য ও শিক্ষণ উদ্ভূত ভ্রান্তি দূর করার জন্য অনুশীলন ও অভ্যাসের পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয়। গণিত শিক্ষার ক্ষেত্রে, বিদেশী ভাষা শিক্ষার জন্য এই পদ্ধতি সহায়ক।

ঘ) শিক্ষক সংলগ্ন শিক্ষণ (Tutorial)

এই পদ্ধতিতে একজন ব্যক্তি অথবা কমপিউটার অথবা ছাপা কোন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করে। কোন প্রশ্ন অথবা সমস্যা প্রদান করা হয়। শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া, বিশ্লেষণ, মূল্যায়ণ, (Feedback) জানা যায়। যতক্ষন না শিক্ষার্থী একটি নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী শিক্ষা লাভ করে ততক্ষণ এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করা হয়। প্রাথমিক দক্ষতার বৃদ্ধিতে এই পদ্ধতিটি উপযোগী।

ঙ) শিক্ষণ ক্রীড়া (Gaming)

এই পদ্ধতিতে একটি খেলাভিত্তিক পরিবেশের সৃষ্টি হয় যেখানে শিক্ষার্থীকে কতকগুলি নিয়ম মেনে চলতে হয়। কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যে পৌছতে হলে পরিশ্রম এবং পুনরাবৃত্তির প্রয়োজনীয়তা আছে। খেলার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীর অথবা দলবদ্ধ শিক্ষার্থীর সমস্যা সমাধানের দক্ষতা, উৎকর্ষ ও যথার্থতা সম্পর্কে জানা যায়।

চ) কল্পিত অবস্থা (Simulation)

এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী তার বাস্তব জীবনের সমতুল্য একটি পরিস্থিতির মাধ্যমে শেখে। কোন ঝুঁকি, বাড়তি উত্তেজনা থাকে না। শিক্ষার্থী মানসিক দিক থেকে অনেক হালকা বোধ করে। গবেষণাগারে পদার্থবিদ্যার পরীক্ষানিরীক্ষা হয় এই পদ্ধতিতে। অনেক সময় শিক্ষার্থী গাণিতিক মডেল তৈরী করে বিভিন্ন বিষয় বোঝার জন্য সচেষ্ট হয়।

ছ) আবিষ্কার (Discovery)

আবিষ্কার পদ্ধতি হল শিক্ষাদানের আরোহ (inductive) পদ্ধতি। প্রচেষ্টা ও ভুলের মাধ্যমে কোন সমস্যার সমাধান হয়। এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হল কোন একটি উপাদান সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা এবং তাতে অংশ গ্রহণ করা। শিক্ষার্থী তার পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে আবিষ্কার করবে। কোন তথ্য সম্বলিত বই অথবা Computer এর নির্দেশ সাহায্য করতে পারে। শিক্ষণের মাধ্যমগুলি আবিষ্কার বা অনুসন্ধানে সহায়তা করে। পদার্থ বিজ্ঞানের তথ্য আবিষ্কারে চলচ্চিত্রের ব্যবহার করা হয়।

জ) সমস্যা সমাধান (Problem Solving)

এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী তার পূর্ব অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাহায্যে বাস্তব সমস্যার সমাধান করে, সমস্যাটি বিশ্লেষণ করেও নতুন ভাবনাচিন্তা করে সমাধানের পথ উদ্ভাবন করে। তার ফলে কোন বিষয় বোঝার ক্ষেত্রে উৎকর্ষের সর্বাধিক মানে পৌঁছায়।

পাঠ ঠিকভাবে পরিচালনার জন্য শিক্ষকদের তিনটি বিষয়ের বিশেষ জ্ঞান দরকার। এগুলি হল–

(ক) শিক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণ (Teaching aids)

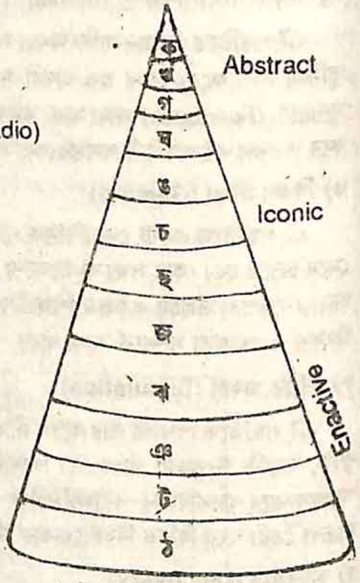
(খ) উপযুক্ত প্রশ্ন নির্বাচনের কৌশল ও আর্দশ প্রশ্নের স্বরূপ (Art of Questioning)

(গ) বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে সেটি সঠিক ভাবে ছাত্রদের নিকট উপস্থাপিত করা (Method of Correlations)

পাঠদানের আধুনিক মতবাদের প্রবক্তা ব্রুনার (Bruner) বলেন শিক্ষার্থীকে পাঠদান করতে হলে মূর্ত-বিমূর্ত মাত্রায় (concrete abstruct continum) প্রথমে শিক্ষার্থীর বাস্তব অভিজ্ঞতা, পরে প্রতিমূর্তিরূপে (econic) এবং সবশেষে ঐ অভিজ্ঞতাকে সংকেতরূপে (symbolic) পড়ুয়ার মনে গেঁথে দিতে হবে।

ডেলের (Dale's) অভিজ্ঞতার শঙ্কুতে শিক্ষণ প্রদীপনগুলিকে মূর্ত-বিমূর্ত মাত্রায় বিন্যস্ত করা হয়েছে। এগুলি হল–

(ক) ভাষাগত সংকেত (verbal Symbal)
(খ) দৃশ্য সংকেত (Visual Symbal)
(গ) গ্রামোফোন রেকর্ড, বেতার (Recordings, Radio)
(ঘ) স্থিরচিত্র (Still Picture)
(ঙ) চলচ্চিত্র (Motion Picture)
(চ) দূরদর্শন (Television)
(ছ) প্রদর্শন (Exhibit)
(জ) ক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ (Field Observation)
(ঝ) প্রতিপাদন (Demonstration)
(ঞ) নাটকাভিনয় ভিত্তিক অভিজ্ঞতা (Dramatised experiences)
(ট) প্রতিরূপ (Contrived experiences)
(ঠ) প্রত্যক্ষ দর্শন (Direct experience)



ডেলের অভিজ্ঞতার শঙ্কু (Dale's core of Experience)

৫.০৫ শিক্ষণ প্রদীপন **(discussion)**

সাধারণত দুই শ্রেণীর উপকরণ শ্রেণীকক্ষে ব্যবহার করা হয়। এই দুটি হল দৃশ্য (visual) ও শ্রাব্য (audio) প্রদীপন। শ্রেণীকক্ষে visual aids অর্থাৎ দৃষ্টিনির্ভর উপকরণই আমরা বেশী ব্যবহার করি।

ক. দৃষ্টিনির্ভর উপকরণ ঃ

যে উপকরণ গুলি শিক্ষার্থীরা নিজেরা দেখা বা পর্যবেক্ষণ করে নতুন বিষয় সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করে, তাদের দৃষ্টি নির্ভর উপকরণ বলে। উপকরণগুলিকে সাধারণত নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা– মডেল, ছবি, ম্যাপ, চার্ট, রেখাচিত্র, ব্ল্যাকবোর্ড, বুলেটিন বোর্ড, ফানেল বোর্ড, পুস্তক এবং কোন বস্তুর নমুনা।

খ. শ্রুতিনির্ভর উপকরণ ঃ

যে উপকরণগুলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজেরা শুনে নতুন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে তাদের শ্রুতিনির্ভর উপকরণ বলে। শ্রুতিনির্ভর উপকরণগুলির মধ্যে পড়ে– গ্রামোফোন, রেডিও, এবং টেপরেকর্ডার।

গ. দৃশ্য-শ্রাব্য প্রদীপন ঃ

যে সকল উপকরণে একত্রযোগে শ্রবণ ও দৃষ্টি এই উভয় ইন্দ্রিয়ের সাহায্য নেওয়া হয় তাকে বলা হয় দৃশ্য-শ্রাব্য উপকরণ বা প্রদীপন। যথা– টেলিভিশন ও সিনেমা।

৫.০৬ উপসংহার ঃ

এই অধ্যায়ে আমরা জনসংখ্যা শিক্ষাকে বিদ্যালয়ের প্রতিটি পাঠ্যবিষয়ে অর্ন্তভুক্ত করে শেখানোর কতগুলি নীতি নির্দ্দেশ করেছি যা মেনে শিক্ষকগণ বিদ্যালয়ে শিক্ষণকাজে রত হবেন। প্রথমতঃ রচনার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে জনসংখ্যা শিক্ষাকে আলাদা কোন বিশেষ বিষয় হিসেবে না ভেবে অন্যান্য বিষয়ের, যা শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত তার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। জনসংখ্যাকে সমস্যা হিসেবে না দেখে মানবসম্পদ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়ের ভূমিকা আছে। পাঠক্রমের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শিক্ষাদান ক্রিয়া হবে। শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্যের বিষয়টিও শিক্ষকের বিবেচনায় থাকবে। শিক্ষার্থীর কর্মোদ্যম, প্রাণশক্তিকে কাজে লাগানোর দায়িত্ব শিক্ষকের।

আমরা দেখেছি কেবলমাত্র মৌখিক শিক্ষা অনেক সময় যান্ত্রিক হয়ে যায়। তাই শ্রেণীকক্ষে নানা প্রকার দৃশ্য-শ্রাব্য প্রদীপন ব্যবহার করতে হবে। বিভিন্ন মনোবৈজ্ঞানিকের মতে দর্শন মাধ্যমের ব্যবহারের ফলে শিক্ষার্থীর শিক্ষা অধিক কার্যকরী হয়। তাই বিভিন্ন প্রদীপন যেমন ম্যাপ ও চার্টের ব্যবহার, ছবি প্রদর্শন ইত্যাদি শিক্ষার্থীর কাছে অত্যন্ত আর্কষণীয়।

বর্তমানে শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যায় আরো আর্কষণীয় মাধ্যম ব্যবহারের সুযোগ আছে। তাই টেপ রেকর্ডার, টেলিভিশান ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষাকে আর্কষণীয় করা হচ্ছে।

বিদ্যালয় স্তরে বিভিন্ন বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করে জনসংখ্যা শিক্ষা শেখাবার যেসব পদ্ধতি, প্রকরণ, প্রকৌশলের সাহায্য নিতে পারা যায়, তাদের মধ্যে শিক্ষাগত প্রযুক্তিবিদ্যার (Educational Technology) ভূমিকা আগামী দিনে ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী হবে।

CHAPTER–6

Role of Family, Community, School and Mass - Media in Population Education

Dr. Siba Prasad Bhattacharya

SUMMARY

Population Education (PE) aims at developing the awarness, knowledge, understanding, skill of the students about the nature, dynamic and resourcefulness of population of the country. Physical resources and population are two engines of national development. Population Education should therefore be a core element (like science, secularism, humanism etc.) in the subjects taught in formal and non-formal education. It should also be a key element of the information transmisson through informal educative/socializing agencies like family, community and the mass-media.

Parents play a crucial role in socializing / educating a child. A child acquires instrumental and emotional learning through the family and developsmultiple role relations. In India joint families are rapidly breaking into conjugal families by the process of modernization i.e. industrialization and urbanization. But attitudinal modernity lags far behind in family education. Parents do not adhere to small family norm to provide children enough nutrition adequate health-care and sound education. Also they have a bias against the female child. Parents also do not teach the children about sex and family education and need to live a quality life.

A community denotes that its members " live together in such a way that they share not this or that particular interest but the basic conditions of common life ......" A child develops a feeling of belonging together interacting with other members of the community in which he / she lives. Members of a community have some common characteristics like speech, manners and customs. The community imperceptibly induces such characteristics into the younger generation. But time brings in changes that affect the community. While the younger genaration rapidly changes their characteristics in conformity with the demands of time, the older people cling to past, absolate knowledge, attitude and values. This gives rise to inter-generational conflicts. This conflict is acute about the concept of population. Old people consider birth and death a concern of fate, a son a blessing of God for virtuous deeds in previous life. The modern population science on the other hand teaches that life can be planned; male and female are equal asrevealed in Nature. A healthy, educated person, male or female, is the wealth of the community;such new ideas

need propagation through clubs and social groupings. Educational tours expose small groups of a community to other communities living in different physical or social environments.

Majority of the children and youth now undergo schooling. Schooling enables the young to acquire knowledge and skills for living a complete life in family and socity as a working unit. School learning helps the young to obtain their basic needs, which in turn would enable them to develop self-esteem. Education in a developing country like India is directly linked with economic growth, technological development and social equality. A good library in school is an never-ending source of knowledge for personal development in the spheres of group living, work and leisure. The purpose of schooling is to develop a conscious, critical and creative mind.

Mass media is primarily an informal agency of education. It is now increasingly used as the prime agency of non-formal education. Newspaper, cinema, radio and television are the modern mass media. Newspaper caters news of the world; it also helps to develop attitudes and values. It mirrors the political, economic and social conditions of a nation. Likewise radio, television and cinema have profound influence on the minds of the audience. Massmedia extends the senses of a person. Now it also causes extension of individual's life, house hold and culture. These media are magic multipliers of common man's knowledge, skills and attitudes as regards population and its development.

Media should play Friere's "conscientization" role to help the million to liberate themselves from oppression, poverty and hunger.

জনসংখ্যা শিক্ষায় পরিবার, সম্প্রদায় বিদ্যালয় এবং গণমাধ্যমের ভূমিকা

ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য

১) উপস্থাপনা ঃ আজকের পৃথিবীতে অনেক দেশেই জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি অন্যতম প্রধান সমস্যা। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলিতেই এই সমস্যা আরও প্রকট। এই ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যাকে জনসম্পদ বা মানব-সম্পদে পরিণত করা এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখাই আমাদের প্রধানতম কর্তব্য। বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যেখানে সমস্যা আছে সেখানে সমাধানও আছে। গঠনমুখী চিন্তাধারা নিয়ে বিশ্লেষণ করলে জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়। এই সমাধানের প্রশ্নে জনসংখ্যা শিক্ষা বলতে বোঝায় পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যার ভারসাম্য রক্ষা করা এবং জনজীবনের মানের উন্নতি ঘটানো।

ক) জনসংখ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্য ঃ জনসংখ্যা শিক্ষার লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীকে জ্ঞান, দক্ষতা, আচার আচরণ ও মূল্যবোধের শিক্ষার্জনে সাহায্য করা যাতে জনসংখ্যা পরিস্থিতির বিবর্তন সম্পর্কে সে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারে এবং যে-সব কারণের জন্য পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন হয়েছে তা-ও জানতে পারে। স্বদেশ তথা বহির্বিশ্বের বর্তমান ও ভবিষ্যত পরিবেশের ওপর জনসংখ্যার প্রভাব কীরূপ তা শিক্ষার্থীর জানা প্রয়োজন। আর এই জানার মধ্য দিয়েই জনসংখ্যা শিক্ষা তাকে ভবিষ্যতে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক দায়িত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি নেওয়ার জন্য বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি, জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করবে। ভবিষ্যত জনমানসে তৈরী হবে এমন এক শিক্ষা সচেতনতা যা আজকের এই প্রকট জনসংখ্যা সমস্যার সমাধানে সফল হবে।

খ) জনসংখ্যা শিক্ষার প্রকৃতি ও ক্ষেত্র ঃ এইসব উদ্দেশ্য সাধনের গুরুত্ব উপলব্ধি করেই আধুনিক শিক্ষাবিদগণ জনসংখ্যাশিক্ষাকে শুধুমাত্র পরিবার পরিকল্পনা বা জন্মনিয়ন্ত্রনের ধারণার মধ্যেই সীমিত না রেখে এর পরিধির মধ্যে মানব-সম্পদ বৃদ্ধি ও রক্ষণাবেক্ষনের অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ধারণাকে অন্তর্ভুক্তির কথা বলছেন। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, অনিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনের পথে বাধা সৃষ্টি করে ঠিকই, কিন্তু সংখ্যাবৃদ্ধির স্বাভাবিক হার জাতীয় উন্নতিতে সহায়করূপেই কাজ করতে পারে সুপরিকল্পিত অর্থনীতির নির্ধারিত পথে। আসলে পরিবেশিক সম্পদের সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অর্থ ও সম্পদের অসমবন্টন, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অন্যান্য বাধাবিপত্তি সমূহই জনসংখ্যাবৃদ্ধির সমস্যাটিকে আরও প্রকট করে তোলে এবং ফলস্বরূপ জনজীবনের মান হ্রাস পায়।

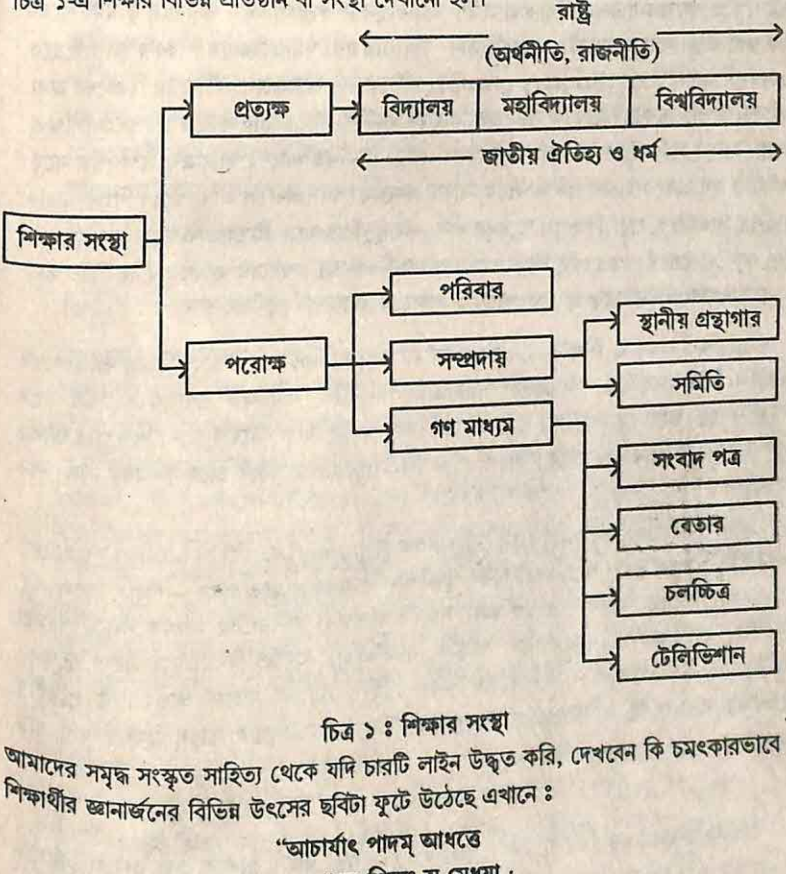
পূর্বে অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে মূলধনের সাধারণ ধারণাটি বস্তুগত বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে অর্থনীতি তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীরা দেশের সঞ্চিত মূলধনের মধ্যে শারীরিক মূলধনকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। শারীরিক মূলধন, কৃষি, শিল্প ইত্যাদি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন জ্ঞানান্বেষায় বিশেষ ভূমিকা নেয়। উদাহরণস্বরূপ আধুনিক ইলেকট্রনিক মাধ্যমে শিক্ষার অগ্রগতি, আধুনিক জনসংযোগ মাধ্যম এবং উন্নত বীজ ব্যবহারের পদ্ধতি ইত্যাদি। গুণগত পরিবর্ত্তনের ক্ষেত্রে শারীরিক মূলধনের বিশেষ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। জনসংখ্যার মান দুটি মানসিক ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে – জন্মগত ক্ষমতা ও অর্জিত ক্ষমতা। একটি বৃহৎ জনসংখ্যার ক্ষেত্রে শিক্ষাই হল একমাত্র অস্ত্র যার সাহায্যে ব্যক্তিমানুষের অর্জিত ক্ষমতাকে পরিমার্জিত ও বহুমুখী করানো

যায়। যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যার অর্জিত দক্ষতা অনেক বেশী বহুমুখী এবং তাকে মূলধন হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

এই কারণেই নতুন প্রজন্মকে শিক্ষা দেওয়া উচিত মানব-সম্পদ প্রয়োগের দিকে যথাযথ দৃষ্টি রেখে, যা তাদের ভবিষ্যতে একদিন বিশিষ্টভাবে পুরস্কৃত করবে ; তখন দেশ স্বাভাবিক ভাবেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্থায়িত্ব, মর্য্যাদা ও উন্নতি লাভ করবে। প্রথাভুক্ত বা প্রথা-বহির্ভূত সকল শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেই এই জনসংখ্যা-শিক্ষার ধারণাকে মূল শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর মধ্যে যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। আর এই প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করেই আজকাল উন্নতশীল দেশগুলি জনসংখ্যা শিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য নানাধরণের প্রকল্প গ্রহণ করছে। শ্রীলঙ্কায় শ্রমিকদের জন্য পরিবার পরিকল্পনা শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

সমাজের বিবর্তণের সঙ্গে শিক্ষাসংস্থারও বিবর্তন হয়েছে ; গোষ্ঠীগত পরিবার থেকে মন্দির-মসজিদ, তারপর বিদ্যালয় এবং বর্তমানে সংলগ্ন হয়েছে আধুনিক গণমাধ্যম শিক্ষার প্রতিষ্ঠানিক বিবর্তণের স্রোতে।

চিত্র ১-এ শিক্ষার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা দেখানো হল।



চিত্র ১ : শিক্ষার সংস্থা

আমাদের সমৃদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য থেকে যদি চারটি লাইন উদ্ধৃত করি, দেখবেন কি চমৎকারভাবে শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জনের বিভিন্ন উৎসের ছবিটা ফুটে উঠেছে এখানে :

"আচার্যাৎ পাদম্ আধত্তে
পাদম্ শিষ্যঃ স্ব-মেধয়া ;
পাদম্ স-ব্রহ্মচারিভ্যঃ
পাদম্ কালক্রমেণ চ"—

একজন 'ব্রহ্মচারী' অর্থাৎ শিক্ষার্থী তার জ্ঞানের এক-চতুর্থাংশ পায় তার 'আচার্য' অর্থাৎ শিক্ষকের কাছ থেকে, এক-চতুর্থাংশ সে অর্জন করে আপন বুদ্ধি ও স্বকীয়তায়। আর এক-চতুর্থাংশে সে লাভ করে অন্যান্য ব্রহ্মচারীদের সাথে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে, আর অবশিষ্ট অংশ তাকে যুগিয়ে দেয় স্বয়ং সময় (তার সমগ্র জীবন ও কর্মধারার মাধ্যমে)।

২) শিক্ষার প্রতিষ্ঠানসমূহ ঃ

ক) পরিবারের ভূমিকা ঃ আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থাতেও জনসংখ্যা—শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত ঘটানোর নানারকম প্রয়াস চলছে। প্রাচীনকাল থেকে আমাদের সমাজে যে বিবর্তন ঘটছে সেই বিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থারও বিবর্তন হয়েছে। সমাজজীবনের প্রয়োজনেই শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রন করা হয়। এই নিয়ন্ত্রনের মাত্রার উপর নির্ভর করে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থাকে তিনটি ধরণে বা শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। ক) প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থা **(Formal Education)** খ) প্রথা বহির্ভুত শিক্ষা **(Non Formal Education)** এবং গ) অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা (Informal Education) এই তিন ধরণের শিক্ষায় যে প্রতিষ্ঠান ও মাধ্যমগুলি বিশেষ ভূমিকা পালন করে আগামীদিনগুলিতে জনসংখ্যা শিক্ষা সম্প্রসারণেও সেগুলির বিশেষ দায়িত্ব পালন করতে হবে। এই বিশেষ শিক্ষাপ্রদানে প্রতিষ্ঠান ও মাধ্যমগুলির কী করা উচিত সেই সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান পরিবারে ভূমিকা দিয়েই শুরু করা যাক। সমাজের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান হল পরিবার। সমাজবিজ্ঞানে পরিবার হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক দল **(Primary group)**। জীবনধারণ-জীবনযাপন-জীবনের বিকাশের জন্য পরিবার অত্যাবশ্যকীয়। প্রত্যেক সমাজের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে তার নবতম সদস্যকে শিক্ষিত করার জন্য। পারিবারিক পরিবেশেই শিশুরা প্রথম বিভিন্ন ধরণের সামাজিক সম্পর্কের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং সমাজজীবন সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ সে লাভ করে। শিশুর নানা-ধরণের সামাজিক সত্বা বিকাশলাভ করে এবং সহানুভূতির সঙ্গে কিভাবে অন্যের সঙ্গে মিশতে হয় তা সে শেখে। আর এই শিক্ষা স্বভাবতই অনিয়ন্ত্রিত। তাদের ভাবগত এবং নীতি তথা মূল্যবোধগত জীবন গড়ে তুলতে পরিবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

সামাজিকীকরণ ও শিক্ষার মাধ্যমে, অন্যান্য মানুযের আচরণবিধি এবং নিজস্ব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিশু এবং কৈশোরপ্রাপ্তেরা সামাজিক রীতিনীতি, সামাজিক গুণাগুণ প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়। তারা যে জ্ঞানলাভ করে তা তাদের প্রাপ্তবয়সের পথনির্দেশ করে। শিশু তার জীবন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করে। কারণ — দৈনন্দিন পারিবারিক জীবন তাকে সর্বাধিক শিক্ষা দান করে।

পরিবারের কোন সার্বজনীন গঠন নেই। একক **(Nuclear)** এবং যৌথ **(Joint)** দুই ধরণের পরিবারই সমাজে দেখা যায়। পারিবারিক বন্ধনগুলি নানাপ্রকার হতে পারে — বিবাহ, ভালবাসা, স্নেহ—মায়া—মমতা অথবা আর্থিক এবং সামাজিক বন্ধন। পরিবারের সম্পর্ক বলতে আমরা নৈতিক, মানসিক, অর্থনৈতিক, ধর্ম, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক, প্রভৃতি বিষয়গুলির একটা সম্মেলন বুঝি। এই উপাদানগুলি ব্যক্তিমানুষের বিবিধ চাহিদা মেটাতে সাহায্য করে। কিন্তু পৃথিবীর বেশীরভাগ অংশেই পরিবারের গঠন পরিবর্তনশীল। এর অন্যতম কারণ হিসাবে বলা যায় আধুনিকতা **(Modernization)**।

শিক্ষার মাধ্যমে আধুনিকতা আসে, আবার আধুনিকতা বজায় রাখতে এবং তার পরিব্যপনে প্রধান ধারক ও বাহক। আধুনিকতার মৌল লক্ষণ হল শিল্পসংগঠন **(Industrialization)** এবং নগরায়ণ **(urbanization)**। আধুনিকতার প্রভাবে এ শতাব্দীতে যৌথপরিবার সংখ্যার হ্রাস

পেয়ে, একক পরিবার বেশীসংখ্যায় গড়ে উঠছে। একক পরিবারে পিতামাতা দু'একটি শিশুসহ বসবাস করে। পরিবারের আয়ের উৎস হল পিতা / মাতা বা উভয়ের উৎপাদন দক্ষতা, যা শিক্ষা এবং কৃৎকৌশলের উপর ভিত্তি করে গঠিত।

পারিবারিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মা, বাবার গুরুত্ব অপরিসীম। শিশু পরিবারের মধ্যে বসবাস করাকালীন সময়ে বাবা মা ও অন্যান্য বয়স্কদের দ্বারা প্রভাবিত হয় আর তার ফলে সে নানা ধরণের আচরণ আয়ত্ব করে। এখানেই শিশুরা জীবণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় অবশ্য সম্পাদনীয় আচরণগুলি আয়ত্ব, করে থাকে। আর এই শিক্ষা সে পায় সম্পূর্ণ স্বাভাবিক পরিবেশে জীবন যাপনের প্রক্রিয়ার অনুষঙ্গ হিসেবে। পারিবারিক শিক্ষা বলতে বোঝায় যে শিক্ষা বাঁচতে সহায়তা করে, যে শিক্ষা পরিবার এবং সমাজের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলে, এবং ব্যক্তিগত উন্নতিসাধনে সহায়তা করে। এই পরিবেশে কেবলমাত্র কিছু মূল্যবোধ বা তথ্যের আদানপ্রদান হয় না। সেইসঙ্গে একজন মানুষ নিজেকে চেনে ও যে সমাজে বাস করে তার সম্পর্কে চিন্তা করে। নিজের মূল্যবোধগুলো যাচাই করে নেয় এবং নিজের জীবন সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত নেবার আগে প্রতিটি তথ্য সুপ্রযুক্ত করে।

শৈশবের পরবর্তী পর্যায় অর্থাৎ বয়ঃসন্ধি প্রাপ্ত কিশোর-কিশোরীদের ক্ষেত্রে পরিবাবের প্রভাব আরও বেশী। পরিবর্তনশীল সমাজে বর্তমানে কিশোর-কিশোরীরা অনেক বেশী নিত্যনতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয় যা হয়তো তাদের পূর্বপুরুষদের ক্ষেত্রে ঘটেনি। তারা অনেক বেশী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাদের প্রতিটি কাজকর্মের পেছনে ঝুঁকি নিয়ে, নিজের স্বাতন্ত্র বজায় রেখে কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহন করে এবং এটা করে যথাসম্ভব অন্যের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর না করে। অধিকাংশই স্বপ্ন দেখে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের, যা তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপুষ্ট সিদ্ধান্তের ফল। আবার অনেকের ক্ষেত্রে সেই সমস্ত সিদ্ধান্ত অনেক সময় নৈরাশ্যের বা আত্মহনন সৃষ্টি করে ।

জনসংখ্যা শিক্ষাঃ বা মানব-সম্পদ বিকাশের ক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধি প্রাপ্ত কিশোর-কিশোরীদের যথেষ্ট ভূমিকা আছে—দেশের ক্রমর্ধমান জনসংখ্যার অন্তর্ভূক্ত তারা। তাই দেশের উন্নতির স্বার্থে কিভাবে অংশগ্রহণ করা যায় তাদের চিন্তাভাবনা ও সিদ্ধান্ত গুলিতে প্রতিফলিত হবে।

এছাড়া পারিবেশিক কারণে গ্রাম ও শহরে শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। জনসংখ্যা শিক্ষা সম্পর্কে গ্রামীন ও শহরে দৃষ্টি ভঙ্গী অনেক ক্ষেত্রে পৃথক। যেমন একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি বোঝা যায়। কৃষক পরিবারে এখনও পুরুষ সদস্যদের মূল্যবান বলে মনে করা হয় কারণ পুরুষের সংখ্যা যত বেশী হবে কাজের হাতও বৃদ্ধি পাবে। দুর্ভাগ্যের কথা কৃষিকাজে বীজ বপন, শস্য ঝাড়া সংরক্ষণ ইত্যাদিতে মহিলারা যে প্রত্যক্ষ অংশ নেয় তা গৌণ বলে এখনো গন্য হয়। সেক্ষেত্রে শহরের বাসিন্দাদের কাছে এই ধারনার পরিবর্তন ঘটেছে। পরিবারেরঃ সদস্যদের কিভাবে শিক্ষা বৃত্তিগত দক্ষতা এবং আধুনিক মননে সুযোগ্য নাগরিক করে তোলা যায়, সেই চিন্তার প্রতিফলন দেখা যায় শহরেরছোট স্বামী স্ত্রী নিয়ে গড়া (Conjugal) পরিবারগুলির মধ্যে। এসব পরিবারে পুত্রসন্তান ও কন্যা সন্তানকে প্রায় সমান সুযোগ দেওয়া হয়। পারিবারিক শিক্ষার সঙ্গে পরিবার নিয়ন্ত্রনের শিক্ষাকে অনেকসময় অভিন্ন মনে করা হয়।

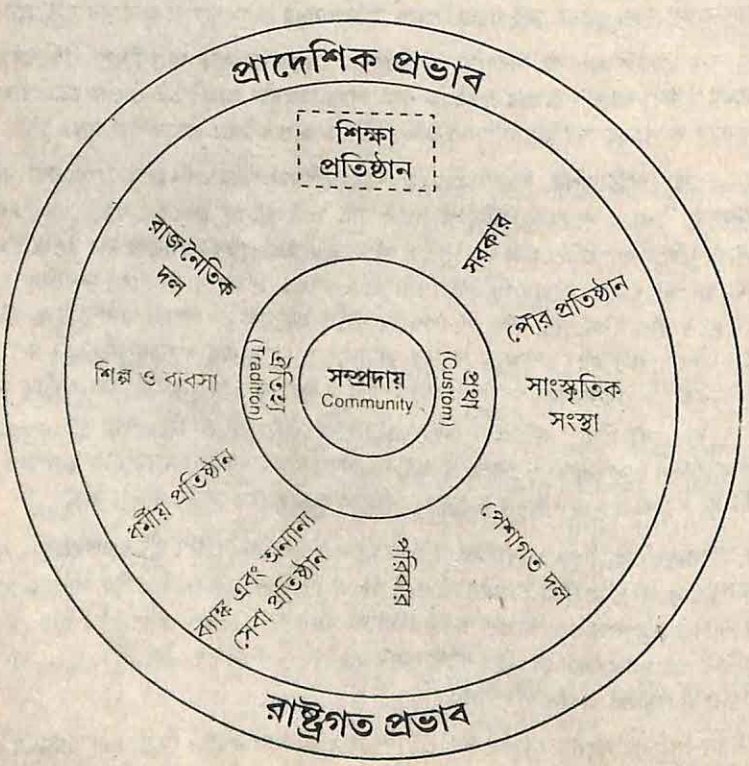
ভারতবর্ষে এই বিপুল জনসংখ্যার অন্যতম প্রধান কারন হিসেবে বলা যায় বাল্যবিবাহ। যদিও আইনানুসারে বিবাহের সীমা মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৮ ও ছেলেদের ক্ষেত্রে ২১; কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় এখনও গ্রামঞ্চলে ৪৬ শতাংশ কন্যার বিবাহের বয়স ১৩। দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে অপরিণত এই সমস্ত কন্যা বৈবাহিক জীবনে নানা সমস্যার সম্মুখিন হয়। যার অন্যতম হল বিপুল শিশুমৃত্যু ও প্রসূতির অকাল স্বাস্থ্যহীনতা।

নতুন প্রজন্মের সদস্যরা সন্ধান করে এই বিষয়ে শিক্ষা গ্রহন করার। কিন্তু তারা জানে না যে

কোথায় গেলে তাদের শিক্ষা সম্পূর্ন হবে। এই নতুন প্রজন্মকে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ন পদক্ষেপগুলি এখনও নেওয়া হয়নি। তার ফলে তারা নিতান্তই অনভিজ্ঞ থেকে যাচ্ছে বিবাহ এবং পারিবারিক জীবন সম্পর্কে।

শিক্ষা মানুষের সচেতনতা বাড়ায়। বর্ত্তমানে যারা শিক্ষার আলোয় আলোকি ,তারা বিবাহ নামক বিষয়টিকে দেরী করে সম্পন্ন করছে যতদিন না তারা পরিবার পালনে সক্ষম হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে বাল্যবিবাহের ফলে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে শারীরিক দিক থেকে দুর্বল। এই সমস্ত ক্ষেত্রে জনসংখ্যার শিক্ষার তাই বিশেষ প্রয়োজন লক্ষ্য করা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখাযায় অভিভাবক বা শিক্ষকেরা জীবনের গুণগত উৎকর্ষের সঙ্গে সম্পর্কিত যৌনপ্রশ্নগুলিকে এড়িয়ে যেতে চান। নিতান্তই বন্ধুর মতো তাদের সঙ্গে মিশে যদি তাদের সমস্যাগুলি সম্পর্কে অবগত হওয়া যায় এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তাদের সন্তান লালন পালন এবং পারিবারিক সুখ সম্পর্ক সম্বন্ধে শিক্ষিত করা যায় তাহলে জনসংখ্যার শিক্ষা বা মানব-সম্পদ বিকাশের শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের ভুমিকা বিশেষ কার্যকর হয়।

খ) সম্প্রদায়েরঃ (Community) ভূমিকা ঃ জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের গোষ্ঠীর প্রভাব মানব জীবনের উপর আসে এবং এদের প্রত্যেকের দ্বারাই ব্যক্তি জীবন প্রভাবিত হয়। যেমন শৈশবের শিক্ষা বিশেষভাবে পরিবার দ্বারা প্রভাবিত হয়; বাল্যে শিক্ষার দায়িত্ব বিশেষতঃ বিদ্যলয়ের ওপর ন্যস্ত থাকে। আবার কৈশোরে এবং যৌবনকালে ব্যক্তির শিক্ষা হয় বিভিন্ন সামাজিক সঙ্ঘের প্রভাবে। প্রাপ্তবয়স্ককালে শিক্ষা গনমাধ্যমে, পেশাগত প্রতিষ্ঠান এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। জনসংখ্যার শিক্ষা সম্প্রসারনের ক্ষেত্রে সম্প্রদায়ের (Community)



চিত্র ২

ভূমিকা কি তা আলোচনা করার আগে সম্প্রদায় বলতে ঠিক কি বোঝায় তা স্পষ্ট হওয়া দরকার। Balwant Rai Committee Report (Report of the Team for the Study of Community Projects and National Extension Service 1958) এ সম্প্রদায় (Community) সম্বন্ধে বলা হয়েছে " The word community has, for the past many decades, denoted many religious or caste groups or in some instants economic groups not necessarity living in one locality but with the inauguration of the community development programme in this country, it is intended to apply it to the concept of village community as a whole, cutting across caste, religions and economic defferences. It is a programme which emphasises that the interest in the development of the locality is necessarily and unavoidedly common to all the people living there."

আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদদের মতে "Whenever the members of any group, small or big, live together in such a way that they share not this or that particular interest but the basic conditions of common life. we call that group community"[1] (চিত্র-২) সুতরাং উপরোক্ত ধারনা অনুযায়ী সম্প্রদায়ের ভিত্তি হল দুটি। যথা — ক) অঞ্চল ও খ) স্বজাত্ববোধ (Community Sentiment)। যে কোন সম্প্রদায় একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস করে। এমনকি, জিপসীদের মতো ভবঘুরে যাযাবর দলের বসবাস করার (সাময়িক হলেও) একটা বিশেষ অঞ্চল থাকে। একই অঞ্চলে বসবাসকারী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ব্যক্তি একটি নিবিড় সমাজ বন্ধনে বাঁধা। সম্প্রদায়ের অর্ন্তভূক্ত ব্যাক্তিরা যে অঞ্চলে বসবাস করে ক্রমশঃ সেই অঞ্চলে তাদের প্রয়োজন গুলি মেটাবার ব্যবস্থা করে নেয়। সেই নির্দিষ্ট অঞ্চল ক্রমশ তাদের দৈহিক ও মানসিক প্রয়োজনগুলি মেটাতে সক্ষম হয়।

আবার এই ভাবে একই অঞ্চলে বসবাসের ফলে একই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন ব্যক্তিদের পারস্পারিক সম্পর্ক সম্বন্ধে সচেতনতা (Feeling of belonging together) বাড়ে। বস্তুত একই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন ব্যাক্তিদের মধ্যে ভাষাগত, আচরণগত, রীতিগত কতকগুলি বৈশিষ্ট্যর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে এই বৈশিষ্ট্যগুলিরও বিবর্তন ঘটে। এই বৈশিষ্টগুলি প্রজন্ম থেকে একই সম্প্রদায়ের অন্য নতুন প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। এই সঞ্চারনের ক্ষেত্রে সহায়ক রূপে কাজ করে একধরণের অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা।

প্রত্যেক শিশু যে সম্প্রদায়ের মধ্যে বড় হয় সেই সংম্প্রদায়ের একটি অলিখিত দায়বদ্ধতা থেকে যায় সেই শিশুর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনে তথা শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশে। কারন আজকের শিশুই ভবিষ্যতের নাগরিক·আগামী দিনের সমাজের নিয়ন্ত্রক।

মানুষ যখন থেকে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বাস করতে শিখেছে তখন থেকেই দেখা যায় ভাবের আদানপ্রদান ও আলাপ আলোচনার কোন কেন্দ্র বর্তমান। প্রাচীনকালে রাজবাড়ী, ইত্যাদিতে আলোচনা সভা বসত। পরবর্তী কালে কোন মন্দির, মসজিদকে কেন্দ্র করে আলাপ আলোচনার কেন্দ্র হত। বর্তমানের সেই ঐতিহ্য দেখা যায় গ্রামাঞ্চলে আজও টিউবয়লের ধারে/পুকুর পাড়ে (মেয়েদের) মন্দির প্রাঙ্গন/অশ্বথ গাছতলে বয়স্কদের জমায়েত লক্ষ্য করা যায়।

বেশীর ভাগ বয়স্ক মানুষেরা তাদের প্রাচীন ধ্যানধারনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন। কিন্তু সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের জোয়ার প্রাচীন মূল্যবোধকে বারবার ধাক্কা মারে, যাচাই করে দেখে। তাই নতুন প্রজন্মের সঙ্গে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

নতুন নতুন পুস্তক প্রকাশের ফলে ও গণমাধ্যমের প্রভাবে নতুন প্রজন্মের সদস্যের তাদের

পূর্বপুরুষদের থেকে অনেক বেশী বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন হয়। পূর্ববর্তী ধ্যানধারণার থেকে অনেক পরিবর্তন আসে তাদের মধ্যে। কোন কোন সমাজে আজও বাল্যবিবাহকে তেমন গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয় না। কিন্তু চিকিৎসাবিজ্ঞানে প্রমাণিত যে বাল্যবিবাহের ফলে বহু নারী দৈহিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

সমাজ কল্যানের দিকটি মাথায় রেখে আধুনিক প্রজন্মের সদস্যরা তাই এই বিষযে চিন্তা ভাবনা করে। প্রাচীন মূল্যবোধকে আঁকড়ে না থেকে,বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সবকিছু বিচার করতে সচেষ্ট হয়।

জনকল্যানের স্বার্থেই সমাজের মধ্যেই তৈরী হয় নানা সমিতি। এই সমিতিগুলিতে স্বাধীনভাবে ভাব প্রকাশের ফলে আত্মপ্রত্যয় গড়ে ওঠে যা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োজন। যে কোন গঠনমূলক কাজ করতে হলে তাই বিষয়টির একান্ত প্রায়োজন। এই সমিতিগুলিতে আমোদপ্রমোদমূলক কাজের মাধ্যমে কেবলমাত্র চিত্তবিনোদন নয়,সৃজনমূলক কাজও হয়।

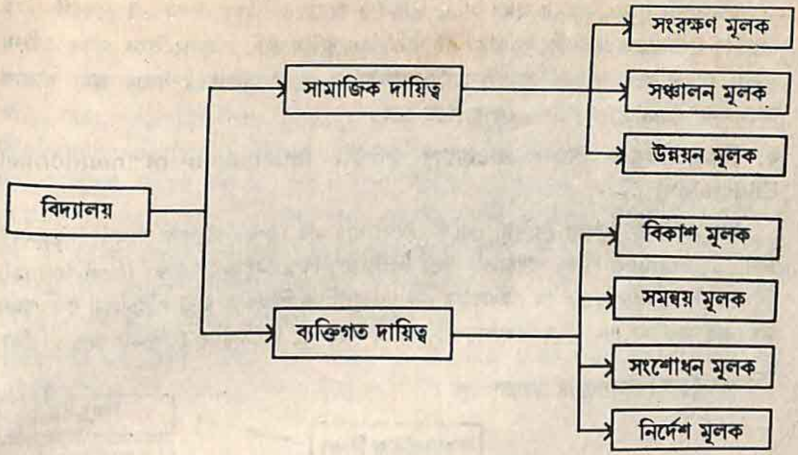
সুতরাং এই সমস্ত সমিতিগুলি সমাজকল্যানের উপযোগী। তাই জনসংখ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সমিতিগুলি বিশেষ ভূমিকা নিতে পারে। এখানে আলোচনাচক্রের মাধ্যমে সমাজের বাস্তব সমস্যাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। বিশেষতঃ একইসঙ্গে কিছু সংখ্যক মহিলা সদস্যকে যদি সচেতন করানো যায়,তাহলে তারাই স্বতস্ফূর্তভাবে বিষয়টিকে নিয়ে সম্প্রদায়ের মধ্যে চিন্তাভাবনা করাতে পারবে। সমস্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা সেই সমিতির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বাড়ীতে বাড়ীতে ছড়িয়ে পড়তে পারে নতুন নতুন সদস্যের চিন্তাভাবনা থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা সমাধানের সম্প্রদায় ভিত্তিক পথ উদ্ভাবিত হয়। সমিতির সদস্যরা বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যার বিচার বিশ্লেষন দ্বারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন। আবার সংঘ, সমিতিগুলি গোঁড়া ধর্মীয়বা রাজনৈতিক মতবাদ দ্বারা পরিচালিত হলে,তার কুপ্রভাব সদস্যদেরকেই প্রভাবিত করে।

প্রত্যেক সমিতিতে সদস্যদের আচার আচরণ নিয়ন্ত্রন করার জন্য কতকগুলি নিয়ম নির্ধারিত হয়। এই নিয়ম মেনে চলতে গেলে পরবর্তী কালে শৃঙ্খলাবোধের জন্ম হয়।

শিক্ষামূলক ভ্রমনের মাধ্যমে সমিতির সদস্য নিজস্ব গণ্ডির বাইরে এসে সমাজকে ভালোভাবে দেখার সুযোগ পায়। তখন তারা সামাজিক সমস্যাবলী সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে ওয়াকিবহাল হয়। পারিবেশিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিবর্ত্তন হয়। এ প্রসঙ্গে দলবদ্ধভাবে কৃষক সমিতি, মহিলা সমিতির সদস্য সদস্যাদের এবং বিশেষতঃ স্কুলকলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা মূলক ভারত ভ্রমণের ব্যবস্থা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

গ) বিদ্যালয়ে ভূমিকা ঃ অধিকাংশ নতুন প্রজন্মের ক্ষেত্রে তাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে প্রাথমিক যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় তা হল শিক্ষা। ১৯৬০ সালে শতকরা ৬১ জন প্রাথমিক স্কুলে ও ১৩ শতাংশ মাধ্যমিকস্কুলে যেত। ১৯৮০ সালে সেই হিসাব বেড়ে দাঁড়াল ৮৫ শতাংশ এবং ৩২ শতাংশ। এই হিসাবগুলি থেকে বোঝা যায় যে বেশ ভাল পরিমান শতাংশ বিদ্যালয়ের প্রচলিত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয় — যারা এই বৃহৎ জনসংখ্যার একাংশ।

কেবলমাত্র স্কুলের উপস্থিতির হার দেখেই বলা যায় না যে যথাযথ শিক্ষা যা ছাত্র-ছাত্রীর উপযোগী তা দেওয়া হচ্ছে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির জন্য জাতিকে আরো অনেক বেশী পরিশ্রম করতে হবে,যার ফলে প্রতিটি শিক্ষার্থী তার প্রাথমিক চাহিদা সম্পর্কে ধ্যানজ্ঞান লাভ করবে। প্রাথমিক চাহিদাগুলি আত্মসংগ্রাম, আত্মোন্নতির সঙ্গে যুক্ত হবে এবং সেগুলি অবশ্য সমাজ ও জাতির উন্নতির সহায়ক হবে। বিদ্যালয়ের দ্বৈত ভূমিকা আছে। চিত্র ৩-এ তা দেখানো হল।



চিত্র ৩ ঃ বিদ্যালয়ের দায়িত্ব

বলা হয় জনসংখ্যা শিক্ষা কোন্ নতুন অভ্যাস গঠনে সহায়তা করে না। কিন্তু এই শিক্ষার ধারনা, উদ্দেশ্য উপাদান সবই এসেছে প্রথাগত শিক্ষা থেকে যা মানুষকে একট অনন্য সাধারন দৃষ্টিভঙ্গী গঠনে সহায়তা করে এটা হল সমাজ সম্পর্কে জাতি সম্পর্কে ও তাদের ব্যক্তিজীবনে উন্নতি সাধনের জন্য। ভারতের ন্যায় উন্নতিশীল দেশে শিক্ষা নিয়তভাবে অর্থনৈতিক বিকাশ, বিজ্ঞান-প্রযুক্তিগত উন্নতি এবং সমাজিক সাম্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। এ সম্পর্ক ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত এবং জাতিগত সত্ত্বায় প্রথিত।

শিক্ষক তার চিন্তায় ও আচরণে বিজ্ঞানবাদীও প্রগতিশীল হবেন। অতীতে ঐতিহ্যের শাশ্বত ও মানবিকমূল্য বোধ, প্রথা ইত্যাদি সম্পর্কও তিনি সুশিক্ষিত এবং শ্রদ্ধাশীল হবেন।

জনসংখ্যা – শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদেশে আমরা একটা বিষয় বার বার লক্ষ্য করছি তা হল **শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে** সামাজিক ও পারিবারিক কল্যান সাধনে রত হবে। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অর্জনের একটা মূল কেন্দ্র হল গ্রন্থাগার।প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একটা চালু গ্রন্থাগার রাখা আবশ্যিক। বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ছাড়া বর্তমানে আমাদের দেশে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা পরিচালিত অনেক গ্রন্থাগার আছে। এগুলি বৃহত্তর সমাজ পরিবেশে শিক্ষার দায়িত্ব পালন করে থাকে। এই হিসেবে যে কোন সংস্থার দ্বারা পরিচালিত হোক না কেন গ্রন্থাগার জনসংখ্যা শিক্ষার সক্রিয় সংস্থা।

এখানে প্রত্যেকে ব্যক্তিগত পাঠের সুযোগ পায়। তার ফলে তার আত্মশিখন সম্পূর্ন হয়। ব্যাক্তির জ্ঞানমূলক চাহিদার পরিতৃপ্তি হয়। তাই গ্রন্থাগারে মানব-সম্পদবিকাশ সংক্রান্ত বা জনসংখ্যার বৃদ্ধির সমস্যা সম্পর্কে পুস্তকের মাধ্যমে অঞ্চলের সদস্যদের সচেতন করা যেতে পারে।

সুস্থ ও সমাজসম্মত ভাবে অবসর যাপনের ক্ষমতার বিকাশ আধুনিক শিক্ষার একটি প্রধান উদ্দেশ্য। পুস্তক পাঠের অভ্যাস একদিকে ব্যক্তিকে যেমন আনন্দ দেয়,তেমন অন্যদিকে অবসরকে শিক্ষামূলক কাজে ব্যবহারে অনুপ্রাণিত করে।

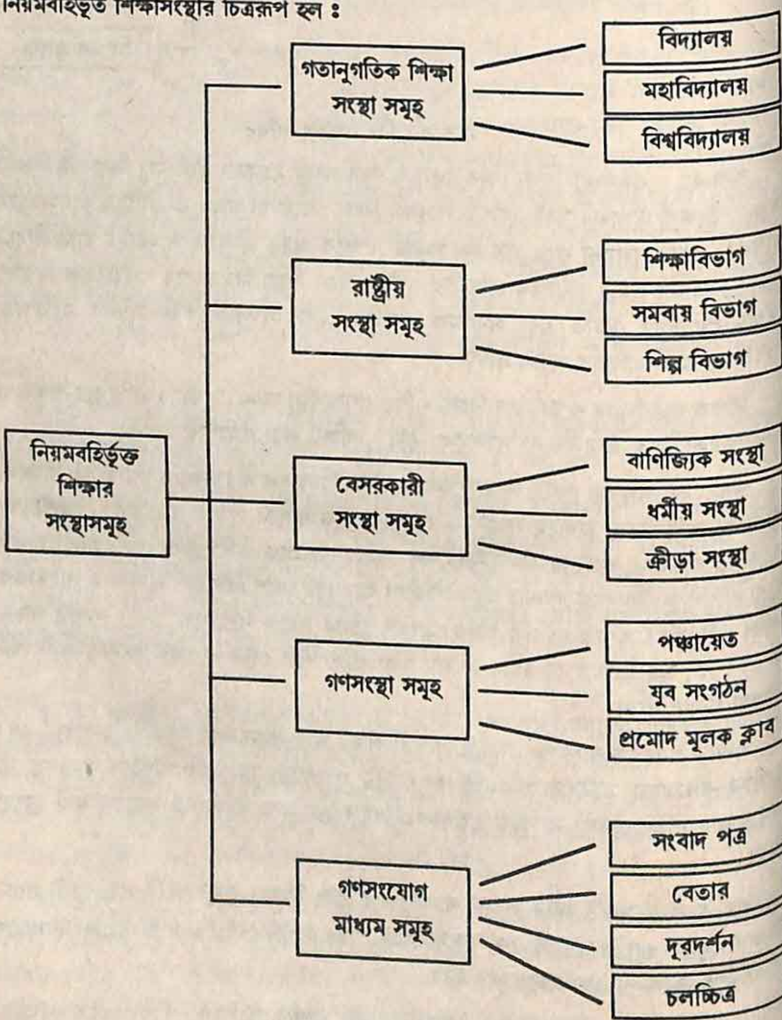
আধুনিক সমাজে ব্যক্তিমানুষকে নিজেরই বেঁচে থাকার তাগিদে তাকে বৃহত্তর পৃথিবীর সম্পর্কে জ্ঞান অন্বেষন করতে হয়। বহির্দেশের শিক্ষা তখনই কাছে আসে যখন পুস্তক পাঠ করা

হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা যখন সমগ্র পৃথিবীর আলোচ্য বিষয় তখন এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা ও সচেতনতা থাকা দরকার। এই সচেতনতা বৃদ্ধির তাগিদে স্কুলগুলিকে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন হবে। বৃহত্তর সামাজিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে অংশগ্রহন করার জন্য আলাপ আলোচনার (dialogue) উপর জোর দিতে হবে।

ঘ) নিয়ম বহির্ভুক্ত শিক্ষার প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাঃ (Institution of non-formal Education)

নিয়মবহির্ভুক্ত শিক্ষার বৈশিষ্ট্য থেকে দেখা যায় এই শিক্ষার উদ্দেশ্য বহুমুখী। আমাদের নিয়ন্ত্রিত (Formal) শিক্ষা পরিচালনা করে শিক্ষালয়। কিন্তু নিয়ম-বহির্ভুক্ত (Non-formal) শিক্ষার ক্ষেত্রে এত বিস্তৃত যে কেবলমাত্র এই গতানুগতিক শিক্ষালয় দ্বারা পরিচালনা করা সম্ভব নয়। এই কাজ আংশিক ভাবে শিক্ষালয়গুলি পালন করলেও, নিয়মবহির্ভূত শিক্ষার আরও বিভিন্ন

নিয়মবর্হির্ভূত শিক্ষাসংস্থার চিত্ররূপ হল ঃ



চিত্র ৪ ঃ নিয়মবর্হির্ভূত শিক্ষার সংস্থা

ধরণের সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান আছে। এই সব প্রতিষ্ঠানগুলিকে কয়েকটি শ্রেনীতে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন গতানুগতিক শিক্ষা সংস্থাসমূহ (Academic agencies); অর্থাৎ বিভিন্ন স্তরের শিক্ষালয়গুলি। রাষ্ট্রীয় সংস্থা (Governmental agencies); অর্থাৎ শিক্ষাবিভাগ, সমবায় বিভাগ, সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ, শিল্প বিভাগ ইত্যাদি। বেসরকারী সংস্থা সমূহ (Non-governmental agencies) যেমন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বানিজ্যিক সংস্থা, ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা ইত্যাদি। গণনসংস্থাসমূহ (People's organisation); অর্থাৎ পঞ্চায়েত. সমবায় সমিতি, যুব সংগঠন, ক্লাব ইত্যাদি। গনসংযোগ মাধ্যমসমূহ (Medium of mass communication); অর্থাৎ সংবাদ পত্র, বেতার, টেলিভিশন, চলচিত্র ইত্যাদি। এছাড়াও নিয়ম বহির্ভূত শিক্ষা পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ধরনের আন্তর্জাতিক সংস্থাও আছে. যেমন রাষ্ট্রপুঞ্জের বৈজ্ঞানিক ও কৃষ্টিমূলক সংস্থা (UNESCO)কৃষি ও খাদ্য সংস্থা (F A O) স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ইত্যাদি।

(ঙ) গণ মাধ্যমের ভূমিকা (Role of Mass Media)

শিক্ষার প্রাথমিক কার্যাবলীর অন্যতম হল সংস্কৃতি সঞ্চালন। এক গোষ্ঠীর সদস্যরা পরবর্তী প্রজন্মের নবীন সদস্যদের সংস্কৃতি হস্তান্তরিত করে। এই প্রক্রিয়ার প্রধান মাধ্যম অতীতে ছিল রূপকথা, লোকগাথা এবং পূর্বসূরীদের অনুকরণ। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নতুন প্রজন্মের সদস্যরা চারটি প্রধান বৌদ্ধিক (Intellectual) বিপ্লবের সম্মুখীন হয়েছে। প্রথমতঃ শিক্ষার বৃহৎ দায়িত্ব গৃহ থেকে মন্দির, গীর্জা অথবা মসজিদে স্থান করে নিয়েছে। এই বিপ্লবের ফলেই বিদ্যালয়ের সূচনা হয়। দ্বিতীয় যে বিপ্লব তা হল লেখার জন্য বর্ণের আবিষ্কার। এর ফলে শুনে শেখা অর্থাৎ শ্রুতিশিক্ষার প্রভাব কমে গিয়েছে। তৃতীয় যে বিপ্লব তা হল ছাপাখানার আষ্কিার। পুস্তক প্রকাশের ফলে সংস্কৃতির প্রসার খুব সহজে এবং দ্রুত গতিতে হয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে ইউরোপে বাইবেলের প্রচার সর্বাধিক হয়েছিল, যখন তা ছাপা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। বিংশশতাব্দীতে হঁয়েছে, চতুর্থ বিপ্লব। আধুনিক কালে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত কলা কৌশলের অভাবনীয় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বহু গণসংযোগের মাধ্যম সৃষ্টি হয়েছে। গণসংযোগের কলাকৌশলের উন্নতি এতই ব্যাপক মনে করা হয় যে আজকের সমাজে বার্তার প্র ভাব অপরিসীম। প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য বার্তা সৃষ্ট হয়, উহারা আলোকবেগে পৃথিবীমণ্ডলকে বেষ্টন করে সকল মনুষ্যসমাজে ব্যপ্ত হয়।

লারনার[১] (Lerner) মনে করেন যে দরিদ্র দেশগুলিতে বিকাশের সমস্যামূলত মনস্তাত্ত্বিক; গ্রাম্যসমাজ জীবনমান উন্নত করতে অপারগ, কারন তারা স্বকীয় কল্পনাতেও উন্নততর জীবনযাপনের মানসিকতা অর্জ্জন করে না। গণমাধ্যম তাদের সম্ভাবনাময় অভিজ্ঞতায় ঐরূপ জীবনের ছায়াছবি আঁকে – একে বলা হয় Empathy .

Emapathy endows a person with capacity to imagine himself as proprietor of a bigger grocery store in a city, to wear nice clothes and live in a nice house to be interested in "What is going on in the world and to get out of his hole". রজার্স[২] (Rogers) গণমাধ্যমের দ্বার নতুন ধারনা ও দৃষ্টিভংগী গঠনের প্রক্রিয়াকে 'Two-step flow of diffusion' নামে অভিহিত করেন।

Mass communication influence appears to operate by a 'two-step flow' process; the more aware (and often high status) members of groups tended to be most readily reached by the media, and these 'influentials' or 'opinion leaders' in them, were instrumental in spreading the message to others.

শ্রাম[৩] (Schramm) গণমাধ্যমকে 'Magic multiplier' বলে উল্লেখ করেছেন। উহাদের

মাধ্যমে জনগণকে অবিরাম বিপুল তথ্য (Information) সরবরাহ করা যায়, যাতে জাতীয় বিকাশ নীতিতে তাদের সমর্থন লাভ করা যায়, তাদের প্রত্যাশা বাড়ানো যায়, সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং সর্বোপরি জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন করা যায়।

গণমাধ্যমকে বলা হয় একটি দ্বিফলা অস্ত্রবিশেষ। এটিকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে, যা বৃহত্তরভাবে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র,আন্তর্জাতিক সদ্ভাব রক্ষা করতে সহায়তা করে। আবার বিপরীতভাবে তা ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারে, গণতন্ত্রকে দমন করতে পারে অথবা জাতির মধ্যে কোন বিশেষ মানুষ বা মতের বিপক্ষে চিন্তা, ধারনা সৃষ্টিতে সহায়তা করে। এই সমস্ত দিকগুলির কথা মাথায় রেখে জনমাধ্যমকে এমন ভাবে ব্যবহার করা উচিত যাতে তা জনকল্যানমুখী হয়। জনসংখ্যা শিক্ষা বা মানব-সম্পদ বিকাশের শিক্ষা ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত, সমাজগত এবং আন্তর্জাতিক সমস্যাসম্পর্কে সচেতন করতে সহায়তা করে। গণমাধ্যম গুলিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যাকে সমাধানের জন্য বাস্তবসম্মতভাবে কাজে লাগাতে হবে। নব প্রজন্মকে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় কাজে লাগাতে হবে। তারা যেন জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যাকে বাস্তবসম্মত দৃষ্টিকোন দিয়ে বিচার করে এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রনের ভাল দিকগুলিকে মানব-সম্পদ বিকাশের সাপেক্ষে বিচার করে।

ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক পরিবেশে জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশ গ্রামাঞ্চলে বাস করে। তাই গণমাধ্যম গুলিকে সেই দিকটি মাথায় রাখতে হবে। কারিগরী ও আধুনিক যন্ত্রশিল্পের উন্নতি যদি কেবলমাত্র শহরকেন্দ্রিক হয়,তাহলে দেশের এবং সমাজের বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা নেই। কারন পরিবার কল্যাণ কর্মসূচী গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রেই সর্বাধিক ভাবে প্রযোজ্য। সর্বাধিক মানুষের প্রয়োজনীয় তথ্য ও শিক্ষার বাহন হিসাবে গণমাধ্যমগুলি প্রত্যন্ত প্রদেশে প্রচার করবে পরিবার কল্যান কর্মসূচী।

গণমাধ্যমের প্রধান কাজ হিসাবে বলা যায় চিত্তবিনোদন। অনেক চিত্তবিনোদন সংক্রান্ত অনুষ্ঠান তাৎক্ষনিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও সহায়ক হয়। ডন. ডব্লিউ. লিয়ন (Don. W. Lyon) (যিনি ছিলেন আমেরিকার বেতার ও দূরদর্শন বিভাগের অনুষ্ঠান অধিকর্তা, বলেন 'কোন অনুষ্ঠানই একই সঙ্গে দর্শক আকর্ষন এবংমূল্যবোধ প্রচারে সহায়ক হয় না। শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানে তাই চিত্তবিনোদনের উপাদান রাখতে হবে। সবচেয়ে বেশী যে বিষয়টির প্রয়োজন তা হল জনমানসের মধ্যে মানসিক প্রক্ষেভ জাগিয়ে তোলা।

এই সমস্ত গণসংযোগ ব্যবস্থাগুলির মাধ্যমে প্রচারের কাজ সহজসাধ্য নয়। অধুনা শিক্ষকদের গণমাধ্যমের শিক্ষামূলক ব্যবহার বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষন দেওয়া গণমাধ্যমে হয়। যথাযথভাবে প্রয়োগ করাই হবে শিক্ষার আধুনিক অন্যতম উদ্দেশ্য। শিক্ষাই হচ্ছে এক পদ্ধতি যা মানুষের জ্ঞান, বিশ্বাস, আচার আচরনও ব্যবহারের পরিবর্তন করতে পারে। গণমাধ্যমগুলি কারিগরী জ্ঞান ও দক্ষতা দান করে, যা বিজ্ঞানসম্মত ও বাস্তবধর্মী চিন্তার সহায়ক। আশা করা যায় আগামীদিনে গণসংযোগ মাধ্যমগুলি জনসংখ্যা—শিক্ষার এবং মানব-সম্পদ বিকাশের সর্বাত্মক সহায়ক হবে।

১. Lerner, D Towaral a communication Theory of Modernization, in Pye, **L. W. Communications and Political Development,** New Jersey : Princeton Univ. Press 1963.

২. Rogers, **E. M. Diffulsion of Innovations,** New York, Press, 1962.

৩. Schramm, **W. Mass Media and National Developments** California : Stanfard Univ. Press 1964.

সকলের সহযোগীতা নিয়ে নিশ্চয়ই সফলতা আসবে।

সামাজিক পরিবর্তন আনয়নে গণমাধ্যমের বিশেষ ভূমিকা আছে। শিক্ষা এই লক্ষ্য অর্জনে ব্যক্তিকে ওয়াকিবহাল করে তোলে। এর মধ্য দিয়েই ব্যক্তি দেশের কর্মে অংশগ্রহন এবং জাতিগঠনে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তগ্রহন করতে পারে। এই প্রসঙ্গে উইলবার শ্রাম (Wilber Schramm) বলেনঃ

Social change of great magnitude is required. To achieve it people must be informed, persuaded, educated. Information must not flow out only to them, but also from them, so that their needs can be known and so that they may participate in the acts and decisions of nation building.

গণমাধ্যমের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল feed back জনমাধ্যমগুলিকে কার্যোপযোগী করতে হলে তাদের মধ্যে feed back এর সংস্থান রাখতে হবে।

নতুন ধারনা ছড়িয়ে দেওয়া বা প্রচার করা হল একটি বিশেষ ধরনের ব্যবস্থা যা গণমাধ্যমের প্রধান সংলক্ষন। এই ছড়িয়ে দেওয়া পদ্ধতি পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল, যত না বার্তার নিজস্বতার ওপর নির্ভর করে। এখানে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি হল 'interpersonal communication"। স্বাধীনতালাভের পর ভারতবর্ষে গণমাধ্যমকে জাতীয় উন্নতির (National development) সাপেক্ষে ব্যবহারের প্রবনতা দেখা যায়। ভারতীয় সংবিধানে মত প্রকাশের অধিকার এবং বার্তালাভের অধিকার গণতন্ত্রের অঙ্গ বলা হইয়াছে। সংবাদ এবং চলচ্চিত্র বিষয়ে সরকারের নিয়ন্ত্রন আছে, বেতার এবং দূরদর্শন প্রত্যক্ষভাবে সরকার পরিচালিত। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং অন্যান্য রাষ্ট্র প্রবর্তিত উন্নয়ন কার্যাবলী আধুনিক গণমাধ্যমগুলির মধ্য দিয়া জনসাধারনের সর্বস্তরে পরিব্যপ্ত করার প্রয়াস লওয়া হইয়াছে। গবেষনার ফলে জানা গিয়েছে যে এই পরিব্যপ্ত করন (diffusion) প্রক্রিয়া জনমানসে আধুনিকতার (যথা পরিবার কল্যান, বিজ্ঞানসম্মত কৃষিকাজ, পরিবেশরক্ষা, ইত্যাদি) সুস্পষ্ট প্রভাব ফেলে, কিন্তু এই প্রভাব হেতু তাহাদের যে নবজ্ঞাণ (New Knowledge) লাভ হয়, তাহার প্রকৃতি সাধারণ (general) মাত্র। এই সাধারণজ্ঞাণ তাহাদের চিরাচরিত দৃষ্টিভঙ্গীর আমুল পরিবর্তণ ঘটায় না এবং তাহাদিগকে আধুনিকতার সাপেক্ষে কর্মশীল (active) করে না। দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনে এবং কর্মশীল করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন শ্রোতাগোষ্ঠীর (যেমন কৃষক, মহিলা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, প্রভৃতি) মধ্যে শ্রোতা আলোচনাদল গঠন করিতে পারিলে আধুনিকতার সাপেক্ষে জ্ঞাণের বৃদ্ধি, দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তণ এবং কর্মোদ্যম ঘটান যায়। মোট কথা হইল, গণমাধ্যমে জনসংখ্যার শিক্ষা প্রচার করাই যথেষ্ট নয়, ভিন্ন ভিন্ন শ্রোতাগোষ্ঠীর মধ্যে ঐ বিষয়ে আলোচনাচক্র গঠন করিতে হইবে। এই আলোচনা সমিতিগুলির আন্তঃ সদস্য কথোপকথন গণমাধ্যমে পুনরায় প্রচার করিতে হইবে। তাহা হইলেই জনসংখ্যা শিক্ষা মানব-সম্পদের চেতনা সমাজের তৃণমুলে পৌছাইবে। ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে আধুনিক গণমাধ্যমের সংখ্যা ও সংগঠন নগণ্য নয়। ইহাদের সাহায্যে বিকাশের বিভিন্ন কার্যাবলী সুচারুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব।নিচের সারণীতে—ভারতের গণমাধ্যমের সংখ্যা-চিত্র প্রদর্শিত হইল।

সারণী ১ ঃ ভারতের গণমাধ্যম সংক্রান্ত তথ্য।

	জনসংখ্যা (১৯৮১) (কোটি)	সাক্ষরতা % (১৯৮১)		সংবাদপত্র (১৯৮০)		রেডিও সংখ্যা (১৯৮০)	টেলিভিশন সংখ্যা (১৯৮০)
		পুরুষ	স্ত্রী	মোট সংখ্যা	বিতরিতসংখ্যা (No. Distributed)		
ভারত	৬৮.৪	৪৭	২৫	১৮,১১০	৫ কোটি ১০ লক্ষ	১ কোটি ১০ লক্ষ	১৫ লক্ষ ৫০ হাজার
পঃবঙ্গ	৫.৫	৫০.৫	৩০	২,০২৫	৪৫ লক্ষ	১৬ লক্ষ	১ লক্ষ ৪৩ হাজার

ক) সংবাদপত্র (Newspaper) : সংবাদপত্র বর্তমান পৃথিবীর বার্তাদূত এবং বহুল প্রচারিত গণমাধ্যম রূপে পরিচিত। এই গণমাধ্যমে শুধুমাত্র সংবাদ পরিবেশিত হয় না ; সংবাদপত্রে দ্বারা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী (attitude), মূল্যবোধ (values) বিশ্লেষণ ক্ষমতা (Analytical thinking) প্রভৃতি জাগ্রত হয়। এই জনসংযোগ মাধ্যমের শিক্ষামুলক উপযোগিতাও সামগ্রিক ধরণের। তাই একে নিয়মবহির্ভূত শিক্ষায় এক ধরণের প্রতিষ্ঠাণ বা মাধ্যম হিসাবে গণ্য করা হয়।

সংবাদপত্রের প্রভাব কোন সামাজিক গোষ্ঠী বা রাষ্ট্রের সীমাকে অতিক্রম করে যেতে পারে। আজ বিশ্বময় যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্র তার সদাজাগ্রত প্রহরী। গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সাফল্য অনেকাংশে নাগরিকদের চিন্তাধারায় ঐক্য ও সমন্বয়ের ওপর নির্ভর করে। সংবাদপত্র নাগরিকদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ করে। সংবাদপত্র দেশের চিন্তাধারার তথা সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার একখানি স্বচ্ছ দর্পণ। সংবাদপত্র বর্তমান সভ্যতার অনুসারী বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি প্রয়োজণীয় মতাদর্শ গঠণ করে শিক্ষার কাজে সাহায্য করে। নিয়মিত সংবাদপত্র পাঠের মাধ্যমে ব্যক্তি বিভিন্ন ধরণের সামাজিক ঘটনা সর্বসমক্ষে পরিবেশণের আদর্শ কৌশল আয়ত্ব করতে পারে। অশিক্ষিত গ্রামবাসীর নিকট প্রত্যক্ষভাবে সংবাদপত্র পাঠকরা হলে তা থেকে শুনে তারা প্রকৃত তথ্যকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। অপরদিকে যদি শিক্ষিত ব্যক্তি সংবাদপত্র স্বয়ং পাঠ করে,তা থেকে মূল বক্তব্য বা খবরসমূহকে সমবেত নিরক্ষর ব্যক্তিবর্গের বোধগম্য করে উপস্থাপন করেন তা বার্তা প্রচারে অধিক ফলপ্রসূ হয়। ইহার কারণ হল :"The expository style of 'things read' is not so readily comprehended by illiterate villagers as the narrative style of 'things told'. Several villagers can not grasp news from the newspaper directly. Once, Tarapada (the village 'chowkidar' or guard) told me : one day, in Nantu's tea stall, Janhavi was reading murder in Calcutta and I stood with some others to hear. But I could not understand much of what was said. I therefore prefer being told rather than listening to things read." (Hartmann. **The mass media and Village Life, 1989, Pp 208-209**

গ্রামীণ ব্যক্তিবর্গের নিকট সংবাদ প্রথমত : বিশিষ্ট ব্যক্তি যেমন (শিক্ষিত ব্যক্তি হিসাবে যিনি গণ্য বা যিনি যোগাযোগ রেখে চলেন বা ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক, (officials) অথবা রাজনৈতিক ব্যক্তি হিসাবে পরিগণিত) তাঁর দ্বারা পরিবেশিত হয়। এই সকল ব্যক্তি গ্রামীণ জীবনের সঙ্গেও সর্বদা সম্পর্কিত থাকেন। সুতরাং গ্রামীণ নাগরিকদের এক বৃহৎ অংশ নিয়মিত সংবাদপাঠক এরূপ ব্যক্তিদের মুখনিঃসৃত এবং তাদের (গ্রমীণ ব্যক্তিদের) ভাষায় উপলব্ধ সংবাদের উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করে। উল্লিখিত গ্রামীণ নাগরিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ "Secondary audience category" রূপে পরিচিত হয়।

সংবাদপত্রে যে সব তথ্য পরিবেশন করা হয়, তা বিভিন্ন দিক থেকে ব্যক্তিজীবনে গুরুত্বপূর্ণ। এই সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিশ্লেষণ-ধর্মী চিন্তা সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে। যুগের অনিবার্য প্রয়োজনে সংবাদপত্রের দায়িত্ব ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সংবাদপত্রের মাধ্যমে শিক্ষার প্রতি সার্বজনীন আগ্রহ সঞ্চার করা যায়। বর্তমানে যে কোন রাষ্ট্র বা সমাজ শিক্ষা পরিকল্পনা রচনার সময় সংবাদপত্রের মতামতের ওপর গুরুত্ব দেয়। সংবাদপত্র ব্যক্তিকে সামাজিক রীতি অনুযায়ী আদর্শ পথে পরিচালিত করে। পৃথিবীর দূরতম স্থান থেকে দ্রত পরিবর্তনশীল মানবসভ্যতার প্রতিটি সংবাদ শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করে সংবাদপত্র। পাঠকদের ভ্রান্ত প্রাচীনমূল্যবোধের আমূল পরিবর্তন ঘটায় এবং তাদের মধ্যে নূতন মূল্যবোধের ভিত্তি স্থাপন করে।

তবে সংবাদপত্রের এই ভূমিকা গৌরবোজ্জ্বল হলেও সংকটমুক্ত নয়। অনেক শিক্ষাবিদ ইহাকে শিক্ষার নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা হিসাবে বিবেচনা করেন না। তাঁরা সংবাদপত্রকে শিক্ষার

নিষ্ক্রিয় মাধ্যম নামে অভিহিত করেছেন। অনেকে বলেন শিক্ষার্থীর জীবনেও স্থায়ী প্রভাব আনয়নে সংবাদপত্রের শিক্ষামূলক সক্রিয় ভূমিকা থাকে নিতান্তই স্বল্প। চাঞ্চল্যকর তথ্য পরিবেশনায় প্রবণতা সংবাদপত্রের সর্ব্ববৃহৎ ত্রুটি। সংবাদপত্র অনেকসময় শিক্ষার্থীদের মনে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি করতে পারে। নানা প্রকার কুঅভ্যাস গঠন, শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি বিরূপ মনোভাব, সামাজিক কোন আদর্শের প্রতি বিরুদ্ধতা প্রভৃতি সংবাদপত্রের মাধ্যমে সঞ্চারিত হতে পারে। অতএব এইসকল কারণে সংবাদপত্রের নেতিবাচক ক্ষেত্রের প্রতি শিক্ষক এবং ছাত্র উভয়েই সচেতন থেকে, ইহার যথাযথ ব্যবহার করলে সংবাদপত্রের শিক্ষামূলক ভূমিকা বিশেষ মূল্যবান ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

বেতার (Newspaper) ঃ গণমাধ্যমগুলির মধ্যে বেতারের মত অন্য কোন গণসংযোগ ব্যবস্থা এত দ্রত জনপ্রিয়তা পায়নি। বেতার যখন আবিষ্কৃত হয়েছিল তখন তা কেবলমাত্র চিত্তবিনোদন ও ব্যবসায়িক ভিত্তিতেই ব্যবহৃত হত। পরবর্তীকালে বেতারের মাধ্যমে জনগনের মধ্যে রাজনৈতিক দলের মত প্রচার ও যুদ্ধের খবর প্রচার করা হত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথা অনুযায়ী ও তার বাইরেও বেতারের ব্যবহার শুরু হয়। ক্রমশ এই ব্যবস্থাকে সর্বজনীন করে তোলা হয়। বর্তমানে পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশের বেতারের দৈনন্দিন অনুষ্ঠান সূচীর মধ্যে শিক্ষাবিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচারের জন্যে কিছু নির্দিষ্ট সময় রাখা হয়। এর মধ্যে বয়স্ক শিক্ষা, কৃষক সমাচার, শ্রমিক সংবাদ বা নারীশিক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচী থাকে। এক যুগেরও বেশি সময় ধরে বেতার প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করে তুলতে ব্যবহৃত হচ্ছে। এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকেও সর্বজনীন করে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। ব্রিটেনের মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় মূলতঃ তাদের বেতার সম্প্রচারের উপর নির্ভরশীল।

ভারতবর্ষে কৃষকদের জন্য প্রচারিত সংবাদে চাষ-আবাদ কিভাবে আধুনিক পদ্ধতিতে করা যায় তার বিবরণ দেওয়া হয়। শ্রমিক আত্মনির্ভরশীলতা বাড়ানোর ও তাদের নিরাপত্তার বিষয়ে সংবাদ প্রচার করা হয়। এছাড়াও বেতারে শিশু ও নারীদের বিষয়ে নানা অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। বিশেষতঃ কলকাতার আকাশবানী কেন্দ্রের কৃষি-বিষয়ক অনুষ্ঠান যথেষ্ট তথ্যমূলক।

জনমাধ্যমগুলির মধ্যে প্রচার মাধ্যম হিসেবে বেতার যথেষ্ট কার্যোপকারী ও স্বল্পব্যয় সম্পন্ন মাধ্যম। শিক্ষাক্ষেত্রে বেতারের স্থান বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বেতারের মাধ্যমে শুধুমাত্র মূল্যবোধ, নবলব্ধ জ্ঞাণ ইত্যাদির শিক্ষাই দেওয়া হয় না, আগ্রহ ও যথাযথ উপলব্ধির দিকেও নজর দেওয়া হয়। একই ময়ে একটি বৃহৎ অঞ্চলের জনগণকে প্রভাবিত করতে বেতার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

ভারতবর্যের মত দেশে যেখানে অর্থের অস্বাচ্ছন্দ থাকা সত্ত্বেও দক্ষ শিক্ষক, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কলাকুশলীদের অভাব নেই, সেখানে বেতার নিঃসন্দেহে জনমাধ্যমের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা নিতে পারে। জনসংখ্যা-শিক্ষার ক্ষেত্রে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা সমাধানের পথ হিসাবে আধুনিক প্রজন্মকে সুশিক্ষিত করে তোলার কথা বলা হয়েছে। যাতে তারা পরিবার গঠন, পরিবার কল্যান ও সমাজ কল্যানের দিকে দৃষ্টি দিতে পারে।

আমাদের দেশে জনসংখ্যার একবৃহৎ অংশ গ্রামাঞ্চলে বাস করে। অনেক সমাজে শিক্ষা এখনও গুরুত্বহীন, অনাগ্রহের বিষয় হিসাবে রয়ে গেছে। প্রথাবদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি তাদের চরম অনাগ্রহ রয়েছে। ফলে শিক্ষার আলোক তাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হলেও তাদের সচেতন করে তুলতে হলে,বেতার মাধ্যমকে আরও বেশি সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে।

বেতার অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে হালকা গানবাজনা ও নাটক গুলিই মহিলাদের বেশি আকৃষ্ট করে। যদিও এর ব্যতিক্রমও রয়েছে।উদাহরণ হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের রণবন্ধা গ্রামের হরেনবাবুর শিক্ষিতা

স্ত্রীর কথা, যাঁর কাছে বেতার হল বিংশ শতাব্দীর আশীর্বাদ যা তাঁর দিনগুলিকে উজ্জ্বল রাখে। তিনি বলেন ঃ

> "Sometimes we hear good advice
> on how to care for our children,
> how to prevent them from catching
> diseases; and how to keep them
> happy. Radio even gives us good
> recipes. Radio programmes often
> have good receipes. Radio programmes
> often have good stories that teach us a
> lesson about life."
>
> 'Hartman, p. 202' (1989)

বেতারের কতকগুলো সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এই গণমাধ্যম কেবলমাত্র শ্রুতিনির্ভর। বেতারের প্রধান অসুবিধা হল এখানে শিক্ষামুখী সংযোগ একমুখী। ফলে শিক্ষার্থীদের মনে কোন প্রশ্ন থাকলে তা তারা প্রকাশ করতে পারে না।

এই সকল সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও বেতার প্রচারের মাধ্যমে জনসংখ্যা শিক্ষার প্রচার করা দরকার। আমোদমূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাৎক্ষনিক শিক্ষা দিতে পারলে, সেই শিক্ষার প্রভাব অপরিসীম। মানব সম্পদ বিকাশের অনুষ্ঠান সরাসরি প্রচারের ব্যবস্থা যেমন থাকবে, সেই সঙ্গে চিত্তবিনোদন সংক্রান্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যদি তার প্রচার করা সম্ভব হয় তাহলে তার গুরুত্ব আরও বেশি হবে। এর ফলে একই সঙ্গে অনেক বেশি সংখ্যক জনমানসে জনসংখ্যা শিক্ষার আলোক প্রচার করা হম্ভব হবে।

গ) **চলচ্চিত্র** (Cinema) ঃ বর্তমান পৃথিবীতে চলচ্চিত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ জনমাধ্যম। গ্রাম-শহরের পারিবেশিকবন্ধন ছিন্ন করে যদি কোন মাধ্যম জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে থাকে তা হল চলচ্চিত্র। কিশোর-কিশোরীরা অনেক কিছু জানতে উৎসুক, তাদের কৌতূহল প্রবল। তারা বার্তার সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজক কিছুও চায়।চলচ্চিত্র এই সব চাহিদা গুলি যুগপৎ যোগান দেয়।

এই বক্তব্যের বিপরীতে চলচ্চিত্রের শিক্ষাগত গুরুত্বের কথাও বলা হয়ে থাকে।

পূর্বসূরীদের দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধিতা করে প্রগতিশীল যুবসমাজ চলচ্চিত্রের কল্যাণমূলক প্রভাবের কথা বলে। তাদের মতে ঃ

> When we see the lives of people in the city, their culture, customs, manners and behaviour, their out look and aspirations and then compare them with out own village lives, we find that we still have a long way to go before attaining their level. The movies are like a teacher to us; they tell us what to do and what not. Hartmann,' 89) p.204.

গ্রামের মেয়েরা বলে, "আমি আমার এক ঘেয়েমি কাটাতে যেমন ছবি দেখতে যাই, তেমনি তার পাশাপাশি সভ্যজীবনের জীবন ধারা সম্পর্কে অনেক কিছু শিখি। চলচ্চিত্র থেকে আমি জানতে পারে, কিছু কিছু দেশের মেয়েরা স্বাধীন এবং যথোপযুক্ত সম্মান পায়। তাদের স্বামী এবং আত্মীয়রা তাদেরকে সমঅধিকার ও সন্মান দেয়, কিন্তু আমাদের দেশের গ্রামগুলিতে মেয়েরা

মানুষ হিসাবে গণ্য হয় না, চলচ্চিত্র থেকে এগুলো আমরা জানতে পারি।”

চলচ্চিত্র শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুকে সঠিক মাত্রায় এবং যথাসম্ভব বাস্তবসম্মত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরতে সাহায্য করে। শিক্ষণীয় বিষয়সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে আগ্রহী করে তোলে। চলচ্চিত্র নব প্রজন্মের সামাজিক রীতি নীতি ও আদর্শের প্রতি মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করে। তবে এই জনপ্রিয় জনমাধ্যমটি একমুখী হওয়ায় ভুল শিক্ষা সোধরানোর কোন উপায় থাকে না। বর্তমানে ব্যবসায়িক কাহিনী চিত্রগুলিতে এমনসব ঘটনা (যৌনতা, মারপিট বিলাস প্রবণতা) দেখানো হয়, যার কুপ্রভাব শিক্ষার্থীদের মধ্যে পড়ে। ফলে অপ্রাপ্তবয়স্করা বিকৃত রুচি, মানসিকতা ও মূল্যবোধের শিকার হয়।

শিক্ষামূলক চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শিক্ষণীয় বিষয়টিকে যদি শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপন করা যায় তাহলে তারা অবশ্যই আগ্রহ বোধ করবে। জনসংখ্যা শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ের উপর তথ্যচিত্র নির্মান করে যদি প্রচার করা যায় তাহলে তাদের মধ্যে অবশ্যই সচেতনতা আসবে। প্রয়োজন বোধে ব্যখ্যাসহ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অসম্পূর্ণ অভিজ্ঞতাকে পরিপূর্ণ করতে সহায়তা করা যায়।

ঘ) দূরদর্শন (T. V.) ঃ গণমাধ্যম হিসাবে দূরদর্শনের প্রভাব সংবাদ পত্র, চলচ্চিত্র ও বেতারকে অতিক্রম করেছে। দূরদর্শন একই সঙ্গে শ্রবণ ও দর্শণের অনুভূতিকে সক্রিয় করে। এই জনমাধ্যম শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্কদের সমানভাবে আকৃষ্ট করে।

শিক্ষামূলক দূরদর্শন বলতে আমরা তাকেই বুঝি যা সমাজের শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এখানে কেবলমাত্র তথ্যপ্রদান, শিক্ষামূলক নির্দেশদান, সাংস্কৃতিক এবং জনজীবনের সঙ্গে সংযুক্ত চিত্রবিনোদনমূলক অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়ে থাকে। তাই দূরদর্শনে পৃথক ভাবে শিক্ষাসংক্রান্ত অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়ে থাকে। অতএব শিক্ষামাধ্যমরূপে দূরদর্শন (E. T. V.) বায়ুপথে অথবা Closed circuit এর মাধ্যমে সরাসরি অনুষ্ঠান প্রচারে সক্ষম।

১৯৫৯ সালে ভারতে দূরদর্শন যুগের সূত্রপাত ঘটে। ভারতীয় দূরদর্শন একদিকে তার আধুনিকতা (recentness) এবং অপর পক্ষে সার্বজনীন আবেদন (universal appeal) এই উভয় প্রকার বৈশিষ্ট্যে অদ্বিতীয় (unique)। ১৯৬১ সনে দূরদর্শন ব্যবস্থার দ্বারা শিক্ষাধর্মী অনুষ্ঠান প্রচার শুরু করা হয়।

১৯৭৫ সনে SITE (Satellite Instructional Television Experiment) এর নতুন উদ্ভাবনের মধ্যদিয়ে ভারতীয় দূরদর্শনের নতুন পথের সূচনা হয়। বর্তমানে ভারতীয় দূরদর্শন মাইক্রোওয়েভ লিঙ্কের মধ্যস্থতায়, বহুমুখী উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত INSAT এর সহায়তায় বিবিধ অনুষ্ঠান প্রচারে সক্ষম হয়েছে। দূরদর্শন উপগ্রহের মাধ্যমে (American ATS6) নির্দেশমূলক কর্মসূচী বিশেষ করে কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবারকল্যান, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে ভারতীয় চারটি ভাষার মাধ্যমে সম্প্রচার করে। এই অনুষ্ঠান এক বছরের জন্যে দৈনিক চারঘন্টা সময়ের দ্বারা নির্ধারিত হয়। ছয়টি রাজ্যের প্রায় ২,৪০০ গ্রামের মানুষ দূরদর্শনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানসূচী প্রচারের সকল সুবিধা প্রত্যক্ষ করে থাকে।

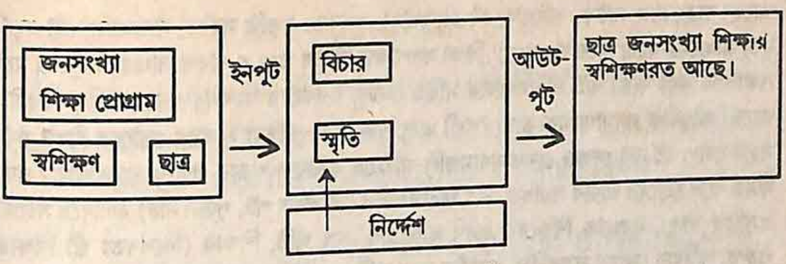
দূরদর্শন ভারত সরকারের দ্বারা পরিচালিত, নিয়ন্ত্রিত ও সরকারের ইচ্ছাধীন রূপে কাজ করে। এটি বেতার ও সম্প্রচার মন্ত্রকের দপ্তরের অধীন। ডিরেকটার জেনারেলের অধীনে এই বিভাগের কার্যাবলী চলে। দূরদর্শন মানুষের অবসর-বিনোদনের উপকরনই নয়, সামাজিক উপযোগিতার দিক থেকেও এর ভূমিকা বা প্রাসঙ্গিকতা অতুলণীয়। মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনাবলী ও তার বৈচিত্র্যধর্মী রুচির সমার্জনে দূরদর্শন বিবিধ অনুপম অনুষ্ঠাণ প্রচার করে। দূরদর্শন বহুবছর

ধরেই তার অনুষ্ঠাণের প্রসারকরণ এবং সময়ের দ্বারা তার কর্মক্ষেত্রের পরিধিকে বিস্তৃত করে তুলছে। ১৯৭৫ সনে দৈনিক এক ঘন্টার স্থানে, বর্তমানে দূরদর্শন দৈনিক ৫ থেকে ৭ ঘন্টা এবং রবিবার (১৪-১৫) ঘন্টা বিভিন্নধর্মী অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে থাকে। ভারতে দূরদর্শন সেটের সংখ্যা নিরূপন করা জটিল ব্যপার। সাধারণভাবে বর্তমানে ভারতে দূরদর্শন সেটের সংখ্যা প্রায় দুই কোটি। এর মধ্যে প্রধান নগর ও শহরে গ্রাহক সংখ্যা (receiver) প্রায় ৪৫ শতাংশ। ভারতীয় অর্থনৈতিক মানে দূরদূর্শনের অর্থমূল্য অধিক বলে মনে করা হয়। গ্রামীণ অঞ্চলে দূরদর্শনের অনুপ্রবেশ প্রয়োজনের তুলনায় এখনও স্বল্প। দেশের জনসংখ্যার মানদণ্ডে দূরদর্শন কারিগরীভাবে জনসংখ্যার ৭০ শতাংশকে দর্শকরূপে আনয়নে সমর্থ হয়েছে, যদিও প্রত্যক্ষরূপে দূরদর্শনের সুবিধালাভে অনেকেই বঞ্চিত। মাত্র ১৫ শতাংশের মত মানুষ প্রত্যক্ষভাবে দূরদর্শনের সুযোগ লাভে সমর্থ হয়েছে। পরীক্ষণের ফল হিসাবে সামগ্রিকভাবে দূরদর্শনের সদর্থক (posiitive) প্রভাবই অনুভূত হয়েছে। আরো দেখা গেছে যে দর্শকমণ্ডলী এই মাধ্যম থেকে যে শিক্ষা লাভ করে তা দূরদর্শন কর্মসূচীর বিশেষকোন জ্ঞাতব্য বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে না;বরং সাধারণ ধর্মী সচেতণতাই প্রধান থাকে। গবেষকগণ দূরদর্শনকে জাতীয় উন্নয়ণে বার্তাবহক রূপে ব্যবহার করতে পরামর্শ দিয়েছেন। দূরদর্শন সেটকে বর্তমানে গৃহে গর্বের বস্তুরূপে স্থান দেওয়া হয়েছে। দূরদর্শন ব্যক্তিগত প্রয়োজনের তুলনায় সামাজিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে অধিক ব্যবহার হয়। দর্শকরা দূরদর্শনের কর্মসূচী নিয়ে প্রায়শই আলোচনা, মন্তব্য প্রদান করেন। ভারতীয় দূরদর্শন একদিকে যেমন উন্নয়নের ক্ষেত্রে যন্ত্রহিসাবে ব্যবহৃত হয় অপর পক্ষে পরিবার সমূহকে তথ্য পরিবেশণের কাজ ও প্রতিপালন করে চলে। একদিকে দূরদর্শন শিশুদের মাণসিক কাঠামোর প্রসারতা (extension) বৃদ্ধি করে, অন্যদিকে উহা উন্নয়নের ক্ষেত্রে বির্তকমূলকভূমিকা পালন করে। অনগ্রসরদের জীবনে এই প্রসারতাকে (extension) ত্রিস্তরে (three levels) বিশ্লেষণ করা যায়। প্রথমটি হল সংস্কৃতি,এক্ষেব্যাখ্যা করা হয়েছে (পরিবারের চেয়ে সামাজিক দিকের ব্যাপকতর পরিপ্রেক্ষিতে)। দ্বিতীয়টি হল household (গৃহস্থালী জীবনযাত্রা নির্বাহ এবং পারিবারিক সদস্যবৃন্দদের নিয়ে) এবং তৃতীয়টি হল ব্যক্তির নিজস্বতায়। মা কিভাবে দূরদর্শনের কর্মসূচীকে শিশুর নিকট ব্যাখ্যা করছে তার উপরও এর প্রসারতা নির্ভর করে। এর উদাহরণ হল customary domestic responsibilities, সামাজিকীকরণ (Socialization), শিশু উন্নয়ণ (Child Care)।

ব্যক্তির আরোপিত বিভিন্নগুণাবলী দর্শনের মধ্যদিয়ে প্রসারিত হয় যথাক্রমে বয়স, বংশধারা, লিঙ্গ, Sexual orientation এবং ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে। নানসিক সমন্বয়ণ orientation আবেগ, কল্পনা, মেজাজ, আনন্দ, ভয়, এবং Parasocial interachi -কে কেন্দ্রকরে গড়ে উঠে। ব্যক্তিগত প্রক্রিয়া relaxing, সময় অতিবাহিত করা, পলায়ণ, মনোভাবের পরিবর্তন, অবসরকালীন সময়ে চিত্তবিনোদনের দিকে দৃষ্টিপ্রদান। ইত্যাদির সঙ্গে স্বভাবতঃই জড়িত।

জনসংখ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যই হল নতুন প্রজন্মকে শিক্ষিত করে তোলা যাতে তারা যোগ্য অভিভাবক হতে পারে, দেশের ও দশের সঙ্গে নিজজীবনের উন্নতিতে যথাযথ ভূমিকা নেয়। তাই সবদিক থেকেই দূরদর্শন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে সক্ষম।

কম্পিউটার (Computer) ঃ কম্পিউটার বা যন্ত্রগণক একটি অতি আধুনিক গণমাধ্যম। এই যন্ত্রটি অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে বিচার বিশ্লেষণ সহ গণনা করতে পারে। এটা নিজে কাজ করে না, একে কাজ করাতে হয়। তার জন্য তাকে নির্দেশ পাঠাতে হয়। তথ্য এবং নির্দেশ দিলে পরে সে তার নিজের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা অনুযায়ী বিচার করে ফলাফল তৈরী করে। তার কাজের ধারা ছবিতে দেওয়া হল।



চিত্র ঃ কম্পিউটারের কার্য্য

কম্পিউটার যে ভাষায় কাজ করে তার সহজ বহুল ব্যবহৃত নাম (Basic Beginners All Purpose Symbolic Instruction code); অপরভাষাগুলি হল COBOL, D-BASE, LOTOUS ইত্যাদি। কার্যের গুণাগুণ বিচারে চার প্রকারের কম্পিউটার হয়। এদের পরিচয় নীচের সারণীতে দেওয়া হল।

✪ সারণী নং –

কম্পিউটারের প্রকার (১)	প্রকৃতি (২)	নির্দেশগ্রহণ ও গণনাসংখ্যা (প্রতি সেকেণ্ডে) (৩)	আনুমানিক মূল্য (টাকায়) (৪)
মাইক্রো	একজন ব্যক্তি এক ধরণের কাজ	৮০ হাজার– ১ লক্ষ	১০ হাজার থেকে ১ লক্ষ
মিনি	একাধিক ব্যক্তি এক ধরণের কাজ	৫ লক্ষ – ১০ লক্ষ	২ লক্ষ থেকে ১৫ লক্ষ
মেইন ফ্রেম	একাধিক ব্যক্তি বিভিন্ন ধরণের কাজ	১০ লক্ষ – ১ কোটি	২০ লক্ষ থেকে ১ কোটি
সুপার	বহুব্যক্তি বহুকাজ অবিশ্বাস্য দ্রুত	১ লক্ষ – ৪০০ লক্ষ	১০ লক্ষ থেকে ২০ কোটি

জনসংখ্যা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য কম্পিউটারে সযত্নে সংরক্ষণ করা যায় এবং প্রয়োজনে ঐসব তথ্যআংশিক বা পূর্ণমাত্রায় তুলে এনে বার বার কাজে ব্যবহার করা যায়। তাছাড়া এ্যানালগ্ (Analog) কম্পিউটারের মাধ্যমে জনসংখ্যা সম্পর্কীয় বাস্তব অবস্থা পূর্ব পর্যালোচনা করে প্রয়োজণীয় পদক্ষেপের প্রকৃতিও পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। বিদেশে বিভিন্ন বয়স এবং শিক্ষা মাণের ছাত্রছাত্রীদের কম্পিউটারের মাধ্যমে স্বশিখণের ব্যবস্থা আছে। শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে জনসংখ্যার শিক্ষা একটি মিশ্র বিষয়। ভারতের I.I.T.(Indian Institute of Technology) গুলিতে, বিশেষত ঃ দিল্লী- I.I.T -তে, কম্পিউটার সহযোগে শিক্ষণের (Computor Assisted Instruction) ব্যবস্থা আছে। উন্নতিকামী দেশগুলিতে (যথা ভারতে) কম্পিউটারের সাহায্যে জনশিক্ষাসংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করাই সম্ভব ; কম্পিউটার সহয়োগে পাঠদানের খরচ সাধ্যাতীত বলা চলে।

চিরায়ত দেশজ গণমাধ্যম (Traditional Mass Media) ঃ আধুনিক গণ-মাধ্যম (রেডিও, টিভি ইত্যাদি) ব্যতীত জনসংখ্যা শিক্ষায় চিরায়ত দেশজ গণমাধ্যমের বিশেষ গুরুত্ব

আছে। যাত্রা, গ্রাম্য নাটক, কবিগান, কীর্ত্তন, বাউল, কথকতা প্রভৃতি সঙ্গীত, সাঁততালি, ছৌ প্রভৃতি নৃত্য মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে জনসংখ্যা শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য ও ধারণা সাধারণ মানুষের মধ্যে সঞ্চালিত করা যায়। এই মাধ্যমগুলির সহিত শ্রোতা দর্শকদের বংশপরম্পরায় নিবিড় পরিচিতি আছে। আধুনিক গণমাধ্যমের ভাষা শৈলী এবং সঞ্চারণের ভঙ্গিমা সাধারণ লোকের নিকট সর্বদা সহজ বোধ্য হয় না। দেশজ লোকমাধ্যমগুলি ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বার্তার প্রত্যক্ষ ভাবে আদান প্রদান ঘটায় বলে ইহাদের প্রভাব সমধিক। এই মাধ্যমগুলির (বিশেষত পট, পুতুল নাচ) মধ্যদিয়ে সহজেই প্রসূতির স্বাস্থ্য, নবজাত শিশুদের রোগ প্রতিরোধ এবং পুষ্টি, শিক্ষার (বিশেষতঃ স্ত্রী শিক্ষার) গুরুত্ব, পরিবার কল্যান সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য অতি সহজেই দেশের গ্রামাঞ্চলে কম খরচে প্রচার করা যায়। সম্প্রতি (১৯৮৮) পশ্চিমবঙ্গের রণবন্ধা গ্রামে[১] (মুর্শিদাবাদ জেলা) অভিজ্ঞতা ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ করে দেখা গেছে যে গ্রাম্য যাত্রা, কথকতা ধর্মীয় গোঁড়ামি বা সামাজিক কু-প্রথা যেগুলি আধুনিকীকরণের (modernization) বিপরীত, তাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া/প্রতিবাদের শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে উঠেছে।

আধুনিক গণমাধ্যমগুলির hardware এর প্রযুক্তিকৌশল তৃতীয় বিশ্বের ন্যায় দরিদ্র দেশগুলিকে পাশ্চাত্যের দেশগুলি থেকে কিনতে হয়, আর বিশ্বের বার্তাব্যবস্থা পাঁচটি পশ্চিমী ধনীদেশগুলি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। একে Media Imperialism বলা হয় ; এই Media Imperialism, cultural imperialism এর অংশমাত্র। ফলে আধুনিকগণমাধ্যমে প্রেরিত বিষয় বস্তুর উপাদান, গঠন, তাৎপর্য ধনীদেশগুলির স্বার্থবাহী। তৃতীয় বিশ্বের দেসগুলিতে গণশিক্ষার ভূমিকা স্বতন্ত্র।

ফ্রেইরে (Freire) এর মতে শিক্ষা এবং সংযোগরক্ষাকারী মাধ্যম সাধারণতঃ ব্যাঙ্কিকের (Banking) আঙ্গিকতা (form) নিয়ে তার কর্মধারা করে। এখানে শিক্ষক (communicator) হলেন জ্ঞানদাতা বা বার্তাকারী। ছাত্র (Depositer) একে সযত্নে গ্রহণ করে, স্মৃতিতে ধরে রেখে পুণরানুশীলন (repeat) করে। এর মাধ্যমে ছাত্ররা (গ্রাহকেরা অথবা recipient) শিক্ষাকের (communicator) উপর সদা নির্ভরশীল হয়।

বিপরীতক্রমে পাউলো ফ্রেইরে যে শিক্ষার কথাবলেন তা শিক্ষার্থীকে চেতনাসম্পন্ন ও সৃষ্টিশীল করে, তাকে বন্ধন মুক্তির সংগ্রামী করে। বিপরীতের জন্য এই শিক্ষা, তৃতীয় বিশ্বের সদ্য স্বাধীন দেশগুলির স্বাবলম্বনের জন্য, ক্ষুধা-দারিদ্র-শোষণের হাত থেকে মুক্তির জন্য এই শিক্ষা।

আগামীদিনের শোষণহীন সমাজের স্বাধীন, মুক্তমর্ণ নাগরিকের 'বিবেকীকরণ' (Conscientisation) শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে জনসংখ্যা শিক্ষা (তথা মানবসম্পদ বিকাশের শিক্ষা) বিষয়কে ভাবতে হবে।

CHAPTER–7

Integration of Elements of Population Education with çurricular and ¢o-curricular areas; some examplar materials

Dr. Shib Prasad Bhattacharya

Uma Das

SUMMARY

I. Integration of Population Education with other subjects.

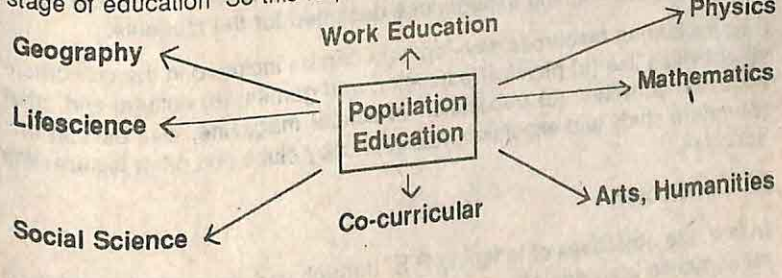
In traditional education knowledge is compartmentalised in different subjects and these subjects seldom intermix; so students get one-dimentional perspective about what they learn. But knowledge is wholistic, and it has therefore multidimentional orientations. Modern education conceives knowledge a totality of experiences.

Hence new approaches, like integrated curriculum, are experimented upon. One way of such integration is correlation; correlation is of three types — simple, concentric and co-ordinated. Gandhiji's Nai Talim is an Indian example of such correlation of subjects around a craft, namely spinning. National Policy on Education, 1986, has also recommended the teaching of history of national integration as a core subject distributed among all traditional subjects taught in schools.

PE for human resource development should be treated an multidiciplinary subject. So human resource development will be a core concept embracing different subjects that the teachers teach in a school. It should also find place in different co-curricular activities organised and experienced by the students.

Integration approach in curriculum development

Curriculum development needs an initial decision about the model to be followed. Learning of Population Education (P E) should go on in every stage of education So this requires an integrated approach in curriculum



(Exhibt) (Exhibxt)

development. This approach conceives PE for human resource development not as a distinct, separate subject of study, but a core subject which is incorporated in all subjects to be learnt by the students in his/her school life. Hence PE is a multidisciplinery subject.

Several examples are given how such inclusion or integration can be made in different curricular co-curricular activities.

II. Curriculum activities and Exemplar material through which P E may be introduced.

In modern education, curriculum is the sum total of all the experiences gathered by the students in an academic session. Such experiences are designed consciously by teachers according to the guidelines provided by the authority like Board/Council of Education and the state curriculum helps the students to develop his/her total personality for individual growth and social participation. Curriculum consists of instruction, evaluation and guidance. Recently audio-visual experiences have been incorporated as an element of curriculum. Population Education (P E) for human resource development can be meaningfully included in class-room instruction by way of explanations and illustrations; also elements of P E may be occasionally be included in the text-book and teacher's manual. Facts/ concepts of P E may be included in the question paper as the context of a question

In guidance, the concerned teachers will point out to his/her students how they can improve the quality of their life & how education transforming their persons into human resources for national development. Audio-visual aids like slide projection, television expose the students to the manifold vistas of the world and its people.

Several examples of instruction of P E through lessons of geography (e.g. "Population and working activities in India") and physical science (e.g. State of atmosphere in relation to society) are provided in Teachers' Hand-books prepared by the population Education cell of the SCERT West Bengal.

III. Co-curricular activities through which P.E. may be taught.

The school should concern itself not only with cognitive, but also with physical, emotional, social develoment of the student. This realization has led the educators to emphasize the importance of co-curricular activities in the learning experiences designed for the students.

P E for human resources development can be included in the co-curricular activities like (a) physical education and games; (b) cultural and other aesthetic activities; (c) publication of school magazine, wall bulletin etc. (d) nature study and excursion; and (e) hobby clubs and other leisure-time activities.

IV. Conclusion :

In fine, the objectives of teaching P E through various curricular and varid co-curricular activities are :

(a) to make the young aware of population as a vital resource;

(b) to develop in them an understanding of the perspective of man in relation to nature and social institutions.

(c) to help them to appreciate the richness of population and to form in them a correct, scientific attitude towards population growth and its consequences;

(d) to grow interest and skills in them qualitative improvement of life of individual, family and society of large; and

(e) to help them realize the relationship of human resource with national development.

In this context,the teachers should endeavour to raise the levels of awareness, understanding and action of parents, community leaders and policy makers to invest in the quality of life of the next generation.

পাঠক্রমিক এবং সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর সহিত জনসংখ্যা—শিক্ষার উপাদানগুলির সমন্বয়করণ; তৎসম্পর্কীয় কিছু উদাহরণ।

ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য
উমা দাস

ক ঃ জনসংখ্যা শিক্ষার সঙ্গে অপরাপর পাঠ্য বিষয়ের সমন্বয়সাধন ঃ (Integration of Population Education with other subjects) :—

গতানুগতিক প্রচলিত পাঠক্রমের সবচেয়ে বড় ত্রুটি হল, এটি বিষয়বিভাজন নীতির (Compartmentalism) উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে শিক্ষণীয় বস্তুগুলি শিক্ষাদানের সুবিধার জন্য কয়েকটি বিষয়ে ভাগ করা হয়, যেমন — ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য প্রভৃতি। প্রকৃত পক্ষে শিক্ষা একটি একক অভিজ্ঞতা প্রবাহ, তাকে এভাবে বিচ্ছিন্ন ও সম্পর্কহীন করা যায় না।

শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতার অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ রাখতে শিক্ষাবিদরা সেজন্য নানাধরণের পাঠক্রমের পরিকল্পনা করেছেন। যেগুলির উদ্দেশ্য হ'ল শিক্ষার্থীর বিভিন্ন অভিজ্ঞতাগুলিকে সুসমন্বিত করে একটি অখণ্ডরূপ দেওয়া। তার ফলে যে নতুন পাঠক্রম গড়ে উঠেছে তাকে সমন্বিত বা সমন্বয়ধর্মী পাঠক্রম (Integrated-curriculum) বলে।

শিক্ষার্থীদের শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে সমন্বিত করে একটি অখণ্ড পাঠক্রম করার পরিকল্পনা প্রথম বাস্তবায়িত করেন জন ডিউই (John Dewey) তাঁর লেবরেটরি স্কুলে।

সমন্বিত বা সমন্বয়ধর্মী পাঠক্রমের আর একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল অনুবন্ধভিত্তিক পাঠক্রম, এই পাঠক্রম অনুবন্ধ (Correlation) নামক একটি বিশেষ-ধরণের শিক্ষণ পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের পাঠক্রম বিভিন্ন বিষয়ের সমষ্টি। হারবার্টের (Herbart) মতে শিক্ষক যখন পড়াবেন, তখন তিনি তাঁর আলোচ্য বিষয়টির সঙ্গে অন্য কোন্ কোন্ বিষয়ের মিল আছে, কি ধরণের সম্পর্ক আছে, তা স্পষ্ট করে উল্লেখ করবেন। কোন কোন বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে ছাত্ররা যেন এরকম মনে না করে যে পাঠক্রমের বিষয়গুলি প্রত্যেকটি পৃথকভাবে এক একটি বায়ুনিরুদ্ধ (airtight) কক্ষে আবদ্ধ, একের সঙ্গে অন্যের সম্পর্ক নেই।

বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে যে সম্পর্ক রয়েছে, সেই বিষয়টি সঠিকভাবে শিক্ষার্থীদের নিকট উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে পাঠপরিচালনাকে অনুবন্ধপ্রণালী (correlation method) বলে। হারবার্টের পরবর্তীকালে তাঁর শিষ্যেরা অনুবন্ধ প্রনালীকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যেমন —

১। সরল অনুবন্ধ (Simple correlation);

২। বিষয়কেন্দ্রিক অনুবন্ধ (Concentration Correlation);

৩। সহযোজন অনুবন্ধ (Co-ordination Correlation);

সরল অনুবন্ধ পদ্ধতিতে পাঠক্রমের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সংযোগটি দেখান হয়. যখন কোন একটি বিষয় (Subject) বা কর্ম (activity) বা একটি শিল্প (craft) কে কেন্দ্র করে পাঠক্রমের অন্যান্য বিষয়গুলি শেখান হয় তাকে বিষয়কেন্দ্রিক অনুবন্ধ পদ্ধতি বলে।

অনেকে অনুবন্ধ পদ্ধতিটি বিষয়ের নির্দিষ্ট একটা গ্রুপ বা দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চান। এই পদ্ধতিকে সহযোজন অনুবন্ধ পদ্ধতি বলে। পাঠক্রমের বিষয়গুলিকে নিম্নানুরূপ কয়েকটি দলে বিভক্ত করা যায়। যথা —

ক। ভাষা ও সাহিত্য ;

খ। গণিত ও বিজ্ঞানধর্মী বিষয়সমূহ ;

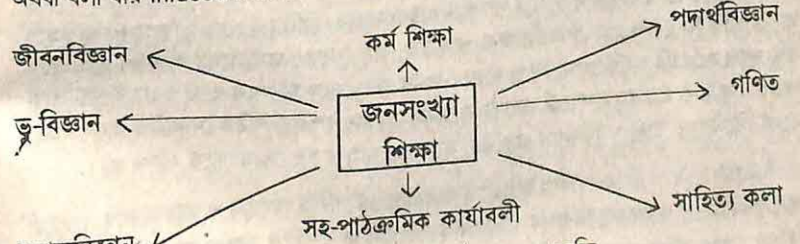
গ। ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি সমাজবিজ্ঞান সমূহ ;

ঘ। ব্যবহারিক (Practical) বিষয় ও কর্মশিক্ষা (Work education);

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্গণ বুনিয়াদী শিক্ষার অনুবন্ধ প্রনালীতে শিক্ষা দেওয়ার কথা বলেন। অনুবন্ধ প্রনালীতে পাঠদানের সময় একটি বিষয় পড়ানোর সময় শিক্ষক সুযোগমত অন্যান্য বিষয়গুলিকে সংলগ্ন করে জ্ঞানের মূলগত অভিন্নতাটি শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরতে পারেন। যেমন — ইতিহাস পড়ানোর সময় সুযোগমত ভূগোল, রাষ্ট্রনীতি, ভূতত্ত্ব, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা ও সম্পর্ক উল্লেখ করা যেতে পারে। তার ফলে শিক্ষার্থীর শিক্ষা কতকগুলো পরস্পর সম্পর্কহীন বিষয় হয়ে ওঠে না বরং শিক্ষণীয় বস্তুগুলোর মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত যোগসূত্র শিক্ষার্থীর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং তার শিক্ষাও একটি সামগ্রিক রূপ পায়।

১৯৮৬-র নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে যে, জাতীয় সংহতি বিষয়টিকে পাঠক্রমের মধ্যে আলাদা কোন বিষয় হিসাবে না রেখে, পাঠক্রমের অন্তর্গত অন্যান্য সকল বিষয়ের সঙ্গে এই বিষয়টিকে সম্পৃক্ত করতে হবে বা অন্যান্য বিষয় পাঠদানের সাথে সাথে এই বিষয়দুটিকে তাদের সঙ্গে সমন্বিত করতে হবে। একইভাবে জনসংখ্যা শিক্ষাবিষয়টিকে আলাদা করে, না করে দেখে পাঠক্রমের অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সমন্বিত করে বা সম্পৃক্ত করে পাঠদানের কথা শিক্ষাবিদগন বলেছেন। জনসংখ্যা সম্পর্কিত নতুন একটি বিষয় পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করে ছাত্র-ছাত্রীদের বোঝা না বাড়িয়ে, পর্যদ অনুমোদিত বর্তমান পাঠক্রমের বিভিন্ন বিষয়ের — ভাষা, গণিত, বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদির মধ্যেই সুযোগ মত শিক্ষক-শিক্ষিকারা বিষয়টিকে তার যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে উপস্থাপিত করতে পারেন, যাতে করে ছাত্র-ছাত্রীরা এ বিষয়ে সম্যক অবহিত হয়। বিভিন্ন শ্রেণীতে পাঠক্রমের বিভিন্ন বিষয় পড়াতে কিভাবে এটা করা যায় তা দেখা যেতে পারে।

জনংখ্যা শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গির পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে হলে একটি পরিলেখ (Pattern) মেনে চলা দরকার। জনসংখ্যা শিক্ষাকে শিক্ষার প্রতিটি স্তরে প্রয়োগ করতে হবে। জনসংখ্যা শিক্ষা বা মানবসম্পদের বিকাশের শিক্ষাকে আলাদাভাবে একটি বিশেষ বিষয় হিসেবে না রেখে অন্যান্য বিষয়গুলি যেমন বিজ্ঞান, ভুগোল, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করে এর দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করতে হবে। তাই জনসংখ্যা শিক্ষা etidisciplinary; বহুবিধ বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত— অথবা বলা যায় infused model. উদাহরণ হিসাবে এখানে পর্যদ অনুমোদিত নবম ও দশম



চিত্র ১ ঃ জনসংখ্যাশিক্ষার পাঠক্রমের প্রকৃতি

শ্রেণীর পাঠক্রমের বিভিন্ন বিষয় পড়াতে গিয়ে কিভাবে তার সঙ্গে জনসংখ্যা শিক্ষা বিষয়টি সম্পর্কে বলা যায় বা অতিরিক্ত তথ্য ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে তুলে ধরা যায় তা দেখা যাক।

নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠক্রমে প্রথম ভাষা হিসাবে 'বাংলা' প্রথম পত্রে প্রবন্ধ রচনা রয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও তার সম্পর্কিত বিষয়বস্তু নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করতে দেওয়া যেতে পারে। এই প্রবন্ধের মধ্যে তৃতীয় বিশ্ব তথা ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির কারণগুলি কি ধরণের সমস্যার জন্য দেখা দেয় এবং এইসব সমস্যা দূর করতে গেলে মানব-সম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি কিভাবে সহযোগিতা করতে পারে তার আলোচনা করা যেতে পারে। সুপরিকল্পিত উপায়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে রোধ করতে গেলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ছাড়া সম্ভব নয়। বিভিন্ন দেশের উন্নতির ইতিহাসে উদাহরণ হিসাবে জনশক্তি এবং গোষ্ঠীর কর্মকুশলতাকে উল্লেখ করা যেতে পারে।

নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠক্রমে ইংরাজী বিষয়টির অন্তর্ভূক্ত Paragraph (অনুচ্ছেদ) এর মধ্যে বাংলা প্রবন্ধের মত বিষয়বস্তু রাখা যেতে পারে। এছাড়া প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠ ও পূর্ণ সদ্ব্যবহার বিষয়ক Paragraphও রাখা যেতে পারে। ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে অশিক্ষা, দারিদ্রতা ও সুস্বাস্থ্যের অভাবগুলি হলো প্রধান সমস্যা, এ বিষয়ে চিঠি লেখা থাকতে পারে। এই একই শ্রেণী গণিতের পাঠক্রমে এমন সব জনসংখ্যা সম্পর্কিত সমস্যা তুলে ধরা হবে যেগুলোর সামাজিক ও বাস্তব ভিত্তি রয়েছে। দেশের আয়তন, জনসংখ্যার গুণগত সম্পর্কিত বিষয়, দেশের খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ ও, তার বণ্টন ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয় বিশেষত পাটিগণিতের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে রাখা যায়।

তেমনি নবম ও দশম শ্রেণীর ভৌত বিজ্ঞানের পাঠক্রমের মধ্যে 'পদার্থ ও শক্তি' (matter and energy) বিষয়টি রয়েছে। কিভাবে শক্তি সংরক্ষণ করা যায় তা বোঝানো হয়েছে। এ ব্যাপারে ছাত্র-ছাত্রীদের কোন গোবর গ্যাস প্লান্টে নিয়ে গেলে তারা বুঝতে পারবে কিভাবে শক্তির অপচয় রোধ করা যায়। তাছাড়া সৌরচুল্লী (Solar Furnace) ব্যবহার করলে বায়ুদূষণ রোধ করা সম্ভব এবং আমাদের দেশের জ্বালানী সমস্যা ও যা দুর করতে সাহায্য করবে। এছাড়া 'পরমাণুর গঠন' বোঝাতে গিয়ে নিউক্লিয়শক্তির (Nuclear-Energy) ভাল-মন্দ ব্যবহারগুলি সম্পর্কে ধারণা হয়। কার্বন ও সালফারের উৎস ও ব্যবহার সম্পর্কে বলতে গিয়ে কার্বনের বিভিন্ন রূপ ও তাদের শিল্পে ব্যবহার এবং ভারতের কোথায় কোথায় কয়লা পাওয়া যায় এ সম্পর্কে ধারণা হয়। রান্নার কাজে কয়লা, মোটর গাড়ীর পেট্রোল পুড়িয়ে যে কার্বন-ঘটিত গ্যাস হয় কিভাবে তা থেকে বায়ুদূষণ হয় সে সম্পর্কে সচেতনতা গড়া যায়।

নবম ও দশম শ্রেণীর জীবন বিজ্ঞানের পাঠক্রমের অর্ন্তভূক্ত উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ বিষয়টির আলোচনায় সালোকসংশ্লেষের ফলে কিভাবে পরিবেশে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেনের ভারসাম্যতা রক্ষা হচ্ছে এবং বনজ-সম্পদ ধ্বংস করলে এই ভারসাম্যতা নষ্ট হবে ও মানবজাতি বিপদের সম্মুখীন হবে এ সম্পর্কে ধারণা জন্মায়। বিভিন্ন ধরণের ভাইরাসের আক্রমণে মানুষের কি কি রোগ হয়, এমন কি জল, খাদ্যদ্রব্য, বায়ু থেকেও ভাইরাসের আক্রমণ হয়ে থাকে যার ফলে মহামারি পর্যন্ত দেখা দিতে পারে। এদের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করার উপায় জানা জরুরী। বৃদ্ধি ও প্রজনন সম্পর্কে আলোচনা কালে প্রজনন সম্পর্কে সঠিক বৈজ্ঞানিক ধারণা লাভ, ইকো-সিস্টেমের মাধ্যমে কিভাবে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষিত হয় সে সম্পর্কে ধারণা হয়।

এছাড়া নবম ও দশম শ্রেণীর ইতিহাসে ভারতের ভৌগলিক অবস্থান ও তার জনগণ সম্পর্কে আলোচনাকালে ভারতের নিরাপদ ভৌগলিক অবস্থান ও প্রকৃতির অতুল সম্পদের প্রাচুর্য যা বিভিন্ন সময়ে বহিরাগতদের আকৃষ্ট করেছে ও তারা এসে ভারতে একাত্ম হয়েছে সে সম্পর্কে

বলা যায়। অধিক সংখ্যক প্রাকৃতিক সম্পদ এদেশের জনগনের মনে আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব সৃষ্টি করেছিল ফলে প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানব-সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার হয়নি। প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার থেকে নগরসভ্যতা এলো। অশোক, সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে বস্তুগত সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার হয়েছিল, ফলে দেশের উন্নতি হলেও জনগনের মধ্যে পরিচ্ছন্ন বন্টন ব্যবস্থার অভাব ছিল।

এই একই আলোচ্য শ্রেণীর ভূগোলে ভারতের প্রধান প্রধান বন্দর ও শহরগুলিতে জনসংখ্যা বিভাজন ও জনসংখ্যার ঘনত্ব সম্পর্কে আলোচনার সময় শহরগুলিতে লোকসংখ্যা কেন দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে এবং তার ফলে শহরগুলিতে কি ধরণের সমস্যা দেখা দিচ্ছে তা আলোচনা করা যায়। এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে জন-সম্পদ বা মানব-সম্পদে পরিণত করা ও প্রাকৃতিক সম্পদের সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রাখা আমাদের প্রধান কর্তব্য। তাছাড়া প্রাকৃতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈচিত্র্যের ফলে কোথাও কোথাও জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ঘটেছে, আবার কোথাও কোথাও জনসংখ্যা হ্রাস হয়েছে। এর ফলে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদের সঙ্গে কিভাবে জন-সম্পদের উন্নয়ন বা বিকাশ ঘটান যায়,, প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করা দরকার। সেই সঙ্গে শহর বন্দরগুলিতে পরিবেশ দূষণ সম্পর্কেও আলোচনা করা যেতে পারে।

এছাড়াও নবম ও দশম শ্রেণীতে কর্মশিক্ষা,শারীরশিক্ষা ও সমাজসেবামূলক বিভিন্ন কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। কর্মশিক্ষা কর্মসূচীতে বিদ্যালয়ে সাবান, ফিনাইল কালি প্রভৃতি প্রস্তুত করা শেখানো হয়ে থাকে। আমাদের দেশে বেকারি সমস্যা একটা বিরাট সমস্যা। জনসংখ্যা বাড়ছে, শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাও বাড়ছে, অথচ উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত। শিক্ষার্থীরা কর্মশিক্ষার পাঠক্রম থেকে সাবান, ফিনাইল, কালি প্রভৃতি প্রস্তুত করা ভাল করে শিখে নিয়ে বাড়ীতে ছোটখাট কুটির শিল্প গড়ে কিছুটা অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জন করতে পারে, ফলে শিক্ষার মাধ্যমে মানব-সম্পদ উন্নয়নের কাজটি সফলতা পেতে পারে।শারীর শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নিজেদের সুস্থ শরীর সম্পর্কে সচেতন করার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশীদের সুস্থতার প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। কিভাবে সংক্রামক ব্যাধি থেকে নিজেকে ও অন্যান্যদের রক্ষা করা যায় সে সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে। বিদ্যালয়ে সমাজসেবা কর্মসূচীর মাধ্যমে আশেপাশের পরিবেশকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, সাক্ষরতা কর্মসূচী গ্রহণ করা যেতে পারে। নাগরিক সচেতনতা জাগানো প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, ভূমিক্ষয় রোধ করা, বনসৃজন প্রভৃতি কর্মসূচী গ্রহণ করা যায়।

খ. উদাহরণ সহ পাঠক্রমিক কার্যাবলী (curricular activities and examplar materials) —

পাঠক্রমিক কার্যাবলী বলতে কি বোঝায় তা বুঝতে গেলে তার আগে পাঠক্রম সম্পর্কে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। পূর্বে পাঠক্রম বলতে মনে করা হত কেবল কতকগুলো পঠনীয় বস্তু বা তথ্য যেগুলির সাহায্যে শিক্ষার্থী কতকগুলো বিশেষ জ্ঞান লাভ করবে। ফলে গতানুগতিক পাঠক্রমটি কতকগুলো বিশেষ বিশেষ তথ্য ও জ্ঞানের একটা সুনির্দিষ্ট তালিকা ছাড়া আর কিছু ছিল না। শিক্ষার্থীর রুচি, আগ্রহ সামর্থ বা প্রয়োজনের সঙ্গে তার যেমন কোন যোগসূত্র ছিল না তেমনি শিক্ষার্থীর বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গেও তার কোন সঙ্গতি ছিল না।

আধুনিক ধারণা অনুযায়ী বিষয়বস্তু হল পাঠক্রমের অংশমাত্র। শিক্ষার্থীরা শিক্ষালয়ে এবং সমাজে যা কিছু শিক্ষকের চালনায় শেখে তাই হল তার পাঠক্রম। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পারস্পরিক ক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যা শেখে, তাই পাঠক্রমের অন্তর্গত। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও সমাজ পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের প্রক্রিয়ার ফলে যে অভিজ্ঞতা হয় পাঠক্রম হল সেইসব অভিজ্ঞতার সমবায়। পাঠক্রমিক কার্যাবলী বলতে বোঝায় —

পাঠক্রমিক কার্যাবলী
(Curricular Activities)

ক. শিক্ষণমূলক কর্মসূচী (Instructional Programme)

খ. নির্দেশনামূলক কর্মসূচী (Guidance Programme)

গ. পরীক্ষা ও মূল্যায়ন (Examination and Evaluation)

ঘ. শ্রবন-দর্শন কর্মসূচী (Audio-visual Programme)

এখন এগুলি নিয়ে আমরা আলোচনা করব।

ক. শিক্ষণমূলক কর্মসূচী ঃ

এই কর্মসূচীর প্রধান কাজ হল পাঠক্রমের উপর ভিত্তি করে পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করা এবং শিক্ষকদের দ্বারা শিক্ষণকার্য সম্পন্ন করা।

খ. নির্দেশনামূলক কর্মসূচী ঃ

দৈনন্দিন বিদ্যালয় কার্য পরিচালনা করা এবং ছাত্রদের শিক্ষাগত ও ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধানে পরামর্শদান।

গ. পরীক্ষা ও মূল্যায়ন ঃ

প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, উত্তরপত্র পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ এবং যথাসময়ে ফল প্রকাশিত করা। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের সারাবছরের কর্মদক্ষতায় সর্বাত্মক পরিচয়পত্র (Cumulative Record Card) তৈরী করা এই কার্যের অন্তর্ভূক্ত।

ঘ. শ্রবন-দর্শন কর্মসূচী ঃ

আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি বিদ্যার (যথা – চার্ট, মডেল, স্লাইড, প্রজেক্টর, ভিডিও, টেপ ইত্যাদির) সাহায্যে বিদ্যালয়ে পঠনীয় বিষয়গুলি শেখানো যেতে পারে। নিজ নিজ শ্রেণীকক্ষে উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকেরা এই ধরণের পাঠদান করতে পারেন। ফলে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠে। শিক্ষাদান কার্যটিও একঘেয়ে হয়ে ওঠে না।

একটি নমুনা পাঠ-পরিকল্পনা

পাঠটীকা — ১

শ্রেণী - দশম

বিষয় ঃ ভূগোল

বিশেষ বিষয় ঃ ভারতের জনসংখ্যা ও মানবজীবিকা।

উদ্দেশ্য

(1) প্রত্যক্ষ — প্রাকৃতিক আবহাওয়া কিভাবে জনসংখ্যার বিতরণ ও মানবজীবিকা নিয়ন্ত্রণ করে ইহা বুঝতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা।

(2) পরোক্ষ — ভবিষ্যৎ নাগরিকদের সমগ্র পৃথিবীর দৃশ্যপট নির্ভুলভাবে কল্পনা করতে সাহায্য করা ও ইহার যাবতীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবলীকে শুভবুদ্ধির সহিত অনুধাবন করতে অনুপ্রাণিত করা।

উপকরণ — ভারতের বৃষ্টিপাতের মানচিত্র ও বনজ সম্পদ ; ভারতের রেখাঙ্কিত মানচিত্র কালি ; কাপড়িস ; মানবজীবিকার বিভিন্ন চিত্র ; দুটি ফটোগ্রাফ — অরন্যবাসীদের ও নগরবাসীদের জীবনযাত্রা নির্দেশক শ্রেণীকক্ষের অন্যান্য সাধারণ উপকরণ।

আয়োজন — শিক্ষক মহাশয় ছাত্রদের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা করে তাদের মন অদ্যকার পাঠ্যাভিমুখী করবার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করবেন ঃ—

(i) ভূ-প্রকৃতি অনুসারে ভারতকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?

(ii) কোন্ জলবায়ুর পর্যায়ে ভারতকে ফেলা যায়?

(iii) ভারতকে মৌসুমী জলবায়ুর দেশ বলা হয় কেন?

(iv) মৃত্তিকার গুণাগুণের ওপর দেশের কি নির্ভর করে?

পাঠঘোষণা ঃ 'আজ আমরা ভারতের মানবজীবিকা ও জনসংখ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করব' — এই বলে শিক্ষক মহাশয় পাঠ ঘোষণা করবেন।

উপস্থাপন —

অগ্রগতি মূলক প্রশ্ন	সম্ভাব্য উত্তর
1. শিক্ষক মহাশয় দুটি রঙীন ফটো ক্লাশে উপস্থিত করবেন নিম্নরূপ প্রশ্ন করে দ্রষ্টব্য বস্তুতে ও পাঠ্যবস্তুতে আগ্রহ সঞ্চার করবেন ও শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করবেন ঃ—	
(i) প্রথম চিত্রে কি দেখছ?	(i) একজন অর্ধনগ্ন অরন্যবাসী পুরুষ-স্ত্রী শুষ্ক ভূমিতে শিকার খুঁজছে।

অগ্রগতি মূলক প্রশ্ন	সম্ভাব্য উত্তর
(ii) দ্বিতীয় চিত্রে	(ii) স্কুল পোষাক পরা বালক-বালিকা গৃহে পিতা-মাতার সহিত আহাররত।
(iii) দুইটি চিত্রে কোন্ কোন্ বস্তু চোখে পড়ে?	(iii) মানুষ, খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় ও শিক্ষা।
(iv) আমাদের প্রত্যেকের কি এইগুলি আবশ্যক?	(iv) সবগুলিই মানুষের প্রাণধারণের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তু।
(v) দ্বিতীয় চিত্রে মানুষের সংখ্যা বেশী দেখা যায় কেন?	(v) সম্ভবতঃ জলবায়ু অনুকূল, যেমন জানালা দিয়ে গাছপালা, বাগান ইত্যাদি বোঝা যায়, মানুষ খাদ্যও বেশী পায়।
(vi) মানুষ খাদ্য, বস্ত্র কিভাবে সংগ্রহ করে? শিক্ষক নির্দেশ দেবেন – কোন স্থানের জনসংখ্যা সেইস্থানের খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়ের উপর নির্ভর করে বা জীবিকার উপায়ের উপর নির্ভর করে।	(vi) কাজ করে – শিল্প, কৃষি পশুচারণ, ফলমূলসংগ্রহ ইত্যাদির দ্বারা
শিক্ষকমহাশয় একটি কাপ ডিসের উপর উপুড় করে রাখলেন। কাপের উপর কিছু বালি ছড়ালেন। শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য করতে বললেন।	
(i) বালি কোথায় জমা হচ্ছে? কল্পনা কর বালিকণাগুলি আমাদের পূর্ব-পুরুষ, কাপের উচ্চ অংশটি হিমালয় সংলগ্ন উচ্চভূমি এবং ডিসটি নদী অববাহিকাগুলি।	(i) নীচে, ডিসের উপর
(ii) বল, পূর্ব পুরুষেরা কোথায় বসবাস শুরু করলেন?	(ii) নদী অববাহিকায়।
(iii) ভূ-প্রকৃতি কিরূপে জনসংখ্যা বিতরণ নিয়ন্ত্রণ করে? শিক্ষক মহাশয় ভারতের বৃষ্টিপাত ও বনজ-সম্পদের মানচিত্রে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকৃষ্ট করে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করবেন :–	
(iv) ভারতের কোন স্থানটি বৃষ্টি বহুল ও জনবিরল?	(iv) নেফা, সেখানে ঘনবন আছে।
(v) কোন স্থানগুলি শুষ্ক ও বনহীন	(v) রাজস্থান, দাক্ষিণাত্যের শুষ্ক মধ্যভাগ এখানে কৃষিকাজ সহজ নয়।
(vi) কোন্ স্থানগুলি জনবহুল শিক্ষক মহাশয় তাদের অর্জিত বিষয়টি যথাযথ করতে সাহায্য করলেন ও ব্ল্যাকবোর্ডে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি লিখলেন :- ভারতের শতকরা ৭৫ জন গ্রামে বসবাস করে। তিনি বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন জীবিকার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিলেন।	(vi) গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র নদীঅববাহিকা সমুদ্র উপকূল ভাগ। কৃষ্ণা গোদাবরী ব-দ্বীপ অঞ্চল।

অগ্রগতি মূলক প্রশ্ন	সম্ভাব্য উত্তর
	অঞ্চল — জনসংখ্যার ঘনত্ব (ক) পশ্চিমবঙ্গ, বিহার উত্তরপ্রদেশ, ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা — ৪০০ জন প্রতি বর্গ মাইলে (খ) দাক্ষিণাত্যের মালভূমি — ২০০-৪০০ জন (গ) মালব, মেবার মালভূমি — ১০০-২০০ জন (ঘ) থর মরু — ০-১০০ জন (ঙ) প্রধান প্রধান শহরগুলিতে মোট জনসংখ্যা — মোট জনসংখ্যা ৫-১০ লক্ষ (চ) কলিকাতা, দিল্লী বোম্বাই — ৪০-৮০ লক্ষ
(vii) গ্রামীন জনসংখ্যার জীবিকা অর্জনের উপায় কি ?	(vii) কৃষি ও কুটির শিল্প
(viii) শহরাঞ্চলের অধিবাসীদের জীবিকার উপায় কি?	(viii) পেশা বানিজ্য, শিল্প, ব্যবসা ইত্যাদি।
III শিক্ষক মহাশয় প্রধান প্রধান জীবিকার বিশেষত্বগুলি আলোচনা করলেন। শিক্ষার্থীদের পূর্ব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগালেন।	
(ক)কৃষিজীবী	(ক)চাষীরা ছয়মাস কাজ করে। মৌসুমী বৃষ্টি পাতের উপর তারা নির্ভরশীল। যদি বর্ষণ নিয়মিত সময় ও পরিমাণে আসে তবে ভাল ফসল ফলে। তারা দৈনিক ৮ ঘণ্টা পরিশ্রম করে কলকারখানা অফিস বা তৎসংলগ্ন উপজীবিকায় এরা শিল্পকেন্দ্রের নিকটেই বাস করে।
(খ) শিল্পজীবী (i) কিভাবে বিভিন্ন পরিবেশ বিভিন্ন মানবজীবন যাত্রা সূচিত করে ?	(i) জীবিকা বিভিন্ন হওয়ায়, কোন স্থানে ইহার প্রাচুর্যের ফলে জনসংখ্যা বেশী, অন্যস্থানে জনসংখ্যা কম।
শিক্ষক মহাশয় বোর্ডে একটি তালিকা লিখলেন	জনসংখ্যার শতকরা
কৃষিজীবী	” ” ৭৫ ভাগ
শিল্পশ্রমিক	” ” ১২ ভাগ
শিল্প ব্যবসায়ী	” ” ৭ ভাগ
খনি মজুর	” ” ৩ ভাগ
যাতায়াত শ্রমিক	” ” ১.৫ ভাগ
অফিস কর্মী	” ” ১.৫ ভাগ
	মোট ১০০ ভাগ

অগ্রগতি মূলক প্রশ্ন	সম্ভাব্য উত্তর
অভিযোজন শিক্ষকের অংশ শিক্ষক মহাশয় অধীনত তথ্যগুলি প্রশ্নদ্বারা জেনে সুসংবদ্ধ করে ব্ল্যাকবোর্ডে সংক্ষিপ্ত আকারে লিখবেন।	**শিক্ষার্থীর অংশ** (i) মানুষ জীবিকার দ্বারা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান সংগ্রহ করে। শিক্ষাদ্বারা জীবিকার জন্য জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করা যায়। (ii) যে স্থানে উপরোক্ত বস্তুগুলি পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী, উপায়ও বেশী সে স্থানে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশী। (iii) ভারতের গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা ও সমুদ্র তটবর্তী অঞ্চল ঘনজন অধ্যুষিত, দক্ষিণভারত কম জনবহুল ·রাজস্থান ও অরুনাচল জনবিরল।
পাঠ্যবিষয়টি শিক্ষার্থীরা বুঝেছে শিক্ষক মহাশয় ইহা জানলেন।	(iv) শতকরা ৭৫ ভাগ কৃষিজীবিও তারা গ্রামে বাস করে।

বাড়ীর কাজ ঃ–

শিক্ষার্থীদের অনুশীলনের জন্য কয়েকটি ক্ষুদ্র অভীক্ষা দেওয়া হল ঃ –

রেখাঙ্কিত মানচিত্রে ভারতের সবচেয়ে জনবহুল, মধ্যম শ্রেণীর জনবহুল ও জনবিরল স্থানগুলি চিহ্নিত কর।

স্তম্ভ তিনিটির অন্তর্ভূক্ত উপাদানগুলি যথাযথ পরস্পর সংলগ্ন কর।

স্তম্ভ ১ জীবিকা	স্তম্ভ ২ অঞ্চল	স্তম্ভ ৩ জনসংখ্যার ঘনত্ব
অ) ধান চাষ	ক) পঃ বঙ্গের মেদিনীপুর	চ) কম
আ) পশুচারণ	খ) বিহারের ধানবাদ জেলা	ছ) মধ্যম
ই) খনিকার্য	গ)	জ) বেশী

[সম্ভাব্য উত্তর ঃ ⓐঅ → ক → জ]

গ ঃ উদাহরণ সহ পাঠক্রমিক কার্যাবলী ঃ (Co-curricular activities with examplar materials)

আধুনিককালে শিক্ষার ভাবধারায় অনেক পরিবর্তন হয়েছে। শিক্ষা বলতে শিশুর ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের প্রচেষ্টাকে বোঝায়। আধুনিক শিক্ষাবিদদের মতে শুধুমাত্র মনের বিকাশকেই শিক্ষা বলে না, শিক্ষা ব্যক্তির জীবন সত্তার সমস্ত দিকগুলিরই (যথা দেহ-মন-মূল্যবোধ) সর্বাঙ্গীন বিকাশ ঘটায়। এই সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য সার্থক শিক্ষার পাঠক্রমে শিশুর মানসিক বিকাশ, সামাজিক বিকাশ অবসর-যাপনের ক্রিয়াকলাপের বিকাশ প্রভৃতি সমস্ত দিকগুলির সমান ভাবে উন্নতি সাধনের ব্যাপককর্মসূচী নিতে হবে। আধুনিক শিক্ষার এই উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে বর্তমানে শিক্ষাবিদরা বিদ্যালয়ের কার্যাবলীর মধ্যে লিখন – পঠন-পাঠন ছাড়া ও খেলাধূলা, অভিনয়, বিতর্কসভা ভ্রমণ বিভিন্ন বৃত্তিকেন্দ্রিক কাজকে স্থান দিয়েছে্ল প্রথম দিকে এগুলি

বিদ্যালয়ের নির্ধারিত পাঠক্রমের বাইরে অতিরিক্ত কার্যাবলী বলা হত বলে এদের বহিঃ পাঠক্রমিক কার্যাবলী (Extra-curricular activities) বলা হত। কিন্তু বর্তমানে বিদ্যালয় জীবনের সমস্ত কিছু কাজ, সমস্ত অভিজ্ঞতাকেই পাঠক্রমের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলা হচ্ছে। এদের গুরুত্বের কথা মনে রেখে শিক্ষাবিদরা এদের সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী (Co-curricular activities) বলছেন।

আমাদের দেশের ছাত্র ছাত্রীদের জনসংখ্যাও তদ্‌ভুত সমস্যাবলী সম্পর্কে কিছুটা অবহিত করে তোলার জন্য কেন্দ্রিয় সরকার ও জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্যদের (NCERT) সহযোগিতায় বিভিন্ন রাজ্যে জনসংখ্যা শিক্ষা (Population Education) গত কয়েকবছর ধরে চালু করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে আমরা এটিকে কিছুটা পরিবর্তিত করে "মানব-সম্পদ বিকাশের জন্য শিক্ষামূলক প্রকল্প (An Educational Project for Human Resource Development) হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে আমরা মানব-সম্পদের পরিপূর্ণ বিকাশের ও সদ্‌ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের সামনে আজ যে সব সমস্যা রয়েছে সেগুলির কিভাবে সমাধান হতে পারে, তারই উপর গুরত্ব দেওয়ার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

১৯৮৩ সালে ফিজি দ্বীপপুঞ্জের সভাতে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কো [UNESCO] আয়োজিত জনসংখ্যা সম্পর্কিত কর্মশালার কয়েকটি সুপারিশ অনুসারে রচিত রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (State Council of Edu. Research & Training, SCERT) কর্তৃক প্রকাশিত 'শিক্ষণ সহায়িকা' পুস্তিকা থেকে বর্দ্ধিত জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশিত জরুরী কার্যক্রমগুলি নিম্নে দেওয়া হল –

বর্দ্ধিত জনসংখ্যার প্রেক্ষাপটে যে কার্যক্রম অনুসরণ করা আজ জরুরী ঃ

১) সার্বিক সুশিক্ষার ব্যবস্থা, বিশেষ করে নারী শিক্ষার প্রসার।

২) প্রতিটি নাগরিকের জন্য উন্নত স্বাস্থ্য বিধিপালনের সুযোগদান, দুষনমুক্ত পরিবেশে বাসস্থানের সুব্যবস্থা।

৩) উন্নয়নের সুফল দেশের জনসাধারণের গরিষ্ঠ অংশ দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে পৌছে দেওয়া।

৪) পরিবেশের সাথে সুসমঞ্জস সম্পর্ক বিধান করে চলা, প্রাসঙ্গিক কিছু কর্মসূচী ঃ

ক) শক্তি সংরক্ষণের কর্মসূচী।

খ) ভূমিক্ষয় রোধ এবং মরুবিস্তার রোধ।

গ) বনসংরক্ষণ।

ঘ) বন্যপ্রাণী এবং উদ্ভিদ সংরক্ষণ।

ঙ) বাতাস, জল, খাদ্যের দূষণ নিবারণ।

৫) শক্তি ও সম্পদের অপব্যবহার এবং অপচয় নিবারণ।

৬) সুষ্ঠ উন্নয়ন পরিকল্পনা যার মধ্যে প্রধান হল অর্থনৈতিক পরিকল্পনা।

৭) মানব-সম্পদ এবং অন্যান্য সম্পদের সুষ্ঠবিকাশ সাধন, এসবের যথাযথ প্রয়োগ এবং সযম বণ্টনব্যবস্থা।

আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যকে অনুভব করার মাধ্যম হল সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী। শিক্ষার্থীর সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের উন্নতি, যথা – শারীরিক বৌদ্ধিক, ভাবগত, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক বিকাশ সহ পাঠক্রমিক কার্যাবলী একান্ত সহায়ক। বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের উন্নয়নের এবং বিকাশশীলতার অন্য উৎস হল ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়তি কর্মশক্তিকে কাজে লাগানো।

পাঠক্রমিক ও সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এদের আলাদা করে ভাবা ঠিক নয়। প্রত্যেকের সহ পাঠক্রমিক কার্যাবলীর উৎস পাঠক্রমিক কার্যাবলী।

সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর উদাহরণ ঃ

(১) খেলাধূলা ও শরীর চর্চা

(ক) মুক্ত পরিবেশে খেলাধূলা ঃ যেমন ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস, ব্যাডমিন্টন, সাঁতার ইত্যাদি এবং অন্তর্গৃহমূলক খেলাধূলা ঃ– যেমন – ক্যারাম, টেবিলটেনিস,দাবা ইত্যাদি।

(খ) দৌড়-ঝাঁপ, সাঁতার, সাইকেল চালান ক্যারাটে লাঠিখেলা ইত্যাদি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

(২) সভা, সম্মেলন, সাক্ষরতা ও শিক্ষামূলক কার্যাবলী ঃ

সাহিত্যসভা, শিক্ষামূলক সম্মেলন, বিতর্ক সভা প্রদর্শনী, সাক্ষরতা বিষয়ক আলোচনাসভা ও অন্যান্য শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান।

(৩) সাংস্কৃতিক ও নান্দনিক উন্নতির কার্যাবলী ঃ–

বিদ্যালয় অলংকরণ, পুষ্প প্রদর্শনী, কৃষ্টিমূলক প্রদর্শনী, মেলা, সৃজনমূলক কর্মপ্রচেষ্টা, অভিনয়, নৃত্য গীত, আবৃত্তির মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা প্রভৃতি।

(৪) দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশন ঃ–

স্বরচিত গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, একাংক নাটক, ছড়া প্রভৃতি সৃজনমূলক লেখা নিয়ে দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ করা।

(৫) সমাজ-কল্যাণকর ও নাগরিক দায়িত্ব সম্পর্কিত কার্যাবলী ঃ–

জনস্বাস্থ্য রক্ষণ ও উন্নয়নের প্রচেষ্টা, জনশিক্ষা প্রসারের উদ্যোগ, নিরক্ষরতা ও কুসংস্কার দূরীকরণ, গ্রামোন্নয়নে অংশগ্রহণ, সমবায় সমিতি, নাগরিক স্বাস্থ্য সচেতনতা কর্মসূচী, রেডক্রস, ফার্স্ট-এড, এন-এস-এস, পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ, বিভিন্ন প্রজেক্ট পরিচালনা প্রভৃতি।

(৬) ভ্রমণ ও প্রকৃতি-বীক্ষণ ঃ–

ঐতিহাসিক বা সাংস্কৃতিক স্থান ভ্রমণ, চড়ুইভাতি, যাদুঘর, চিড়িয়াখানা প্রদর্শন, স্কাউটিং গার্লস গাইড ইত্যাদি।

(৭) অবসরকালীন কার্যাবলী ঃ–

ডাকটিকিট সংগ্রহ, মুদ্রা সংগ্রহ জীবাশ্ম, ছবি ইত্যাদি আকর্ষণীয় বিষয় সংগ্রহ।

বর্তমানে বিদ্যালয়ে যে সমস্ত সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী সংঘটিত হয়ে থাকে, সে সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। **বর্তমানে আমাদের দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের জনসংখ্যা ও উদ্ভূত সমস্যাবলী সম্পর্কে জানানো খুবই প্রয়োজন। শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও অবকাশকালীন বিনোদন জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রকৃষ্ট উপায়।** বিভিন্ন শ্রেণীতে পাঠক্রমের বিভিন্ন বিষয় পড়াতে গিয়ে কিভাবে এটা করা যায় এবং কী ধরণের অতিরিক্ত তথ্য তাদের সামনে তুলে ধরা যায় তারই নমুনা পাঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে পূর্ব অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে। এখন বিদ্যালয়ের সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর মধ্যে কিভাবে এটা করা যায় ও কি ধরণের কর্মসূচী শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা যায় তা দেখা যাক।

বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সভা, সম্মেলন, বিতর্কসভা ও শিক্ষামূলক নানান কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে শক্তি সংরক্ষণের বিভিন্ন উপায় ও পন্থা বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। বনসংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার উপরে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা করা যেতে পারে। বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদ

সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে নাট্যাভিনয়, নৃত্য গীত ও আবৃত্তির মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করা যেতে পারে। এছাড়া বাতাস, জল ও খাদ্য দুষণ সম্পর্কে নাগরিক সচেতনতা জাগরণের জন্য বিভিন্ন প্রজেক্ট পরিচালনাবা আলোচনা সভা করা যেতে পারে। নির্বিচার প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার প্রাকৃতিক ও জৈবিক ভারসাম্য ক্ষুণ্ণ করে। জনসংখ্যার যথেচ্ছ বৃদ্ধির সাথে সাথে শিশু ও বৃদ্ধদের সংখ্যাধিক্য ঘটে এবং মানব-শক্তির আনুপাতিক হ্রাস ঘটে। অপর পক্ষে নিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যায় শ্রমসক্ষম ব্যক্তি সংখ্যার (যথা ১৫-৪৫ বয়স্ক নরনারীর) আনুপাতিক হার বৃদ্ধি হয় যা জাতীয় বিকাশের বিশেষ সহায়ক।

(ঘ) উপসংহার (Conclusion)

এতক্ষণ আমরা জনসংখ্যা, শিক্ষার সঙ্গে অন্যান্য পাঠ্যবিষয়ের সমন্বয়করণ, পাঠক্রমিক এবং সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে জনসংখ্যা শিক্ষার সংযোগ কিভাবে ঘটানো যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করেছি। সবশেষে জনসংখ্যা শিক্ষার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

১) সমস্যা সচেতনতা (Problem awareness)

বর্দ্ধিত জনসংখ্যার ফলে উদ্ভূত সমস্যাবলী সম্পর্কে সচেতনতা জাগানো।

২) জ্ঞান ও বোধলাভ (Knowledge and understanding)

জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য দায়ী প্রাকৃতিক, আর্থ সামাজিক ধারণাগুলো সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

৩) মর্ম উপলব্ধি করা এবং মনোভাব গঠন (Appreciation and attitude formation)

শিক্ষার্থীদের সমস্যার বাস্তবতা উপলব্ধি করা এবং এর জীবনের গুণমানের প্রতি ধনাত্মক মনোভাব ও জীবনের অপচয়ের প্রতি ঋণাত্মক মনোভাব গড়ে তোলা। জনসংখ্যার ব্যাপ্তি বিস্তার এবং জীবনযাপনের উৎকর্ষতার মধ্যেকার সম্পর্ককে উপলব্ধি করা।

৪) আগ্রহ ও দক্ষতা (Interests and skills) :

জনসংখ্যাকে জন-সম্পদ হিসাবে চিহ্নিত করণ ও জনকল্যাণ কর্মের প্রতি উপযুক্ত আগ্রহ এবং দক্ষতা অর্জনে উৎসাহিত করা।

৫) জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে জাতীয় উন্নয়নের সম্পর্ক উপলব্ধি করা (Realizing the relation of population growth with national development).

দেশের জনসংখ্যা যথেচ্ছ বৃদ্ধি বা হ্রাস পেলে জাতীয় উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হয়।

শিক্ষা ও গণচেতনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যাকে মানব-সম্পদরূপে গণ্য করলে, ভারতের জাতীয় জীবনে সার্বিক বিকাশ নিশ্চিত। শিক্ষকেরা বর্তমান ও ভবিষ্যত ভারতের রূপকার। তাঁদের কাজ হবে শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ের গুরত্ব সম্পর্কে অবহিত করানো এবং পাঠ্যবিষয়ের আলোচনা কালে সুযোগমত জনসংখ্যা শিক্ষা বিষয়টি তাদের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোচনা করা। এজন্য শিক্ষককে বিভিন্ন পদ্ধতি ও শ্রবণ, দর্শন, মাধ্যম ও অন্যান্য গণমাধ্যমগত উপাদানের সাহায্য নিতে হবে। অভিভাবকদের বৃহৎ অংশ নিরক্ষর ; তারা একদিকে শোষণ-বঞ্চনা দারিদ্রের বন্ধন থেকে মুক্তিকামী, অন্যদিকে জড় সমাজের বিধান — প্রথাগত সংস্কারের প্রভাবে প্রায়শই নিয়তিবাদী।

শিক্ষকদের এ কারণে শিক্ষার্থীর বাবা মা এবং বিদ্যালয় সংলগ্ন অঞ্চলের নরনারীর মধ্যেও জনসংখ্যা শিক্ষার যৌক্তিকতার চেতনা মানব সম্পদ হিসাবে গ্রহণ করে ছড়িয়ে দিতে হবে। যাতে বিদ্যালয়ের, শিক্ষা এবং গৃহের প্রতিপালন পরস্পরের পরিপূরক হয়।

APPENDIX-I

List of Dotoral thesis on Population Education in Indian Universities

Collected BY :

Dr. Siba Prasad Bhattacharya Dhiraj Kr. Bandyopadhyay. Barnali Das

Sl. No.	Researcher	Title	Year	Remarks
1.	Nanavati, U. R.	To develop a learning package on Population Eduction and study its effectiveness, Phd. Edu, SGU	1981	The major objectives were (1) to develop a multimedia package on population education (2) to find out its effectiveness in terms of achievement.
2.	Sattarshakwala, H. G.	Trying out a strategy of bringing about Attitudinal Changes in the content of Population Education Phd. Edu, SGU	1981	
3.	Bhandarkar, K. M.	A study of Population Education knowledge and Attitudes of secondary school studies and Teachers, Bhopal U Phd. Edu.	1983	
4.	Kumar, K	Teaching of Populatin Education	1984	The hypothesis were (1) There will be no significant difference between the scores obtained on the attitude scale towards family planning by the subjects of high, middle and low socio economic status experimental group and control group in pre and post testing.

				(2) *There will be no significant difference between the scores obtained on the attitude scale towards family planning by the subjects of rural, sub-urban and urban experimental group and* control group in pre and post testing. (3) There will be no significant difference between the scores obtained on the attitude scale towards family planning by the subjects whose parents education is high average and low in the experimental and control groups in pre and post testing (4) There will be no significant difference between the post testing scores on the attitude scale towards family planning obtained by subjects of high, average and low SES experimental and control groups. (5) There will be no significant difference between the post test scores on the attitude scale towards family planning made by the subjects of rural, sub-urban and urban experimental and control groups. (6) There will be no significant difference between the post test scores on the attitude scale towards family planning made by the subjects of parents with high average and low education experimental and control groups.
5.	Mishra, B. S.	A study of the improvement of Population Awareness among the secondary school students through a try-out of Population Education	1985	The objectives of the study were — (1) to expose the pupils to the population education materials in classroom situations and to assess their reaction; (2) to determine the population awareness of the pupils before and after exposure to the materials

		materials developed by the SCERT, SCERT Orissa, 1985.		(3) to find out the extent of the improvement of awareness in various content matters and to suggest necessary modifications and (4) to study the effectiveness of presentation of the materials, language, graphical representating, examples etc & suggest necessary modifications
6.	Chaudhari, R	Attitudes of Teachers and Administrators towards Population Education in Rajasthan, Phd. Edu, M. Sukh. U,	1985	The major objectives were (i) to concretize the concept and scope of population education with particular reference to school environment. (ii) to evolve an attitude scale for finding out the attitude of teachers and administrators of the department of education, Rajastan, towards population education, (iii) to find out the reliability and validity of the attitude scale, (iv) to develop sexurise norms of attitude in relation to teachers and administrators and (v) to compare the attitudinal-differences between the teachers and administrators of the Department of Education, Rajastan.
7.	Mohanty, J	A Study of the knowledge and reaction of teachers and students towards Introduction of Population Education in Secondary School Carriculum SCERT, Orissa.	1986	The objedctives of the study were -- (1) to make an assessment of escisting knowledge of secondary school students and teachers about population education, (2) to assertain the reaction of students and teaching towards the introduction of Population Educations and

				(3) to suggest ways and means for making the fundemental concepts clear and the reaction of students and teachers favourable towards Population Education.
8.	Jain, N	Behavioural dimensions of Population Education and Sex Education. A comparative study of youth in Punjab and Himachal Pradesh Universities,Pan U	1986	The objectives of the study were (1) to gain an insight into the perception, the extent of knowledge, awareness and attitudes of university youth towards population eduction and sex education
9.	SCERT, Maharashtra	An evaluation to the teaching learning of PE National Population Education Project, Pune.	1986	(2) to analyse the attitudes of the students towards various issues such as marriage, family formation and other dimentions of the population problem in general (3) to investigate the opinions and attitudes of the parents of the students and their teachers towards population problems, Population Education and Sex Education.
10.	Dr. Manoranjan Banerjee.	"Interrelationships Between Socio-economic Conditions, leses of Education and Growth of Population"–A Story in Birbhum District, West Bengal, VISVA BHARATI UNIVERSITY, SANTINIKETAN, W.B.	1986	The hecessary and sufficient conditions for reducing Population renth and : (i) to be high rate edcation (Literaers); (ii) to reduces child mortality. (iii) to increased health facility (iv) to remore economic in equality etc.

APPENDIX-II

STATE COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH & TRAINING
GOVERNMENT OF WEST BENGAL
25/3, Ballygunge Circular Road, ❑ Calcutta-700 019
POPULATION EDUCATION CELL

Discussion Materials for Teacher Educators at B. Ed level Population Education as an **Optional Special Paper** for **student teachers** of B. Ed colleges under different Universities of West Bengal.

Syllabus (Recommended and Revised at a

workshop of authors on 22nd May, 1991)

Objectives :

1. To develop an understanding of Population Education concept as a concept of Human Resource Development.
2. To educate student teachers for disseminating effectively the concept of Population as Human Resource Development among students of Secondary and Higher Secondary Schools.
3. To equip student teachers in acquiring skills in collecting and interpreting demographic data in the context of Socio-economic and developmental needs of the country.
4. To develop skills among student teachers in integrating the elelements of the concept of Population as Human Resource in various curricular and co-curricular activities.
5. To develop an understanding of the relationship between Population growth and quality of life in developing countries of the Third world in general and in India in particular.
6. To appreciate the role of Population Education as an educational intervention providing social change and national development.

Teaching Learning Units :

Unit – 1. **Nature and scope of Population Education as Education for Human Resource Development – Concept, Objectives and Implication.**

Unit – 2. **Population Situation in India.**

Distribution, composition (age and sex) and density growth.

Unit – 3. **Population in the light of quality of life –**

Population in relation to socio-economic status and health.

Unit – 4. **Education Policy and Population –**

Education policy in relation to Population, environment, resources.

Unit – 5. **Methods and Approaches and Techniques**

i) Integration Approach in curriculum development

ii) Teaching – Learning processes

A) Observation B) Survey C) Discussion D) Assignment

iii) Use of audio-visual materials

Unit – 6. Teacher, Family, Community and Mass Media as agents Population Education.

Unit – 7. Integration of Elements of Population Education with co-curricular and co-curricular areas (formal and non-formal). Acquaintance with some exempler materials.

APPENDIX-III

Syllabus of **Population Education** as an **elective subject** of B. Ed course given in Report of the National Committee for curricum development in education: Undergratuate level, University Grants Commission New Delhi, 1990.

Bachelor's Degree in Education

Paper IV- Section B: Electives

POPULATION EDUCATION

Unit I **Nature and Scope of Population Education**

Meaning and definition. Need, aims and objectives; Population education and related terms; scope and limitations, Emergence of Population in India.

Unit II **Population Situation in India**

Definition of various related demographic terms, structure and composition of population growth and emerging trends, the need for planned population growth, and existing programmes for family welfare.

Unit III **Population Growth and Quality of Life**

Population growth -- their consequences and effects; concept of quality of life. Indices of quality of life: Health, Nutrition, Education, Employment, Housing and communicating facilities. Status of women and population control. Relationship between population growth and quality of it at micro and macro level.

Unit IV **Population Education in Schools**

Curriculum and methodology: approaches to population education. Role of tecachers, home and school; issues and problems of population education; knowledge and attitude of teachers; organisation of population education programmes in schools/Colleges.

APPENDIX-IV

MA (Education) Syllabus, Calcutta University

Paper VIII (Special Paper) Population Education

I. **Nature and scope of Population Education**

Meaning, Concept Need and Importance of population Education, objectiven of Population Education.

II. **Population Situation and Dynamics**

Distribution and density : Population composition—age, sex, rural/urban, world and Indianfactors affecting population growth, mortality and migration and other implications.

III. **Population and Quality of Life**

Population in relation to socio-economic development; health status and health service; nutrition, environment, resource, educational provision.

IV. **Family Life Education**

Concept of family, family role and responsibilities, family needs and resources, responsible parenthood, life values and beliefs.

V. **Population related policy and programmes**

Population policy in relation to health, environment, education policies; programmes related to employment social movements; volountary and international agencies like UNFPA, WHO, UNESCO etc.

VI. **Cemigraphy**

Concept,scope and methods; Sources of demographidata and surveys, demographic concepts etc.

REFERENCES :

1. Agarwal, S. N. **India's population problem**, 1972.
2. Baroley Vgerge W. **Techinques of population Analysis**, 1950.
3. Bougo **D. J. Principles of Demography**, 1958.
4. David Kinslay, **The population of India and Pakistan**, 951.
5. **Jcobson, W. J. Population Education : A Knowledge Base**, 1976.
6. Hansar, Philip M (Ltd.) **World Population and Development: Challenges and Prospects**, 1979.

7. Kline, David, **Issues in Population Education,** 1976.
8. Ghose, Ashish et al **Population in India's Development : (1947-2000),** 1974.
9. Mascaranhas, M. M. **Population Education for Quality of Life,** 1974.
10. Thompson, Wrren and News, David, **Population Problems,** 1958.
11. United Nations : **Manuals & Bulletins.**
12. **World Bank :** World Development Report, 1989/1990/1991.
13. **Unesco : Family Life Education,** 1986.
14. Ehrlich, P. R. et al. **Ecoscience : Population Resources, Environments,** 1977.
15. **Population Dynamics and Educational Development,** 1974.
16. Srinivasan, K. and Mukherjee, S. (Ed.) **Dynamics of Population and Family Welfare,** 1985.
17. Singh, Butalia, Marianne, **Education and Population Dynamics, 1971.**

APPENDIX-V

A REPORT

AN EVALUATIVE STUDY ON THE PROGRAMMES OF CURRICULUM DEVELOPMENT AND TEACHERS ORIENTATION UNDER HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE SECONDARY SCHOOL LEVEL IN WEST BENGAL

PROF. DHIRAJ KUMAR BANERJEE.

SMT. BANI BHOWMICK.

INTRODUCTION

Population Education Project under UNFPA and NCERT has been implemented at the school level in West Bengal under a new nomenclature, 'An Educational Projcet for Human Resource Development'. The concept HRD has a much wider socio-economic implication, jointly developed by WBBSE and SCERT. After a great deal of debates, discussions, workshops and seminars among the social scientists primarily educationists and school teachers, it was felt desirable' to inculcate among students a correct, scientific and rational approach towards the question of population', as it was thought to be a vital demographic problem of the present period of human civilization. It was decided at that the task 'can be best achieved by the teachers while imparting instructions in various subjects included in the curriculum ? The SCERT, West Bengal, accordingly had undertaken a massive programmes of Curriculum and Material Developments at the Secondary School level and also the Orientation of teachers in the concept

and the teaching learning strategies of HRD.

In the work plan for 1989 under Item No. 4.2.3. (Research and Evaluation) the provision was made under-sub-item (i) for 'Monitoring of the P.E. programme with particular reference to Training Programmes. This evaluative study had, therefore, been conducted by a team of project personnel, viz,. prof. Dhiraj Kumar Banerjee and Smt. Bani Bhowmick during the period from January 1989 to May 1989.

Objective of the Study

The general objective of the study, therefore, was "To evaluate the Instructional Packages (Teachers Guide books) and Orientation Programmes meant for the secondary school teachers under HRD/population Project in West Bengal".

Design of the Study

1. The methodology of the study was to elicit the experiences and the opinions of the teachers **through** their **Heads of the institutions on eight** specific issues relating to teachers' guide and Orientation Courses. The responses were collected through a **well-constructed questionnaire** consisting of eight specific questions.

A copy of the **questionnaire** is enclosed (Annexure A) for ready reference.

2. As a pilot study, a small group of participating schools covering nine districts of West Belngal was selected. The concerned Districts were (i) Calcutta, (ii) North 24 parganas, (iii) South 24 Parganas, (iv) Burdwan, (v) Nadia, (vi) Midnapur, (vii) Bankura, (viii) Maldha and (ix) West Dinajpur.

3. The questionnaire was sent to the selected schools numbering 911 and one hundred fifty four (154) schools responded and co-operated with the study. The districtwise distribution of the co-operative schools is shown below :

	Districts	No. of co-operating schools
1.	Calcutta	19
2.	North 24 parganas	19
3.	South 24 parganas	10
4.	Burdwan	20
5.	Nadia	15
6.	Midnapur	22
7.	Bankura	20
8.	Maldha	17
9.	West Dinajpur	12
	Total :	154

4. The responses to eight questions were properly tabulated, analysed and statistically treated.

STATISTICAL FINDINGS AND CONCLUSIONS

The total responses to each question have been expressed **in percentages**

of the sum total of the co-operating schools i.e. N = 154.

Q. No. 1 Whether workshop/meeting was held at the school level

Findings: Yes – 89% No – 11%

Conclusion : The majority of the co-operating schools had compiled with.

Q. No. 2 whether the teachers could utilise their orientation to class-room activities.

Findings : Yes – 84% No – 13% Uncertain – 3%

Conclusions : Majority could utilise their experience.

Q. No. 3 In which subject / subjects the concept of Human/Resource Development could be put forward effectively in the class room Positive responses to each subject have been indicated below **in percentages.**

Findings : Geography – 83%: History – 81%: Language & Literature – 72%: Life Science – 67%: Physical science – 46%: Mathematics – 42%.

Conclusions : The degree of effectiveness of the subjects concerned to convey the concept of HRD has been expressed.

Q. No. 4 Whether short questions could be set (in question paper) in evaluating pupils attitude towards environment and related issues.

Findings : Yes – 98% No – 20%

Conclusions : The effectiveness of short questions has been established.

Q. No. 5 Whether there has possibility to include new materials in the Teachers' Guides.

Findings : Yes – 85% No – 12% Uncertain – 3%

Conclusions : The co-operating school have expressed their opinion in the positive.

Q. No. 6 In which subject/subjects inclusion of new materials has/have been thought desirable. Positive responses to each subject have been indicated **in percentages.**

Findings : Geography – 62%: Life Science – 57%: Language & Literature – 55%: History – 50%: Physical Science – 44%: Mathematics – 42%.

Conclusions : The choice has been expressed at different levels.

Q. No. 7 Whether pupils had shown positive interests and understanding towards the approach of HRD at the time of teaching-learning.

Findings : Yes – 77%: No – 20%: Uncertain – 3%

Conclusions : The positive responses have been exhibited. But

the negative responses (one – fifty of the total) have to be noted.

Q. No. 8 In which subject/subjects pupils had shown positive interests and understanding. Positive responses to each subject have been indicated below **in percentages**

Findings : Geography – 66%: Language & Literature – 65%: Life Science – 62%: History – 62%: Physical Science – 33%: Mathematics – 25%.

Conclusions : The degree of pupils preferences has been demonstrated.

SUMMARY AND FOLLOW UP

1. Overwhelming majority of the co-operating schools organised school level meetings (Workshops as a follow-up to orientation programmes).
2. Majority of the teachers utilised their experiences in classroom activities.
3. The concept of HRD was successfully projected through different school subjects at varying degrees of effectiveness.
4. The feasibility of training, short questions in pupil evaluation has been clearly expressed by the co-operating schools.
5. The concerned schools have indicated their preferences for inclusion of new instructional materials in Teachers' Guide Books Published by SCERT.
6. The popularity of different subjects in terms of pupils preferences has been clearly expressed.

The study-team is of opinion that such study/studies may be undertaken with a view to monitoring the programmes for curriculum development and orientation of teachers at different levels of the Education system.

D. GHOSH

Director PEP & Director
State Council of Edu.
Research & Trg. W. B.

রাজ্য শিক্ষা-গবেষনা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ পশ্চিমবঙ্গ

জনসংখ্যা শিক্ষা

মানব-সম্পদ বিকাশের জন্য শিক্ষামূলক প্রকল্প

"মানবসম্পদ বিকাশার্থে উন্নয়নমূলক প্রকল্পের মূল্যায়ণ"

(নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি 'হ্যাঁ' অথবা 'না' এর মাধ্যমে মতামত প্রকাশ করুন)

প্রশ্নাবলী ঃ

১. উপরোক্ত প্রকল্প সম্বন্ধে বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে যে আলোচনা করার অনুরোধ করা হয়েছিল, তা হয়েছে কি ? হ্যাঁ ☐, না ☐।

২. যে সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে কর্মশালায় আলোচনা করা হয়েছিল তারা কি তাদের নিজস্ব বিষয়ে প্রশিক্ষণ কাজে লাগাতে পেরেছেন ? হ্যাঁ ☐, না ☐।

৩. কোন্ কোন্ বিষয়ে 'মানব সম্পদ বিকাশের' ধারণাটি ভালো ভাবে দেওয়া যাচ্ছে ? ✓ দিন
ভাষা ও সাহিত্য ☐, গণিত ☐, ভৌতবিজ্ঞান ☐, ভূগোল ☐, ইতিহাস ☐।

৪. পরিবেশ সংক্রান্ত ও অন্যান্য সামাজিক সচেতনতার উপর কি ছোট ছোট প্রশ্ন রাখা যেতে পারে ?
হ্যাঁ ☐, না ☐।

৫. ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে কি ছোট ছোট প্রশ্ন রাখা যেতে পারে ?
হ্যাঁ ☐, না ☐।

৬. আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে বেশী প্রয়োজন অনুভব করছেন ?
দরিদ্রতা দূরীকরণ ☐, স্বাক্ষরতার প্রসার ☐, স্বাস্থ্যের প্রসার ☐, অপচয় রোধ ☐।

৭. আমরা যে শিক্ষণ সহায়িকা দিয়েছি তাতে নতুন সংযোজন কি সম্ভব ? হ্যাঁ ☐, না ☐।

৮. নতুন সংজোযন সম্ভব হলে কোন্ কোন্ বিষয়ে তা করা যাবে ? ✓ দিন।
ভাষা ও সাহিত্য ☐, গনিত ☐, ভৌতবিজ্ঞান ☐, জীবন বিজ্ঞান ☐,
ভূগোল ☐, ইতিহাস ☐।

৯. পাঠক্রমের ভেতর যখন আপনারা এই ধরণের আলোচনা করেন তখন ছাত্রদের কাছ থেকে আশানুরূপ সচেতনতা লক্ষ্য করেন কি ? হ্যাঁ ☐, না ☐।

১০. কোন্ কোন্ বিষয়ে সচেতনতা বেশী লক্ষ্য করেন ? ✓ দিন।
ভাষা ও সাহিত্য ☐, গণিত ☐, ভৌতবিজ্ঞান ☐, ভূগোল ☐, জীবন বিজ্ঞান ☐, ইতিহাস ☐।

বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলন ঃ রিও ঘোষণা –

☆ সংগ্রহকারক–ধীরাজ কুমার বন্দোপাধ্যায়

আমাদের বাড়ি এই পৃথিবীর অখণ্ড ও পরস্পর নির্ভরশীল চরিত্রের কথা মনে রেখে, জাতিসংঘ কর্তৃক আহূত পরিবেশ ও উন্নয়নের উপর মহাসম্মেলনে বিভিন্ন রাষ্ট্রের নেতৃবর্গ দ্বারা উত্থাপিত এবং পরিবেশ রক্ষার জন্য সাধারণ অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে রিও সম্মেলনে গৃহীত নীতির ভিত্তিতে আমরা ঘোষণা করছি ঃ

স্থায়ী উন্নয়নের জন্য চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু হল মানুষ। প্রকৃতির সঙ্গে সমন্বয়ের ভিত্তিতে মানুষ সুস্থ ও উৎপাদনশীল জীবনের অধিকারী।

জাতিসংঘের সনদ ও আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে নিজস্ব পরিবেশ ও নীতির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে নিজ দেশের সীমানার মধ্যে সম্পদ ব্যবহার করা এবং দেশের বাইরে অন্য রাষ্ট্র বা অঞ্চলের ক্ষতিসাধন যাতে না হয় তার দায়িত্ব পালনে প্রতিটি রাষ্ট্রের সার্বভৌম অধিকার আছে।

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উন্নয়ন ও পরিবেশগত চাহিদা সমতার ভিত্তিতে যাতে পূর্ণ হয় তার জন্য উন্নয়নের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হোক।

স্থায়ী উন্নয়ন অর্জন করতে হলে পরিবেশ সংরক্ষণকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে একসূত্রে গাঁথতে হবে এবং এই দুটি কর্তব্যকে কখনোই পৃথক করে দেখা চলবে না।

স্থায়ী উন্নয়নের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় কর্তব্য হল দারিদ্রতা দূর করা। এই কাজে সমস্ত রাষ্ট্রের সহযোগিতা প্রয়োজন।

উন্নয়শীল বিশেষ করে সবচেয়ে পশ্চাদপদ এবং পরিবেশের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন দেশগুলির বিশেষ পরিস্থিতি ও চাহিদাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। উন্নয়ন ও পরিবেশগত আন্তর্জাতিক কাজকর্মগুলিতে সকল দেশের স্বার্থ ও দাবির প্রতি নজর রাখতে হবে।

পৃথিবীর পরিবেশ ব্যবস্থাকে অক্ষুন্ন রাখতে, তাকে রক্ষা করতে এবং তার স্বাস্থ্য ও অখণ্ডতাকে পুনরুদ্ধার করতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে রাষ্ট্রসমূহ পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তুলবে।

পৃথিবীর পরিবেশের ক্ষতিসাধনে বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রকার ভূমিকা থাকাতে এই ব্যাপারে তাদের সার্বিক কিন্তু নানা ধরণের দায়িত্ব রয়েছে।

উন্নত দেশগুলি স্বীকার করে যে পৃথিবীর পরিবেশের উপর তাদের সামাজিক জীবনযাত্রার চাপ এবং প্রযুক্তি ও আর্থিক সম্পদের উপরে তাদের দখল--এই দুটি কারণে স্থায়ী উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় তাদের বিশেষ দায়িত্ব আছে।

স্থায়ী উন্নয়ন সম্ভব করতে এবং সকল মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে চিরকাল চালিয়ে যাওয়া যায় না এমন উৎপাদন ও ভোগের মাত্রা কমাতে হবে এবং সেই সঙ্গে জনসংখ্যা সম্পর্কে উপযুক্ত নীতি গ্রহণ করতে হবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে তথ্য ও জ্ঞান বিনিময়ের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক চেতনা বৃদ্ধি এবং নতুন পরীক্ষামূলক প্রযুক্তির উন্নয়ন, ব্যবহার এবং বিনিময়-এর মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রগুলির পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে তাদের নিজস্ব স্থায়ী উন্নয়ন ক্ষমতা গড়ে তুলতে সাহায্য করতে হবে।

পরিবেশগত বিষয়গুলি নিয়ে কাজকর্ম সকল সচেতন নাগরিকদের নিজ স্তরে ও সীমিত ক্ষেত্রে অংশগ্রহণই শ্রেষ্ঠ পথ।

জাতীয় ক্ষেত্রে পরিবেশ সংক্রান্ত যে সব তথ্য সরকারি সংস্থাগুলির হাতে আছে সেগুলি

সকলের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে হবে। এর মধ্যে আছে তাদের এলাকায় অত্যন্ত বিপজ্জনক বস্তুর ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্য। সেই সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ার সঙ্গে সাধারণ নাগরিকের অংশগ্রহণের পথ সুগম করতে হবে। ক্ষতি পূরণের জন্য আইন ও প্রশাসন গত সাহায্য যাতে নাগরিকরা পান তার ব্যবস্থা করতে হবে। এ বিষয়ে গণচেতনা বৃদ্ধি ও পরিবেশ রক্ষার কাজে নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের কর্তব্য।

পরিবেশ বিষয়ে কার্যকরী আইন প্রতিটি রাষ্ট্রকে গ্রহণ করতে হবে। প্রতিটি দেশের উন্নয়ন ও পরিবেশ রক্ষা সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে, উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে পৌছানর জন্য পরিবেশের মান ও অগ্রাধিকারের বিষয়গুলি স্থির করতে হবে।

এক দেশের জন্য স্থিরিকৃত মাপকাঠি অন্য দেশে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অনুপযুক্ত অথবা সামাজিক ও আর্থিক ব্যয়ের নিরিখে অবাস্তব ও অপ্রয়োজনীয় হতে পারে।

পরিবেশ অবক্ষয়ের সমস্যা সমাধানে সঠিক প্রচেষ্টার জন্য, সকল দেশের স্থায়ী উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক বিকাশকে সম্ভব করে তোলে এমন সাহায্যকারী ও খোলা আন্তজার্তিক আর্থ ব্যবস্থা গড়ার জন্য রাষ্ট্রদের সহযোগিত করতে হবে।

পরিবেশ রক্ষার নামে এমন বাণিজ্য নীতি গ্রহণ করা চলবে না, যা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারী ও অযৌক্তিক বৈষম্য অথবা প্রচ্ছন্ন বাধা সৃষ্টি করে। আমদানি-কারক দেশের বাইরে পরিবেশ সমস্যা সৃষ্টির অজুহাতে এক তরফা কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত নয়। জাতীয় সীমা অতিক্রম করে অথবা বিশ্ব পরিসরে ব্যাপ্ত পরিবেশগত সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য যতদূর সম্ভব আন্তর্জাতিক সহমতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

যে সব কাজকর্ম রাষ্ট্রসীমা ছাড়িয়ে অন্যদেশের পরিবেশকে উল্লেখযোগ্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে সে সম্পর্কে পূর্বাহ্নে এবং সময়মত প্রয়োজনীয় তথ্য সেই সব দেশকে জানাতে হবে এবং তাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে।

উন্নয়ন ও পরিবেশ রক্ষায় মেয়েদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। স্থায়ী উন্নয়ন আনতে গেলে তাই তাহাদের পূর্ণ অংশগ্রহণ এত প্রয়োজনীয়।

সকলের জন্য উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে এবং স্থায়ী উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গড়তে যুবসমাজের সৃজনশীলতা, আদর্শ ও সাহসকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

চিরাচরিত প্রথা ও কাজকর্ম সম্পর্কে আদিবাসী ও অন্যান্য স্থানীয় মানুষ ও সমাজের যে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান আছে উন্নয়ন ও পরিবেশ রক্ষার তার বিশেষ ভূমিকা আছে।

এইসব গোষ্ঠীগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং তাদের সংস্কৃতি ও স্বার্থকে সমর্থন করা সমস্ত রাষ্ট্রের কর্তব্য যাতে এরা স্থায়ী উন্নয়নের প্রচেষ্টায় উল্লেখযোগ্য অংশ নিতে পারে।

শোষিত, নিপীড়িত এবং পরাধীন মানুষের প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশকে রক্ষা করতে হবে।

যুদ্ধ স্থায়ী উন্নয়নের পরিপন্থা তাই যুদ্ধের সময় পরিবেশ রক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক আইন সকলকে মেনে চলতে হবে এবং তারজন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গড়ে তুলতে হবে।

শান্তি, উন্নয়ন এবং পরিবেশ রক্ষা—তিনটি কাজই হ'ল পরস্পর নির্ভরশীল। তাদের পৃথক করা চলে না।

প্রত্যেক রাষ্ট্রকে তার পরিবেশ সংক্রান্ত বিরোধ শান্তি-পূর্ণ ভাবে জাতিসংঘের সনদ মেনে মিটিয়ে ফেলতে হবে।

এই ঘোষণায় যে নীতিগুলি উচ্চারিত আছে তাকে কার্যে পরিণত করা এবং স্থায়ী উন্নয়নের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইন আরও নির্দিষ্ট করার জন্য সকল রাষ্ট্র ও তাদের নাগরিকগণ সহযোগিতা করবেন।

✪ উৎস : দৈনিক গণশক্তি ; ২০ শে জুন, ১৯৯২

1992-Earth Summit :

RIO DECLARATION—

★ **Collected By—Dhiraj Kr. Bandhapadhya**

The following is the Rio declaration on principles on general rights and obligations on environment protection initiated by heads of Governments at the United Nations Conference on Environment and Development, recognising the integral and interdependent nature of the earth, our home, we proclaim that;

1. Human beings are at the centre of concerns for sustainable development. They are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature.

2. States have, in accordance with the charter of the United Nations and the principles of international law, the sovercign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental and policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other states or areas beyond the limits of national jurisdiction.

3. The right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental needs of present and future generations.

4. In order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process and can-not be considered in isolation from it.

5. All states and all people shall cooperate in the essential task of eradicating poverty as an indispensable requirement for sustainable development.

6. The special situation and needs of developing countries, particulary the least developed and those most environmentally vulnerable, shall be given special priority. International actions in the field of environment and development should also address the interests and needs of all countries.

7. States shall coorperate in a spirit of global partnership to conserve, protectand restore the health and integrity of the earth's eco-systems. In view of the different contributions to global environemntal degradation, states have common but differentiated responsibilities. The developed countries acknowledge the responsibility that they bear in the international pursuit of sustainable development in view of the pressure their societies place on the global environment and of the technologies and financial resources they command.

8. To achieve sustainable development a higher quality of life for all people, states should reduce and eliminate unsustainable patterns of production and consumption and promote-appropriate demographic, policies.

9. States should co-operate to

strength-endegerous capacity-building for sustainable development by improving scientific understanding through exchanges of scientific and technological knowledge, and by enhancing the development, adaptation, diffusion and transfer of technologies, including new and innovative technologies.

10. Environmental issues are best handled with the participation of all concerned citizens, at the relevant level. At the national level, each individual shall have appropriate access to information concerning-the environment that is held by public authorities, indlucing information on hazardous materials and activities in their communities, and the opportunity to participate in decision-making processes. States shall facilitate and encourage public awareness and participation by making Information widely available. Effective access to judicial and administrative proceedings, including redress and remedy, shall be provided.

11. States shall enact effective environmental legislation. Environmental standards, management objectives and priorities should reflect the environmental and developmental context to which they apply. Standard applied by some countries may be inappropriate and of unwarranted economic and social cost to other countries, in particular developing countries.

12. States should cooperate to promote supportive and open international economic system that would, lead to economic growth and sustainable development in all countries,. to better address the problems of environmental degradation. Trade policy measures for environmental purposes should not constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination or a disguised restriction on international trade. Unilateral actions to deal with environmental challeages outside the jurisdiction of the importing country should be avoided. Environmental measures addressing transboundary or global environmental problems should, as far as possible, be based on an international consensus.

13. States shall develop national law regarding liability and compensation for the victims or pollution and other environmental damage, States shall also cooperate in and expeditous and more determined manner to develop further international law regarding liability and compensation for adverse effects of environmental damage caused by activities within their juridiction or control to areas beyond their jurisdiction.

14. States should effectively cooperate to discourage or prevent the relocation and transfer to ther states of any activities and substances that cause severe environmental degradation or are found to be harmful to human health.

15. In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by states according to their capacities. Where there are threats of serious or irreversibie damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effecting measures to prevent environmental degradation.

16. national authorities should endeavour to promote the internalization of environmental costs and the use of economic instruments, taking into account the approach that the polluter should, in principle, bear the cost of pollution, with due regard to the public interest and without distorting International trade and investment.

17. Environmental impact assessment, as a national instrument, shall be undertaken for proposed activities that are likely to have a significant adverse impact on the environment and are subject to a decision of a competent national authority.

18. States shall immediately notify other states of any natural disasters or other emergencies that are likely to produce sudden harmful effects on the environment of those states. Every effort shall be made by the international community to help states so afflicted.

19. States shall provide prior and timely notification and relevant information to potentially affected states on activities that may have a significant adverse trans-boundary environmental effect and shall consult with those states at an early stage and highest faith.

20. Women have a vital role in environmental magement and environment. Their all particip-ation is therefore essential to achieve sustainable develop-ment.

21. The creativity ideals and courage of the youth of the world should be mobilized to force a global partnership in order to achieve sustainable development and ensure a better future for all.

22. Indigenous people and their communities, and other local communities, have a vital role in environmental manag-ement and development because of their knowledge and traditional practices, States should recognize and duly support their identity, culture and intersts and enable their effective participation in the achievement of sustainable development.

23. The environment and natural resources of people under oppression, domination shall be protected.

24. Warfare is inherntly destructive of sustainable development. States shall therefore respect international law providing protection for the environment in times of armed conflict and cooperate in its further developments necessary.

25. Peace, development and environmental protection are interdependent and indivisible.

26. States shall resolve all their environmental disputes peacefully and by appropriate means in accordance with the charter of the united nations.

27. States and people shall cooperate in good faith and in a spirit of partnership in the fulfilment of the principle sembodies in this declaration and in the further development of international law in the field of sustainable development.

✪ **Source : BUSINESS STANDARD MONDAY 15 JUNE, 1992**

REFERENCES

Population Education in Non-Formal Education and Development Programmes : A manual for field workers, Trial Edition, Bangkok, Unesco, 1981.

Population Education in Asia : A source Book 5 vols., Bangkok, Unesco, 1975.

Population Education in School curricula (Social sciences) : A working Document, New Delhi, NCERT, 1970.

King, Pat and John Landah, **Teaching Population Concepts** : Seathe, Dolphir Enterprises, 1976.

International Labour Office, **In-plant Population Education** : An Asian Handbook, Bangkok, International Labour Organisation, 1977.

J Mohanty **Indian Education In The Emerging Society** Sterling Publishers Private Limited, New Delhi Third Edition, 1986 (Chapter 16).

John P. De Cecco **Psychology of Learning and Instruction** : New Delhi, Prentice Hall of India. 1977.

Instructional Media : Macmillan, New York 1990 Third Edition.

Wittich, W. A. and Schuller, C. F. (1967) : **Audio-Visual Materials : Their Nature and use** : (4th ed,) Harper and Row, New York.

Taba H Curriculum Development : Theory and Practice, Harcourt, Brace and World, New York, 1962.

Agarwal, S. N. **India's Population Problem** : 1972.

Davis, Kinsley, **The population of India and Pakisthan** : 1951.

Jacobson, W. J. **Population Education** : A knowledge Base, 1976.

D. Gopal Rao : **Population Education, A Guide to curriculum & Teacher Education** : Sterling Publisher Ltd. New Delhi, 1974.

Kline, David and Harmon, David, **Issue's in Population Education** : 1976.

Bose, Ashish et al. **Population in India's Development** : (1947-2000), 1974.

Mascarenhas, M. M. **Population Education for Quality of Life** : 1974.

Eherlich, P. R. et al. Ecoscience : **Population Resources, Environments** : 1977.

Singh, Butalia, Marianne, **Education and Population Dynamics** : 1971.

Environment and Natural Rsources, Edited by V. P. Agrawal and S. V. S. Rana, Society of Biosciences : New Delhi, 1986.

India spotlight on Population : Viztor Petrov, Progress Publishers, Moscow, 1985.

Banerji, D. 1977. **Community response to the intensified family planning Programme** : EPW, Annual Number, February.

Meckeown, T., Brown, R. G. and Record R. G. 1972. **An interpretation of the modern rise of population in Europe** : PS, November.

Mandani, M. 1976. **The Ideology of Population Control** : EPW, special Number, August.

Mecgama, S. A. 1967, **Malaria cradication and its effects on mortality levels** : PS, November.

Panikar, P. G. K. Krishnan, T. N. and Krishnaji, N. 1977. **Population Growth and Agricultural Development : A case study of kerala** (mimeo), **Centre for Development studies** : Trivandrum, India.

Rao. S. K. 1976. **Population growth and economic development. A counter argument** : EPW, Special Number, August.

Rose, C. S. and Gyorgy, P. 1970. Mal nutrition in Children in Indonesia, in H. W Beers (ed.) Indonesia. **Resources and their Technological Development, Lexington** : USA,. The University Press of Kentacky.

Schultz, T. P. 1969. **Demogrophic Conditions of economic development in Latin America** : in Nisbet, 1969.

Simon, J. L. 1977. **The Economics of Population Growth** : Princeton, NJ, PUP.

Stycos, J. M. 1978. **Recent declines in Latin American tertility** : PS, November.

Inorganic Chemistry : James E. Huheey, Harper International SI Edition, 1983.

Population Education : A National Source Book, NCERT, 1991.

Man and Nature : E. Fedorov. Progress Publishers, Moscow, 1980.

The World of Man in the World of Nature : I, Lapter, Progress Publishers, Moscow.

Studies on some problems of Atmospheric pollution in Southern Bengal Centre for study of Man and Environment : Calcutta, 1985.

Man and Animals : Y. Dmitriyev, Rduga Publishers, Moscow, 1984.

Population and Environment : (Teacher's guide), UNESCO REGIONAL OFFICE FOR EDEN. IN ASIA AND THE PACIFIC, Bangkok, 1985.

Pollution . N. Seshagiri, NBT, New Delhi, 1984.

The sky will be blue : G. Gordon and L. Gordon, Mir. Publishers. Moscow, 1984.

Teacher's Guides : Bulletins, Booklets etc. Published by SCERT, W. B., W. B. Pollution Control Board, D. S. T. Govt. of W. B. etc.

Seshadri C., Pandey J. L. **Population Education : A National Source Book** (Volume-1) New Delhi NCERT, 1991.

Issar Davendra, **Communication Mass Media and Development** : Delhi, Unique Publications 1991.

Mohanty Jagannath **Indian Education in the Emerging Society** : New Delhi Sterling Publishers PVT. Limited 1986.

Bishop, **Innovation in Education** : Macmillian Publishers Ltd. London 1986.

পাঠ পরিকল্পনা ঃ ভুজ ভুষন ভট্টাচার্য সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা অধ্যায় ৫ শিক্ষাদানের উপকরন ও প্রদীপন।

জনসংখ্যা-শিক্ষা, মানব-সম্পদ বিকাশের জন্য শিক্ষামূলক প্রকল্প, শিক্ষণ সহায়িকা, কলিকাতা, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, ১৯৮৮-৮৯ পদার্থবিদ্যা, রসায়ণবিদ্যা, জীববিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস অর্থবিদ্যা.।

3. Bishop, **Innovation in Education** : Macmillion Publishers Ltd. London 1986.

MEMBERS OF THE POPULATION EDUCATION CELL (SCERT) W. BENGAL

1. SRE. SUHAS CHOTTOPADHYAY.

— Director.

2. PROF. DHIRAJ KUMAR BONDHOPADHYAY.

— Project Officer.

3. SMT. BANI BHOWMIK.

— Project Co-ordinator.